KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Card No. KEMLGK 3007	Place of Publication: ২০ কীওয়ানিস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection: KEMLGK	Publisher: মজুমদার লাইব্রেরি
Title: সমালোচনী	Size: 4.5" x 7" 11.43 x 17.78 c.m.
Vol. & Number: ১/১-১২ 2/১-১২ ৩/১-১২	Year of Publication: ১৮০৮ মার্চ - ১৮০৯ ফেব্রু ১৮১০ ১৮১১
	Condition: Brittle Good
Editor: কৃষ্ণকিঙ্করী দে	Remarks:

CD Roll No. KEMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
স্থাপিত-১৯৭৮

(মাসিক পত্র)

২য় বর্ষ। Complete

কৈশাখ — চৈত্র — ১৩১০ সাল

১৩১০

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

২য় বর্ষের লেখক লেখিকাগণের নাম।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বসু। শ্রী অপ্রকট চন্দ্র ভাস্কর। শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়। শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ধর মজুমদার। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ। শ্রীমতী সুরবালা রায়। শ্রীযুক্ত শশধর রায়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্রেয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল। শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু এম, এ। শ্রীযুক্ত কালীচরণ নন্দী। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল,। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী। শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তি প্রভৃতি।

সূচী।

বিষয়।				পৃ
অনুকরণ রহস্য	...	...	...	
অনুরোধ	...	...	...	
অপযশ	...	...	...	
অভিমান (কবিতা)	...	...	...	
অবোধ সখী	...	...	...	
অশোকবনে সীতা	...	...	...	
আবাহন (কবিতা)	...	...	...	
আমাদের দারিদ্র্য	...	...	...	
উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্র	...	...	...	
ওঙ্কার	...	...	...	
কবিচন্দ্র	...	...	...	
কবির পরিচয়	...	...	...	
কবির প্রভাব	...	...	...	
কলঙ্ক	...	...	...	
কাব্যকথা	...	...	...	
কাব্যগ্রন্থ	...	...	...	
কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা	...	...	...	
খেতাবওয়ালার এজাহার	...	...	...	
গঙ্গাতটে (কবিতা)	...	...	...	
গদাই ঠাকুর	...	...	...	
গান (কবিতা)	...	...	...	

জনকপুর ৩০১
জন্মকথা ২৯৯
জেবউন্নিসা ৩০৯
জাপান ৩৬৪
তালের তত্ত্ব ১৫৩
দিল্লির দরবার ২৪
দুঃখের কথা ১৯৫
ধ্বন্যাত্মক কবিতার উপযোগিতা ১৬
নিরাশ প্রণয়ের চিত্র ১৫৮
পণ্ডিতের অপমৃত্যু ৮০
পিপীলিকা ৯২
পূর্ব্বস্মৃতি (উপন্যাস) ... ৫০, ৯৮, ১৩২, ১৩৫, ২৩৭
প্রাচীন জাপান ৩৪৫
পূর্ব্বস্মৃতি ৩৯৬
বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয় ২০৫
বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীচরিত্র ৯
বিবাহ ১৮৯
বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্বেষ ৩৮১
বাঙ্গালা কি মূলভাষা ৩৮৯
ভারতের রমণী ১৫৭
ভারত শাসন ২৪০
ভাষা ও কৌশল ১০৩
ভাষা ও ভাব ৩৩৯
ভিক্‌টার হিউগো হইতে (কবিতা) ৭২
তুমি ৩৮০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনা।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ১৩০৯। { ১ম সংখ্যা।

গদাই ঠাকুর।

টিকিকাটা-জমিদারস্য কথামৃতম্।

অথবা

"অহো! তোমরা টাকা পেলে, হেসে খেলে,
সাদায় করো কালো।
তোমাদের গোঁসাই চেয়ে, (আমি বলি),
কসাই তবু ভালো॥"

[আণ্টুনী ফিরিঙ্গি]

পাঠকমহাশয়! আপনারা কি গদাই ঠাকুরের নাম শুনিয়াছেন? গদাই ঠাকুরের কথা "আরব্যরজনীর" উপন্যাস নহে, ইহা আশ্চর্য্য বাস্তব ঘটনা। কাহারও অযথা নিন্দা করা অথবা অকাট্য সত্যকে অতিরঞ্জিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে; পাপী, ভণ্ড ও কপটাচারীর পরিণামে কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহারই একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না, তাহা জানি; কিন্তু যখনই ঘটে, তখনই হাতে হাতে তাহার কুফল ফলিতে দেখা যায়। গদাই ঠাকুরের কথা—হাস্য, বিস্ময়, বিষাদ ও বীভৎস রসে পূর্ণ।

অনেকদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় কায়স্থকুলোৎপন্ন একজন সাধুপ্রকৃতির জমিদার ছিলেন। আমি ইঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং ইঁহার সহিত আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। এই বিশিষ্ট "হিন্দু" জমিদার বঙ্গদেশে—বিশেষত বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে নানা কারণে সুপ্রসিদ্ধ। আমি এই প্রবন্ধে এই বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্মপরায়ণ, শাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং প্রখ্যাত জমিদারের নাম বা কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিব না। মনে করুন, এই জমিদারের কল্পিত নাম "উমাবাবু", আমি ইঁহাকে উমাবাবু বলিয়াই উল্লেখ করিব। গো-ব্রাহ্মণ ও অতিথির ভক্ত উমাবাবুর বাটীতে যতগুলি গাভী প্রতিপালিতা হইত, তাহার মধ্যে অঞ্জনা নামে একটি গাভী অত্যন্ত কৃশা ও বৃদ্ধা হইয়াছিল। বাবুর ধার্ম্মিকা জননী একদিন বাবুকে বলিলেন, "বৎস! অঞ্জনা অত্যন্ত বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষত দিনে দিনে সে আরও কৃশা হইয়া যাইতেছে। আমার ইচ্ছা এই যে, এই বুড়ী গাভীটিকে আমাদের পূজ্যপাদ গুরুদেবমহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক; সেখানে অঞ্জনা, ব্রাহ্মণের গৃহে এবং ব্রাহ্মণের হস্তে প্রস্তুত অন্নে প্রতিপালিতা হউক; তাহা হইলে তাহার সদ্গতি হইবে। ইহার প্রতিপালন জন্য গুরুদেবকে আমরা মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব।" উমাবাবু ইহাতে সম্মত হইলেন এবং গুরুদেবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বাবুর গুরুদেবের নাম মনে করুন গদাই ঠাকুর। গুরুদেবের কলিকাতাসহরে নিবাস ছিল; সুতরাং আহ্বানপত্র প্রাপ্ত হইয়াই শিষ্যের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গদাই ঠাকুরকে উমাবাবু এবং তাঁহার জননী গাভীর অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া, তাহার প্রতিপালন জন্য পুনঃপুন অনুরোধ করায়, গদাই কহিলেন, "গাভীকে রক্ষা ও পালন করা হিন্দুর পরম ধর্ম্ম; সুতরাং তোমাদের অঞ্জনা গাভীকে আমার গৃহে লইয়া যাইতে আমি নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেছি; কিন্তু হরি! হরি! গাভীর প্রতিপালন জন্য অর্থ গ্রহণ

করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। আমার পারিবারিক বা আর্থিক অবস্থা যদি ভাল হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—এই বৃদ্ধা গাভীর প্রতিপালন জন্য, ভগবতীর তুল্য এই গো-মাতার রক্ষণ ও পালন জন্য, আমি নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—একটিও টাকা অথবা একটিও পয়সা কিংবা (অধিক কি) একটিও কাণা কড়ি তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতাম না। যাহা হউক, তোমাদের বিশেষ অনুরোধে এবং বিশেষত আমার আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতাবশত, আমি মাসে মাসে পনেরটি টাকা মাত্র গ্রহণ করিব। কলিকাতার মত এতবড় সহরে পঞ্চদশ রৌপ্যমুদ্রার কমে একটা গাভীর প্রতিপালন হওয়া অসম্ভব।" উমাবাবু এবং তাঁহার মাতা ইহাতে সম্মত হইয়া গুরুদেবের বাটীতে গাভীটিকে পাঠাইয়া দিলেন এবং দুইমাসের টাকা গদাই ঠাকুরের হাতে অগ্রিম প্রদান করিলেন। গুরুদেব ইতঃপূর্ব্বে এক মাসে দুইবারমাত্র শিষ্যের বাটীতে আসিত; কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে গদাই ঠাকুর প্রতি সপ্তাহে দুইতিনবার উমাবাবুর বাটীতে আসিতে আরম্ভ করিল। বাবুর মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই গদাই ঠাকুর বলিত, "কলিকাতাসহরে ঘাসের দাম আজকাল বড়ই দুর্ম্মূল্য, বিশেষত রাখালবালকের বেতন দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে, তদ্ভিন্ন গোয়ালঘরের ট্যাক্স হইবে নাকি শুনিতেছি!! তা ছাড়া গরুটির কিঞ্চিৎ সান্নিপাতিক ব্যাধি আছে, বোধ হইতেছে—যাহা হউক, এই সকল কারণে কলিকাতায় গরুর খরচ বড়ই বেশী হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি আমি গো-মাতার প্রতি কখনই তাচ্ছীল্য করি না; গাভী হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবতী, সুতরাং তাঁহাকে উপেক্ষা করা, আর নরকে গমন করা, একই কথা। আমি আমার পুত্রকন্যাকে না খাওয়াইয়া অগ্রে অঞ্জনা গাভীকে খাওয়াইয়া থাকি; কিন্তু বলিতে কি, কলিকাতায় গাভীর খরচ বড়ই বেশী হইয়া পড়িয়াছে।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইরূপ

নানাপ্রকারের মিথ্যাকথায় ধার্ম্মিক ও সরলহৃদয় স্ত্রীলোকের মন ভুলাইয়া, গদাই ঠাকুর পঞ্চদশ মুদ্রার অতিরিক্ত আরও কিছু টাকা গোপনে গোপনে লইয়া যাইত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কলিকাতায় গাভীর মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল; কারণ, ইংরাজ গোরাদিগের, মুসলমানদিগের এবং সাহেবদিগের জন্য—তদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতির জন্য—গোমাংসের খুব প্রয়োজন হইত এবং কলিকাতা হইতে তখন বারাকপুর, দমদমা, হাবড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে গো-মাংস রীতিমত চালান যাইত। গুরুদেব গদাই ঠাকুর একদিন মনে মনে ভাবিল "একজন মুসলমান কশাইকে এই বুড়ী গাভীটা বিক্রয় করিলে অন্তত ২০৲ টাকা প্রাপ্ত হইব, তাহাই করা যাউক। এই বুড়ী গাভী হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না এবং অন্য উপকারও নাই, তবে ইহাকে অনর্থক রাখিয়া ফল কি? আমার শিষ্যেরা আমার বাটীতে আসিয়া স্বচক্ষে গাভী দেখে না এবং কখনও দেখিবে না, ইহাও নিশ্চিত; তাহাদিগকে বিক্রয়ের কথাটার উল্লেখই করিব না। গাভী জীবিতা আছে এবং রীতিমত যত্নে প্রতিপালিতা হইতেছে, ইহাই কহিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে প্রবোধ দিব।" গদাই ঠাকুর এইরূপ ভাবিয়া বাস্তবিক একদিন গাভীটাকে একজন মুসলমান কশাইয়ের নিকটে ১৮৲ টাকায় বিক্রয় করিল। উমাবাবুর বাটী হইতে গাভী লইয়া যাইবার ঠিক একমাস পরে এই ঘটনা ঘটে।

ছয়দিবস মাত্র গাভীটি কশাইয়ের বাটীতে ছিল। সপ্তম দিবসে হত্যা করিবার নিমিত্ত,মুসলমান কশাই নিকটবর্ত্তী কশাইখানায় তাহাকে লইয়া গেল। সেখানে গাভীটাকে বাঁশের একটা খোঁটায় বাঁধিয়া, একটু দূরে আর একজন কশাইয়ের দোকানে শাণিত ছুরিকা আনিবার জন্য গমন করিয়া গল্প করিতে করিতে তামাকুর ধূমপানে নিযুক্ত হইল। হত্যাবসরে গরুটা খোঁটা খুলিয়া দৌড়িতে লাগিল।

সে অনেকদিন উমাবাবুর বাটীতে ছিল,. জানি না কিরূপে দৌড়িয়া দৌড়িয়া অবশেষে উমাবাবুর বাটীতে আসিয়া গাভী উপস্থিত হইল। জমিদারবাবু তখন মঞ্জনের দ্বারা দন্তধাবন করিতেছিলেন, হঠাৎ অঞ্জনা গাভীটাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের গরু কি করিয়া এখানে আসিল?" চাকরেরা বলিল, "হুজুর! বোধ হয় গুরুদেবের বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। এখন ইহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া দিই, পরে গুরুদেবের বাটীতে পুনরায় গাভীকে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।" বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরে শাণিত ছুরিকা হস্তে, ভীষণমূর্ত্তি শ্রীমান্ কশাই, শ্রীযুক্ত উমাবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত!! বাবু চমৎকৃত হইয়া কশাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন?" কশাই কহিল "হুজুর! আমার কশাইখানা হইতে একটা বুড়ী গাভী খোঁটা খুলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া আপনার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে। আমি ঐ গাভীকে ধরিতে পারি নাই; কিন্তু ইহাকে লক্ষ্য রাখিয়া উহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়াছি।" উমাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গাভী কোথায় পাইলে?" কশাই বলিল, "হুজুর! গদাই ঠাকুর নামে এক ব্রাহ্মণ আমাকে ইহা বিক্রয় করিয়াছে, আমি এই গাভীকে হত্যা করিয়া ইহার মাংস বিক্রয় করিব। আমি কশাই, মাংস বিক্রয় করা আমার ব্যবসা।" বাবু কহিলেন, "তুমি ইহাতে কত টাকা লাভ করিতে পারিবে মনে করিয়াছ?" কশাই বলিল, "হুজুর! ১৮৲ টাকায় গরু খরিদ করিয়াছি, ২৫৲ টাকার মাংস বিক্রয় হইতে পারে। উমাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা! তোমাকে আমি ৩০৲ টাকা দিতেছি, এই গাভী আমার নিকট বিক্রয় কর।" কশাই তাহাতে সম্মত হইয়া ৩০৲ টাকা গ্রহণপূর্ব্বক আহ্লাদিত অন্তঃকরণে দোকানে ফিরিয়া গেল।

হরিবোল হরি!! ঠিক এই ঘটনার কয়েকঘণ্টা পরে শ্রীশ্রীশ্রীগুরু-

দেব গদাই ঠাকুর, তাহার বিপুল বপুখানিকে অলকা-তিলকায় সুরঞ্জিত করিয়া, তদুপরি নবীন "নামাবলী"র আবরণ ব্যবহার করিয়া, কপালে রক্তচন্দনের বড় বড় ফোঁটার চিত্র করিয়া, সুলম্বমান টিকিতে সুদৃঢ়রূপে বিল্বপত্র বাঁধিয়া, হস্তে কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক কাষ্ঠপাদুকা-(খড়ম)-সংযুক্ত পদে সাধুর ন্যায় অগ্রসর হইয়া, রুদ্রাক্ষমালাবৃত গলদেশ হেলাইতে হেলাইতে, শিষ্য শ্রীযুক্ত উমাবাবুর বাটীতে শুভাগমন করিলেন। তাহার কর্কশ কণ্ঠ হইতে ঘনঘন শব্দ হইতে লাগিল—

হর বম্ বম্ ববম্ বম্!
হর বম্ বম্ ববম্ বম্!
তারা! দয়াময়ি, ব্রহ্মময়ি,
ত্রিতাপনাশিনি!
(ইত্যাদি)

গদাই ঠাকুরকে দর্শনমাত্রেই অতীব ক্রোধাগ্নিতে উমাবাবুর সর্ব্ব-শরীর জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভুর এক্ষণে কোথা হতে শুভাগমন হলো? শ্রীমান্ প্রভু ঘনঘন হর হর বম্-বম্ শব্দ উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমরা হচ্ছি কলিকাতার লোক—গঙ্গাতীরবাসী ব্রাহ্মণ! অহো ব্রাহ্মণশব্দ কি ব্রহ্মত্বজ্ঞাপক! বৎস! পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে কি ব্রহ্ম-কুলে জন্ম হয়? আমাদের প্রত্যহ গঙ্গাস্নান না কোল্লে কি চলে হে? সেই পতিতপাবনী, মোক্ষদায়িনী, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, সুরধুনী গঙ্গার জলে শিবপূজা সমাপনপূর্ব্বক আমি বাটী যাইতেছিলাম, এদিকের পথে আগমন করায় তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কোত্তে এলাম, তদ্ভিন্ন তোমার গর্ব্ভধারিণীর সহিতও একবার দেখা করবার ইচ্ছা আছে।" উমাবাবু কতকটা গোপনে ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "অঞ্জনা গাভীকে লইয়া আসিয়া এই বামুনের সম্মুখে উপস্থিত কর।" গাভী দেখিয়াই

গদাই ঠাকুরের মুখ ম্লান হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল এবং জিহ্বায় বাক্‌শক্তি প্রায় রহিত হইয়া আসিল। উমাবাবু কশাইয়ের কথা ব্রাহ্মণকে শুনাইলেন, ভণ্ডগুরু সে কথা শুনিয়া আর উত্তর করিতে পারিল না। বাবু কহিলেন, "আপনাকে গুরু বলিয়া মান্য করিয়া আসিয়াছি এবং পুনঃপুন গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, এজন্য আপনার আর কোনপ্রকার অপমান না করিয়া, একটা নূতন ধরণের শিক্ষা আপনাকে দিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা বলিয়া, বাক্স হইতে সুদীর্ঘ শাণিত কাঁচি হাতে লইয়া, মুহূর্ত্তকালমধ্যে গদাই ঠাকুরের সুলম্বমান টিকি কাটিয়া লইলেন এবং তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়া আদেশ দিলেন, "আর তুমি আমাদের বাটীতে কখনও আসিও না, আসিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে।"

পরদিবসে, উমাবাবু তাঁহার গোমস্তাকে একটা বৃহদাকার আলমারি খরিদ করিতে হুকুম দিলেন। আলমারি আনীত হইলে, জমিদারবাবু ঐ আলমারির মধ্যে গদাই ঠাকুরের টিকিটি সযত্নে সংস্থাপন করিয়া, কাগজের টিকিটে (Ticket) বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিলেন—

টিকি নং ১
অপরাধী—গদাই ঠাকুর।
অপরাধ—প্রবঞ্চনা ও গোহত্যা।

পাঠকমহাশয়! আপনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, আমাদের উমা-বাবু এইরূপে অনেক ভণ্ড বামুনের মাথার টিকি কাটিয়া লইয়াছিলেন, এইজন্য কলিকাতা-অঞ্চলে তিনি এখনও "টিকিকাটা জমিদার" বলিয়া খ্যাত। ভণ্ড বামুনেরা তাঁহার নাম শুনিলেই ভীত হইত, তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া যাইতে সাহস করিত না, ঘটনাচক্রে সুলম্বটিকি-সংযুক্ত ভণ্ড ব্রাহ্মণ উক্ত জমিদারের বাটীর নিকটে পৌছিলে, গামোছা

বা কাপড়ের দ্বারা টিকি ঢাকিয়া ফেলিত। আমার একজন বন্ধু একবার ঐ আলমারি দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, উহা অপূর্ব্ব পদার্থ বটে! তখন ৩৬খানা টিকি মজুদ ছিল, কতকগুলি অপূর্ব্ব টিকির পরিচয় দিতেছি :—(অপরাধীদিগের প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া কল্পিত নাম ব্যবহার করিলাম। উপাধিগুলি অবিকল অপরিবর্ত্তিত ভাবে রাখা গিয়াছে।)

টিকি নং ১৩

অপরাধী—উমেশ ঠাকুর (চূড়ামণি)।

অপরাধ—যবনীসংস্রব।

টিকি নং ১৯

অপরাধী—কৈলাস ঠাকুর (তত্ত্বনিধি)।

অপরাধ—যুগীর গৃহে অন্নভোজন।

টিকি নং ২৫

অপরাধী—কানাই ঠাকুর।

অপরাধ—মুসলমানের সহিত একত্রে আহার।

টিকি নং ২৭

অপরাধী—ভুবন ঠাকুর।

অপরাধ—জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া শিষ্যের সর্ব্বনাশ করা।

টিকি নং ২৮

অপরাধী—আশু ঠাকুর।

অপরাধ—ভয়ানক মিথ্যা কথা দ্বারা সোণাগাছি ও মেছোবাজারের বেশ্যাদিগের স্বর্ণালঙ্কার ফাঁকি দেওয়া।

টিকি নং ৩২

অপরাধী—গোবিন্দ ঠাকুর (বিদ্যানিধি)।

অপরাধ—মন্ত্রশিষ্যের বিধবা কন্যাকে বিপথগামিনী করা।

টিকি নং ৩৩

অপরাধী—রামকান্ত শর্ম্মা (বিদ্যাবাগীশ)।

অপরাধ—বৈমাত্রেয় শ্রীধর শিরোমণির সঙ্গে সুরাপান করিয়া গরাণহাটার মোড়ে এক ধোবার বাড়ীতে ৪ দিন অবস্থান, তাহার অন্নভোজন এবং অশাস্ত্রীয় মতে ৺শীতলা দেবীর পূজা করা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাঠকমহাশয়! টিকিকাটা জমিদারমহাশয় কিংবা গদাই ঠাকুর আর জীবিত নাই, কিন্তু বঙ্গদেশে—কেবল বঙ্গদেশে কেন, ভারতের এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র—এখনও গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গদাই ঠাকুরের সংখ্যা কমে নাই।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

—০—

বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীচরিত্র।

স্ত্রীচরিত্রের চরম বিকাশ যে শুদ্ধ পত্নীত্বে নহে, মাতৃত্বে, তাহা জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের পূজনীয় বিশুদ্ধাত্মা ঋষিগণই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই বৃদ্ধ মনু উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়াছিলেন—

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।"

"প্রজনার্থং মহাভাগা"—মাতৃত্বের জন্যই স্ত্রীলোকের গৌরব, সন্তান-জননী বলিয়াই তাঁহারা শ্রদ্ধাধিকারিণী।

এই পরমপবিত্র মাতৃভাবের ব্রহ্মচর্য্য ভিত্তিভূমি এবং পতিসেবা ইহার মধ্যবিন্দু। এই মাতৃত্ব অকলঙ্ক ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বিবাহ এবং এই পূর্ণমাতৃত্বলাভই বিবাহের চরম লক্ষ্য।

এই পরিপূর্ণ মাতৃত্বের মহিমোজ্জ্বল আদর্শ এই ভারতবর্ষে যেরূপ

সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত এবং সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই—এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

বৃদ্ধ বাল্মীকি আদর্শজননীমূর্ত্তি জনকদুহিতার মাতৃত্বের চিত্র এমনি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁহাকে "মা জানকী" ভিন্ন অন্য কোন সম্বোধনে ডাকিয়া, হৃদয় তৃপ্তিলাভ করে না। পতির প্রতি তাঁহার অবিচলিত অনুরাগ, তাঁহার অনন্ত অপরিমেয় হৃদয়ভরা প্রেম, তাঁহার পরিপূর্ণ মাতৃহৃদয়ের গুহাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, তাঁহার উচ্ছলিত মাতৃ স্নেহকে শতধারায় প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার দাম্পত্যপ্রেম—লক্ষ্মণের প্রতি সরল বাৎসল্য, হনুমানের প্রতি কোমল স্নেহভাব, অত্যাচারকারী পরমপাপিষ্ঠ দশাননের প্রতি পর্য্যন্ত মাতৃহৃদয়ের অন্তহীন ক্ষমার মধ্যে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা সহজে লক্ষ্য করাই যায় না—অথচ অনুভবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। ইহাই ভারতবর্ষীয় রমণীপ্রেমের অপূর্ব্ব চিত্র। এ প্রেমে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে না, অসংযম থাকে না, অভিমান ও আত্মহত্যার আশঙ্কা থাকে না।

প্রেমের সবল অহিতকর আবেগ, অমঙ্গলকারী চঞ্চলতা, স্বার্থপর বিলাসিতা, মাতৃত্বের প্রশান্ত অবিচল সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। মাতৃত্বটুকুই জাগিয়া থাকে, পত্নীত্বটুকু অন্তরালে রহিয়া যায়।

তাই ইংরাজের মত আবেগাতিশয্যে সর্ব্বসমক্ষে স্ত্রীকে চুম্বন বা আলিঙ্গন করিয়া প্রেমোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে আমরা সহজেই সঙ্কুচিত হই এবং ইংরাজ যেখানে স্বচ্ছন্দচিত্তে পরস্ত্রীকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘূর্ণনৃত্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, আমরা সেখানে পরস্ত্রীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করি না। হিন্দুনারীর মুখে মাতৃত্বের পবিত্র কোমলভাব এমন সুস্পষ্ট ফুটিয়া থাকে যে, তাঁহার সাক্ষাতে কোনপ্রকার চাঞ্চল্য, কোনপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতে সঙ্কোচ হয়। অনেকে বাহিরে মদ্যপানাদি করিয়া, তাণ্ডবনৃত্য করিয়া থাকে; কিন্তু সেই অপবিত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বাটীতে লইয়া আসিতে সাহস করে না। এই সুপবিত্র মাতৃভাবই আজও এই অধঃপতিত সমাজের মধ্যেও নিতান্ত অশিক্ষিত পাষণ্ডের নিকট হইতেও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ রহিয়াছে। অতি দুরাচারও সহসা স্ত্রীলোকের শরীর স্পর্শ করিতে সাহস করে না, সসম্ভ্রমে স্ত্রীলোকের পথ ছাড়িয়া দেয়।

কিন্তু মাতৃত্বের নির্ম্মল সুপবিত্র মহোচ্চ শিখর হইতে শুদ্ধ পত্নীত্বের সানুদেশে অবতীর্ণ হইলে, স্ত্রীলোকের বিপুল মর্য্যাদা বহুপরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

ইউরোপ এখনো মাতৃত্বের উচ্চ আদর্শ ধারণা করিতে পারে নাই। রমণীকে সঙ্গিনী অপেক্ষা উন্নত দেখে না। সেখানে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদাও অনেক অল্প। ইউরোপে সুরাপানে উন্মত্ত অবস্থায় স্ত্রীকে লগুড়াদির দ্বারা প্রহার করা যেরূপ সচরাচর ঘটিয়া থাকে, এদেশে সেরূপ ঘটনা একেবারে বিরল। স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করা, ইউরোপে একটা ভদ্ররীতির মধ্যে এবং তাহার সঙ্গে একটু ভদ্রতা বাঁচাইয়া রসিকতা করাও প্রশংসনীয়।

কিন্তু রমণীর মাতৃমূর্ত্তি যাহাদের চক্ষে উদ্ভাসিত, তাহারা তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের আলোচনা করিতেই কুণ্ঠিত হয় এবং পাছে এরূপ আলোচনায় হৃদয়স্থিত মাতৃমূর্ত্তির মোহনচ্ছবি কলঙ্কস্পৃষ্ট হয়, তাই দূরদর্শী শাস্ত্রকার স্ত্রীলোকের রূপ বা হাবভাব সম্বন্ধে চিন্তা করিতেও নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে রমণীর এই মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্ত্তি আমাদের চক্ষু হইতে ক্রমশ অন্তর্হিত হইতেছে এবং রমণীদেরও এমন কোন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না, যাহাতে তাহারা মাতৃত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে।

আজকালকার স্ত্রীলোকদের শিক্ষা অধিকাংশই উপন্যাসাদি-পাঠেই পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান উপন্যাসের অধিকাংশ তাহার মাতৃত্বলাভে সহায়তা করে না। যাঁহার উপন্যাসের প্রভাব শিক্ষিত বাঙালীর অন্তঃপুরে বহুবিস্তৃত এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, সেই স্বনামধন্য মহাপুরুষ বঙ্কিমবাবুও আমাদের দুর্ভাগ্যবশত এ বিষয়ে তাহাদের সাহায্য করেন নাই।

বঙ্কিমবাবু আমাদের বঙ্গভাষার এত উপকার, এত সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে কৃতজ্ঞতা ব্যথিত হয় এবং তাঁহার দোষোদ্ঘাটন না করিয়া, তিনি আমাদের যাহা দিয়াছেন, তাহারই জন্য তাঁহাকে অগণ্য সাধুবাদ দিতে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু মানুষের আশা অতর্পণীয়া—"যে যত পায়, সে তত চায়।" তাই বঙ্কিমবাবুর নামেও অনুযোগ করিতে ইচ্ছা করে, এ অনুযোগ, স্নেহের অনুযোগ। সকলে স্বীকার করিবেন কি না, জানি না; কিন্তু আমার মনে হয়, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে পাশ্চাত্যপ্রভাব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। তিনি তাঁহার স্ত্রী-চরিত্রের আদর্শে কতকটা পাশ্চাত্যভাবের অনুসরণ করিয়াছেন, মনে হয়। তাঁহার কোন চরিত্রেই মাতৃভাবের পূর্ণবিকাশ প্রতীয়মান হয় না।

তাঁহার "সূর্য্যমুখী," তাঁহার "ভ্রমর" পতিপ্রেমে অতুলনীয়া, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের সমুজ্জ্বল পতিপ্রেমকে আচ্ছন্ন করিয়া মাতৃহৃদয়ের একটা কোমল স্নেহোচ্ছ্বাস কই দেখা যায়?

ভ্রমরের স্বচ্ছ-সরল বালিকার প্রেম, সেই সুমধুর প্রিয়সম্ভাষণ, স্বামীর প্রতি অভিমান,—অতি সুন্দর, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে "আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং" সমুদ্রের ন্যায় মাতৃস্নেহে, প্রেমের সকল চাঞ্চল্য, সকল আড়ম্বর নীরবে মিশিয়া যায়, সে পরিপূর্ণ মাতৃহৃদয়ের পরিচয় কোথায়?

সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরের চরিত্রে মাতৃত্বের উপকরণ যে যথেষ্ট আছে, সূর্য্যমুখীর কুন্দের প্রতি স্নেহে এবং ভ্রমরের রোহিণীর দুঃখে সহানুভূতিতে

তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু কবি যে ভাবে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে পতিত্বের উজ্জ্বলপ্রভায় মাতৃত্ব ম্লান হইয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্যপ্রভাব যে গ্রন্থকারের চক্ষে মাতৃত্ব অপেক্ষা পত্নীত্বের মূর্ত্তিকেই উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা নানাপ্রকারে অনুমান করা যায়। বঙ্কিমবাবুর সমস্ত স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে একমাত্র "কমলমণিই" পুত্রবতী। "ভ্রমরে"র একটী ছেলে হইয়াছিল বটে; কিন্তু সূতিকাগৃহেই তাহার ইহলোকলীলা শেষ হইয়াছিল। "কমলমণি"তেও মাতৃত্ব অপেক্ষা পত্নীত্বই অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। "খোকা" কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের দাম্পত্য-উচ্ছ্বাস-প্রকাশের উপলক্ষ্যমাত্র হইয়াছে। "শান্তি"কে যে ভাবে তিনি স্বামীর সহধর্ম্মিণী করিয়াছেন, তাহাতে মাতৃত্ব ব্যথিত হয়। মাতৃত্বের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিলে, তিনি এ পথে চলিতে পারিতেন না।

"দেবী চৌধুরাণী"তে গ্রন্থকার স্ত্রীজাতির নিষ্কামধর্ম্মশিক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বত্র মাতৃত্ববিকাশের অনুকূল নহে।

মাতৃপ্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া সর্ব্বত্র সন্তানস্নেহ বিস্তার করে, পতিপ্রেম অপেক্ষা ইহা বহুবিস্তৃত, পতিপ্রেম ইহার উৎস; কিন্তু উদ্বেলিত স্নেহ-স্রোতে এ উৎস চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায়।

ভাগীরথীর অনন্ত-প্রসারিত শান্ত-সুগভীর জলরাশি দেখিয়া, তাহার নির্ম্মল পর্ব্বত-পার্শ্ব-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র চঞ্চল উৎসের কথা কাহার মনে পড়ে?

মাতৃত্ব বিকশিত হইলে, পতিপ্রেম আর তেমন জলন্ত-বহ্নি-প্রতিম মনে হয় না; বিপুল মাতৃস্নেহের অন্তরালে তাহার স্নিগ্ধ-মধুর সুকোমল আভামাত্র অনুভব করা যায়।

কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোন চরিত্রেই তাহা দেখা যায় না। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে এই মাতৃত্ব বিকশিত হইবার বিশেষ সুযোগ পায়, নানা

ব্যক্তিকে স্নেহ করিয়া হৃদয় প্রসারিত হয় এবং মাতৃভাব জাগ্রত হইয়া উঠে। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে একান্নবর্ত্তী পরিবারের চিহ্ন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্যমুখীর পরিবারে কিছু বাহিরের লোক ছিল; কিন্তু সূর্য্যমুখীর সঙ্গে তাহাদের বিশেষ কোন সংস্রব ছিল না। তিনি একান্তে স্বামীর সঙ্গে মধুর প্রণয়সম্ভাষণে নিমগ্ন থাকিতেন।

বঙ্কিমবাবুর নায়িকাগুলি সকলেই কিছু স্বতন্ত্র, কিছু স্বার্থপর। স্বামী ভিন্ন সংসারের অপর সকলের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য। গৃহকর্ম্মে তাঁহাদের রুচি নাই, সংসারের মঙ্গলসাধনে স্পৃহা নাই। একান্তে স্বামীর কাছে প্রণয়ের প্রতিদান পাইয়াই পরিতৃপ্ত। কিন্তু হিন্দুললনার মাতৃত্বলোলুপ নারীহৃদয় ইহাতে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না, ইহাই হিন্দু আদর্শ। প্রেম মঙ্গলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবে, কোথাও মঙ্গল অতিক্রম করিবে না, ইহাই ভারতের প্রণয়চিত্র। প্রেমই সর্ব্বস্ব, প্রেম সর্ব্বোচ্চ মঙ্গলকে অতিক্রম করিলেও, তাহা আদরণীয়। এ আদর্শ পাশ্চাত্য, আমাদের নহে। মঙ্গলযুক্ত দাম্পত্য-প্রেমই মাতৃত্ব। যতক্ষণ পতিপ্রেম মাতৃত্বের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ তাহার মঙ্গলকে অতিক্রম করিবার আশঙ্কা যায় না; কারণ, ততক্ষণ প্রেম সংযত হয় না।

দুর্ভাগ্যবশত বঙ্কিমবাবু আমাদের স্ত্রীলোকদের এই পাশ্চাত্য পত্নীত্বের আদর্শের ঊর্দ্ধে শান্ত-শুভ্র সুবিমল মাতৃত্বের ধ্রুবলোকে লইয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি পতিপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন এবং ইহাকেই রমণীর চরমলক্ষ্যরূপে তাঁহাদের চক্ষুর সমক্ষে ধরিয়াছেন। এই আদর্শ অনুসৃত হইলে সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, কমলমণি জন্মিতে পারে; কিন্তু ভগবতী দেবী, মহারাণী শরৎসুন্দরী, রাণী ভবানী, মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতির জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

অবশ্য সূর্য্যমুখী-ভ্রমর উপেক্ষার বস্তু নহে; কিন্তু হিন্দুর মাতৃত্বের

আদর্শ ধরিলে, সূর্য্যমুখী-কমলমণি আমরা পাইতামই, আরও কিছু বেশী পাইতাম।

সংসারের আর একটা চিরন্তন নিয়ম এই যে, অনুকরণকারীরা দোষের ভাগই উত্তমরূপে অনুকরণ করে, গুণের ভাগ তেমন অনুকরণ করিতে পারে না।

ভ্রমরের পতিপ্রেম অনুকরণ করা সহজ নহে; কিন্তু ভ্রমরের ছেলেমানুষী, তাহার গৃহকর্ম্মে শৈথিল্য, তাহার গভীর আলস্যের মধ্যে দিনযাপন, তাহার দারুণ অভিমান, এ সব অনুকরণ করা খুব সহজ। সূর্য্যমুখীর তন্ময়তা সহজলভ্য নহে; কিন্তু স্বামীর উপর অভিমান করিয়া গৃহত্যাগ করা (অন্তত পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়া) খুব সহজ, সন্দেহ নাই। "কুন্দ"র মত নীরব সংযত ভালবাসা লাভ করা সুকঠিন, কিন্তু প্রেমলাভে বঞ্চিত হইলে বিষ খাওয়া কঠিন নহে।

যদি বঙ্কিমবাবু হিন্দু-আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরিপূর্ণ মাতৃত্বের ছবি আঁকিতেন, তাহা হইলে এই অধঃপতিত সমাজের কত-না উপকার হইত! তাঁহার মত প্রতিভাশালী মহাপুরুষ এইরূপ অঙ্গহীন চিত্র অঙ্কিত করায়, আরও গুরুতর অপকার হইল। ক্ষুদ্র লেখক এত অপকার করিতে পারিত না; কারণ, সে নিজে যাহা কিছু অনিষ্ট করুক, অপর লেখকে তাহার অনুসরণ করিত না।

কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের শীর্ষস্থানে সমাসীন বঙ্কিমবাবু এই পথ প্রদর্শন করায়, অনেকেই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন; কাজেই এই অমঙ্গলবিষ সমাজের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে।*

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

* আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের সহিত কোথাও মত ভেদ, তাহা সময়ান্তরে ভিন্ন প্রবন্ধে বলিব। সঃ সঃ

ধ্বন্যাত্মক কবিতার উপযোগিতা।

বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম রথী আমাদের স্বভাবকবি রবীন্দ্রনাথ "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা"র ৭ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় "বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার পরে প্রথম বর্ষের আশ্বিন-কার্ত্তিকের "প্রবাসী" পত্রে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও "ধ্বন্যাত্মক কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধে কবিবর ভারতচন্দ্র ও লালা জয়নারায়ণ প্রভৃতির কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দসমূহের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়াছিলেন।

অদ্য আমরা ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কবিগণের ধ্বন্যাত্মক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ইহার উপযোগিতাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বঙ্গীয় প্রাচীন কবিতা শব্দময়ী, তাহার ভাব অপেক্ষা শব্দাড়ম্বরই অধিক; অনুপ্রাসই তখনকার কবিতার প্রাণ। ধ্বন্যাত্মক কবিতাও অনুপ্রাসের অন্তর্গত; সুতরাং ইহা বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণের অতি প্রিয় ছিল। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস তদীয় কবিতায় অধিক অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ধ্বন্যাত্মক কবিতাও তাঁহার কবিতায় দৃষ্ট হয়, যথা :—

পুছইতে কহই গদ-গদ বোল।
ঢর-ঢর লোচনে হেরি মুখ মোর॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বহু পুন ধন্দ।
দর-দর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ॥

(পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী)

"দুর্গাপঞ্চরাত্রি"র কবি লিখিয়াছেন, যথা :—

কোটি কিঙ্কিণি রণ রণ রণ
কর কঙ্কণ ঝন ঝন ঝন
বোলয়ে অসি ঠন্ ঠন ঠন
সঘনে অসি চমকে।

প্রতিভাবান্ লেখক রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে বঙ্গসাহিত্যে ইহার উপযোগিতাসম্বন্ধে প্রথমেই বলিয়াছেন :—"ধ্বন্যাত্মক-শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে, বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে।" বর্ণনাস্থলে ধ্বন্যাত্মক-শব্দ-ব্যবহারের সুবিধা এই যে, ধ্বনিবৈচিত্র্য এত সহজে বর্ণনাবৈচিত্র্যের অবতারণা করিতে পারে যে, তাহা অর্থবদ্ধ শব্দ-দ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। উদাহরণস্থলে রবিবাবু বলিতেছেন, ""শাঁ" করিয়া চলিয়া গেল এবং "গট্ গট্" করিয়া চলিয়া গেল, উভয়েই এক দ্রুতগতি প্রকাশ করিতেছে,—অথচ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা অন্য উপায়ে প্রকাশ করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়।"

এক্ষণে ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক ও তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণের ধ্বন্যাত্মক-কবিতা আলোচনা করা যাউক। তাঁহার সমসাময়িক ও সহচর কবি রামপ্রসাদও ধ্বন্যাত্মক-কবিতা-রচনার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই, যথা :—

পয়জার চট্ চট্ কিল গুম্ গুম্।
আঁকপাক ঘুরাইল আর কোথা ঘুম॥

বঙ্গসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের পরই কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের স্থান নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ধ্বন্যাত্মক-কবিতা-রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র ভারতচন্দ্র অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। তাঁহার কবিতাবলীর অধিকাংশই ধ্বন্যাত্মক শব্দে পূর্ণ। তাহার সকলগুলি উদ্ধৃত করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

নয়। প্রকৃতিবর্ণনায় ঈশ্বর গুপ্তের ধ্বন্যাত্মক-কবিতা কেমন সংক্ষেপে সরল কথায় বর্ণিত হইয়াছে :—

সন্‌সন্ স্বরে সেজে, ঝম্‌ঝম্ মাঝে মাঝে
শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার।
চক্‌মক্ চিকিমিকি, ধক্‌ধক্ ধিকিধিকি
সুচঞ্চল চপলার মালা।

উক্ত-কবিতা-কথিত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ছাঁটিয়া-ফেলিয়া যদি কোন কবি বর্ষা বর্ণনা করেন, তবে তাঁহাকে নিশ্চয় বিস্তর কথার সাহায্য লইতে হইবে এবং তাহা এত অল্পে ও এত সহজে কখনই হৃদয়ঙ্গম হইবে না। বক্তব্য বিষয় অতি সংক্ষেপে যথাযথ বর্ণনা করিতে হইলে, ধ্বন্যাত্মক-কবিতার সাহায্য লওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নে কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা গেল :—

কট্‌কট্ কটাকট্ টক্ টক্ টক্
ঠুনো ঠুনো ঠুন্‌ঠুন্ ঢক্ ঢক্ ঢক্॥
চুপ্‌চুপ্ চুপ্‌চুপ্ চপ্ চপ্ চপ্।
সুপ্‌সুপ্ সুপ্‌সুপ্ সপ্ সপ্ সপ্॥
ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্‌ঠক্ ফস্ ফস্ ফস্!
কস্‌কস্ টস্‌টস্ ঘস ঘস্ ঘস্॥

পাঠক উপরি-উদ্ধৃত ধ্বন্যাত্মক-কবিতা কোন্ বিষয়ের বর্ণনা, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির টেবেল পার্টি প্রভৃতিতে খানা খাইবার কালে সাহেবেরা টেবিলে বসিয়া খানা খাইতেছেন, আর পরিবেষক বাবুর্চ্চিগণ তাহাদের খানা সরবরাহ করিতেছে; সাহেবেরা কাঁটা-চামচ দ্বারা চর্ব্বিমিশ্রিত মাংসরাশি ছুরির দ্বারা "কট্‌কট্ কটাকট্" কাটিয়া, চিনের ডিস্ হইতে টক্‌টক্

তুলিয়া লইয়া, চপ্‌চপ্ করিয়া চর্ব্বণ করিতেছেন। বাবুর্চ্চি সুরাপাত্র হইতে এক-এক "পেগ্" সুরা ঠুনো ঠুন্‌ঠুন্ ঢক্‌ঢক্ করিয়া ঢালিয়া দিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে গরম গরম চা বাটি-বাটি সাহেবদের সম্মুখে ধরিতেছে, তাহারা সুপ্‌সুপ্ সপ্‌সপ্ শব্দে চা পান করিতেছে, শেষে ঠকাস্ ঠকাস্ শব্দে সোডা-লেমনেডের বোতল খুলিয়া, আইস্‌প্রুফ্ গ্লাসে কস্‌কস্ ফস্‌ফস্, ক্রমে টস্‌টস্, ঘস্‌ঘস্ শব্দে সোডা-লেমনেড ঢালিয়া দিতেছে। এ বর্ণনা ও বর্ণনীয় বিষয় যেন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। এই কারণে রবীন্দ্রবাবু উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে বলিতেছেন :—"অর্থাত্মক শব্দে পরিমাপকার্য্যের সাহায্য করে এবং তাহা বুঝিতে হইলে বর্ণনা ছাড়িয়া সঙ্কেতের সাহায্য লইতে হয়। বস্তুত এই সঙ্কেতপ্রণালী পদ্যেই প্রচলিত,—বিশেষ প্রকৃতি ও যুদ্ধাদির বর্ণনায় অথবা বর্ণিত বিষয়ে হাস্যরসের অবতারণায়; গদ্যে ইহার আদৌ প্রচলন নাই। কেন নাই, তাহা বুঝাইবার জন্য রবিবাবু গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ বুঝাইয়া, ইহার সঙ্কেত-ভাব সুব্যক্ত করিয়াছেন।

যে যে স্থলে ধ্বন্যাত্মক-কবিতা-সাহায্যে স্বল্পকথায় কবিতা লেখা চলে, সেখানে বিস্তর কথায় বর্ণনা না করিয়া, অল্প কথায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাহায্য লওয়া কর্ত্তব্য। উদাহরণস্বরূপ বাংলার শ্রেষ্ঠতম কাব্য "পলাশীর যুদ্ধ" পুস্তকের একটি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এহেন সুন্দর কবিতাও ধ্বন্যাত্মক-শব্দ-বর্জ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের "ভীম-ভৈরব ভাব" পাঠকের মনে অঙ্কিত করে না :—

"বৃটীশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।"

কিন্তু "সে ধ্বনি" কি? যে ধ্বনি শুনিলে রণস্থলে সৈনিকহৃদয়

কাঁপিয়া উঠে, গঙ্গাজল কাঁপিয়া উঠে, আম্রবন কাঁপিয়া উঠে, এমন ভয়ঙ্কর শব্দ কিরূপ ; তাহা শব্দসহযোগে বলিয়া না দিলে, কেবল সৈনিক ও জনকয়েক কমিসারিয়েটের কেরাণীর বোধগম্য হয় ; অন্যে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পলাশীর যুদ্ধের কবি আর একস্থলে কেবল একটিমাত্র ধ্বন্যাত্মক-শব্দে রণবাদ্যের ভীম-ভৈরব ভাব প্রকাশ করিয়াছেন :—

"ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি বৃটীশ বাজনা" ইত্যাদি।

এস্থলে বলা উচিত যে, ধ্বন্যাত্মক শব্দ কাব্যের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক নহে ; কিন্তু উহা যে সহজে অর্থজ্ঞাপক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অধিকন্তু সুকুমারমতি শিশুদিগের কোমল হৃদয়ে সহজে ও সরলভাবে কাব্যের সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিয়া দেয়। এই কারণে শিশুকবিতাপুস্তকে প্রকৃতি-বর্ণনাকালে প্রায় তাবৎ কবিই ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাহায্য লইয়াছেন। ইহা আমাদের দেশের একপ্রকার "কিণ্ডারগার্টেন"-(Kindergarten)-শিক্ষাপ্রণালী। শৈশবে ভাব অপেক্ষা ভাষার চটকে শিশুহৃদয় সহজেই মুগ্ধ হয় বলিয়া, বোধ হয় বঙ্গভাষার আদি-কবিতা "ছেলেভুলান ছড়া"গুলি প্রায় ধ্বন্যাত্মক শব্দে পূর্ণ। "বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর, নদী এলো বাণ" নামক ছেলে-ভুলান ছড়ায় "টাপুর-টুপুর" শব্দে বৃষ্টিপতনের ভাব যেমন সহজে বুঝিয়া লয়, "বৃষ্টি পড়িতেছে" বলিলে তেমন সহজে বুঝে না। শিশুহৃদয়ে ঝড়ের বিষয় সহজে অঙ্কিত করিতে হইলে, শিশুপাঠ্য "পদ্যমালার" কবির ন্যায় ধ্বন্যাত্মক-শব্দ-সাহায্যে ঝড়-কবিতা লেখা উচিত। পদ্যমালার "ঝড়" বর্ণনা দেখুন :—

হুড়হুড় হুড়হুড় মেঘ ডাকিছে।
হড়হড় কড়কড় বাজ পড়িছে।

ইত্যাদি

প্রকৃতি ও যুদ্ধ বর্ণনার ন্যায় হাস্য ও বিদ্রূপ রসের অবতারণাতেও ধ্বন্যাত্মক-শব্দ-প্রয়োগে কবিতা সরস ও হৃদয়গ্রাহী হয়। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের পরিহাসরসাত্মক কবিতামালায় ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দৃষ্ট হয়। প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

প্রস্তাব।

সম্পাদকমহাশয়,

আমাকে আর আপনার কাগজে "রহস্য" লিখিতে অনুরোধ করিবেন না, কারণ এতদিনে বুঝিয়াছি,

"—রসস্য নিবেদনং মা লিখ মা লিখ।"

বিশেষত আমি স্থির করিয়াছি, এবার লঘু বিষয় ছাড়িয়া গুরু বিষয় আলোচনা করিব, নহিলে অমরত্বলাভের সম্ভাবনা নাই। আপনি ইহাতে বাদী হইবেন না, যদি হন, তবে আপনার অবস্থা ঐরাবতের মত হইবে *।

"পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি" ইত্যাদি জানেন ত! সুতরাং বেশী কিছু বলিবেন না।

এখন আসল কথা শুনুন। আমি উপন্যাস লিখিতাম, কিন্তু উপসংহারের ভয় রাখি। কবিতা লিখিতাম, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের তালিকা প্রস্তুত নাই। পুরাতত্ত্ব লিখিব ?—Asiatic Researches-এর সমস্ত সংখ্যা ত একত্র করিতে পারি নাই। গল্প লিখিব ?—হকারের

* ইহার দ্বারা কেহ মনে না করেন, সমালোচনার সম্পাদক "হাতী-মার্কা"।

দোকান হইতে প্রাচীন বিলাতী ম্যাগাজিন্ সংগ্রহ করি নাই। বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিব?—তর্জ্জমার উপযোগী পরিভাষা পাই না। সুতরাং আমি নাটক লিখিব। ইহাতে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হইতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি—আমি নাটক লিখিব।

আমার নাটক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইবে, ইহা নিশ্চিত—কেবলমাত্র প্রকাশিত হইলেই হয়। নাটকরচনা সম্পূর্ণ মৌলিক, ইতিপূর্ব্বে কোন কবি তাহা করিতে পারেন নাই এবং আজিকালিকার রঙ্গালয়ের তাহা সম্পূর্ণ উপযোগী।

প্রথমত কয়খানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। সেগুলি প্রকাশিত করিবেন কি? না, মোকদ্দমার ভয় রাখেন? ভয়ের কোন কারণ নাই—তাহা এমন পরিবর্ত্তিত করিয়াছি যে, আদৌ মূল পুস্তক চিনিবার উপায় নাই।

আমি ভ্রমরকে অশ্বারোহণে দর্শকসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি, কুন্দনন্দিনীকে বিষের মোড়ক খাইতে খাইতে অন্তত ৪।৫টি সঙ্গীত করাইয়াছি। সাইকেলে করিয়া সূর্য্যমুখীর প্রবেশ এবং তাহার সনৃত্য সকরুণ গান পাঠক ও দর্শক উভয়ের হৃদয় বিগলিত করিবে। প্রতাপ ও শৈবলিনীর একত্র নৃত্য-গীত দেখাইয়াছি—চন্দ্রশেখরকে সন্ন্যাসী করিয়া বিশ্বপ্রেমপ্রচারে নিযুক্ত করিয়াছি—দেবেন্দ্রনাথ মত্তাবস্থায় ক্রমাগত রামপ্রসাদী পদাবলী গান করিয়াছে—মূল পুস্তকে কি এসব আছে? বঙ্কিমবাবুর গীত সব তুলিয়া দিয়াছি—তাহার স্থলে, যেখানে গান রচনা করিতে পারি নাই, সেখানে নিধুবাবু, রবিবাবু প্রভৃতির কোটেশন্ লাগাইয়াছি।

মূলঘটনাও যে পরিবর্ত্তিত না করিয়াছি, তাহা নহে। শৈবলিনী বিহনে রোরুদ্যমান প্রতাপ,—সূর্য্যমুখীর শোকে-দুঃখে কবিতা রচনা ও সঙ্গীত, জেবোন্নিসার সহিত রাজসিংহের বিবাহ, অন্ধ রজনীর সমুদ্রে

ঝাঁপ দিয়া সাঁতরাইয়া যাওয়া, দলনীর বিষপ্রয়োগে মীরকাশীমকে হত্যা করিবার চেষ্টা—আর কত উদাহরণ দিব।

মৌলিক নাটক চাই? তাহাও যথেষ্ট রচনা করিয়াছি। কি বিষয় চাই? পৌরাণিক, সামাজিক, না গার্হস্থ্য? যেমন বলিবেন, তেমনই রচনা করিয়া দিব।

পৌরাণিক নাটকের কিছু উদাহরণ দিব—সে নাটক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। তাহাতে কেবলমাত্র পুরাণের নাম কয়টিই আছে, প্লট্ প্রভৃতি সমস্তই আমার নিজস্ব। মনে করুন, সীতার বনবাসে রাম ও সীতার কবিতায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বাক্‌বিতণ্ডা ও শেষে সীতাত্যাগ এবং তার পর বহু সাধ্যসাধনায় সীতার প্রত্যাখ্যান, পিত্রালয়ে গমন, জনকসৈন্য সঙ্গে সীতার অযোধ্যা-আক্রমণ, রামের পরাজয় ও চরমে পুনর্মিলন। ইহা কি মূল রামায়ণে আছে? তা ছাড়া যমরাজের নিকট অন্যূন পঞ্চাশটি গান গাহিয়া সাবিত্রীর নৃত্য, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও তাহার সনৃত্য গীত, ভীমে ও দুর্য্যোধনে ইংরাজীভাবের ডুয়েল্। ইহা ছাড়া ক্রমাগত দেবদেবীগণের সঙ্গীত, অপ্সরাগণের সঙ্গীত, ঋষিদের মুখে নিধুবাবু প্রভৃতির প্রেমগীতি; ঋষিকুমারীগণের পার্শী সাড়ি পরিয়া নৃত্য। এইরূপ বহু নব বিষয় উদ্ভাবনা করিয়াছি—ইহা ত গেল পৌরাণিক নাটকের কথা।

তদ্ভিন্ন সমস্ত আরব্য উপন্যাস আমি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। তাহাতে সহসা দৈত্যের প্রবেশ এবং শূন্যে বক্তৃতা, মৃত্যুর পর সহসা প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব ও নৃত্যগীত, অপ্সরার পুরী, পরীরাজ্য, সমস্ত যুবতীগণের ক্রমাগতই গান, কিরণবালাগণের গান, জ্যোৎস্নাকুমারীগণের গান—দোকানদারগণের গান, কাফ্রীগণের নৃত্য, চীনবাসীদের বাংলায় গান কিছুই বাকী রাখি নাই।

ইহাও যদি আপনার ভাল না লাগে, সামাজিক নাটক পাঠাইব?

তাহাতে অনূঢ়া বালিকার প্রেমগীতি, বিধবাদের সরস রসিকতা, কোর্টশিপ, অবাধ প্রেম, গালিগালাজ, প্রেমসম্ভাষণ, প্রিয়বিরহে হাহুতাশ, পতন ও মূর্চ্ছা। আর কত বলিব? ইহার পর গার্হস্থ্য নাটক আছে—তাহাতে অন্দরমহল পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হইয়াছে—স্ত্রী পুরুষের একত্র প্রেমালাপ, কিশোরী বালিকার সখীগণের সহিত অবাধে রসিকতা, নাপিত-নাপ্তিনীর গীতি, ধোবা-ধোবানী, চানাচুরওয়ালা-চানাচুর-ওয়ালীর গীতি, তাঁতী-তাঁতিনী, কলু কলুনী, মেথর-মেথরাণী প্রভৃতির নৃত্যগীতি ক্রমাগত দেখান হইয়াছে; সুতরাং তাহা যদি আবার সচিত্র করেন ত পাঠকের অভাব হইবে না। অতএব আমার নাটক যে কেমন জমিয়া যাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। আপনি যদি নিজ ব্যয়ে আমার নাটকগুলি ছাপেন, তবে অচিরেই ইহার মিষ্টত্ব বুঝিবেন ও "মধুলোভে অলি যথা" আমাকে আর ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

আমার সর্ব্বজ্ঞতায় ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় আশা করি আপনার বিশ্বাস আছে। এ সুবর্ণসুযোগ উপেক্ষা করিবেন না, আমার প্রতিভা-উৎস রুদ্ধ রাখিবেন না, আমার "সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়া দিবেন না।"—যদি নিতান্ত প্রকাশিত না করেন ত আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনার নামে অচিরে প্রহসন লিখিব এবং তাহা রঙ্গালয়ে অভিনয় করাইব। ইতি।

শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।

দিল্লির দরবার।

লর্ড কর্জ্জনের ভাগ্যদেবতা কর্জ্জনকে লইয়া আবুহোসেনের প্রহসনাভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ভাল-মন্দ-মাঝারি বিবিধপ্রকারের ভাইস্‌রয় পঞ্চবার্ষিক রাজলীলা সমাধা করিয়া গেছেন।

কিন্তু এমনতর বীভৎস নেশা কাহারো হয় নাই। শাসননীতি ও শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কীর্ত্তি করিয়া গেছেন—কিন্তু নিজের সম্বন্ধে মোটামুটি সকলের মাথার ঠিক ছিল। ভারতের রাজতক্ত যে প্রৌঢ় বালকের খেলার মঞ্চ, কর্জ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ভাইস্‌রয়ের ব্যবহারে আমাদের সে আশঙ্কা হয় নাই। এবারে তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ অবাক্ হইয়া গেছে।

ইম্পিরিয়াল্ পলিসির উপলক্ষ্য করিয়া দিল্লির দরবার নামক যে মত্ততার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা ব্যাপারটা কি? তাহা কি ক্ষমতা-মদবিহ্বল লঘুচিত্ত লোকের ব্যক্তিগত মনোবিকার, না, ইংলণ্ডের বর্ত্তমানকালীন চিত্তদৌর্ব্বল্যের বিকাশ?

ম্যাফেকিংয়ের মুক্তিসমাচারে, বোয়ারযুদ্ধের নিবৃত্তিবার্ত্তায়, রাজ্যাভিষেকের দিনপরিবর্ত্তনসংবাদে ইংলণ্ডের জনসাধারণ যেরূপ অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে ইংলণ্ডের হিতৈষী বন্ধুরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে—এরূপ আত্মবিস্মৃতি স্বাস্থ্য ও সবলতার প্রমাণ নহে। গ্ল্যাডষ্টোনের স্থলে চেম্বারলেন্, টেনিসনের স্থলে কিপ্লিং এবং লর্ড মেয়োর আসনে কর্জ্জনের অভিষেক ইংলণ্ডের মহত্ত্বদৈন্যের পরিচয় দিতেছে কি না, তাহা তত্ত্বদর্শীদের আলোচ্য বিষয়।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়া কোনপ্রকার মত প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের নাই। এখনকার একমাত্র প্রবীণ ইংরাজ তত্ত্বজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার নূতনপ্রকাশিত Facts and Comments নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে অনেক অরণ্যে রোদন করিয়াছেন, আশা করি, আমাদের পাঠকদের কাছে তাহা অবিদিত নাই।

আপাতত আমাদের হঠাৎ-বাদশা বড়লাটের আবুহোসেনি কাণ্ড দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব, ঠিক করিতে পারিতেছি না। প্রহসন-হিসাবে ইহা অতিশয় উত্তম হইয়াছে, তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতে

হইবে—কিন্তু ভারতবর্ষের দগ্ধভাগ্যবশত এতবড় প্রহসনটাও তাহার পক্ষে শোকাবহ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের লর্ড আবুহোসেনের পাঁচ বৎসরের বাদ্‌শাহী ভারতবর্ষের পক্ষে প্রায় পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ফরাসী হাস্যরসিক মোলিয়েরের "বুর্জ্জোয়া জাঁতিয়্যম" মূলে বা অনুবাদে পাঠকেরা অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। তাহা অতিশয় উপাদেয়, সন্দেহ নাই। তাহাতে দাম্ভিক-মানব-চরিত্রের একটা রহস্য দেখা যায়। দিল্লিদরবারেও মানবচরিত্রের সে রহস্য দেখিবার জন্য তাহার মধ্যে কতটুকু ইম্পিরিয়াল্ পলিসি, কতটুকু হঠাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্তির অদ্ভুত আতিশয্য এবং কতটা বা বণিক্‌তনয়া স্ত্রী ও স্ত্রীর কুটুম্বদিগের নিকট বড়াই করিবার সাধ প্রচ্ছন্ন, তাহা সকৌতুকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিষয়।

কিন্তু "বুর্জ্জোয়া জাঁতিয়্যম" যদি শ্মশানক্ষেত্রে চিতাবেদীর উপরে অভিনয় করা হয়, যদি দীনহীনের অন্নমুষ্টি হইতে সেই অভিনয়ের খরচ জোগান হয়, তবে পৈশাচিক অট্টহাস ছাড়া আর-কোনপ্রকার হাস্য সম্ভব হয় না।

কলিকাতা ইংরাজের স্বরচিত নগর—ইহা ভারতবর্ষের রাজধানী। এই স্থানই দরবারপ্রহসনের উপযুক্ত নাট্যশালা। ইংরাজশাসনপ্রণালীর মধ্যে দরবারপ্রহসনটা যে কিরূপ অসঙ্গত কৌতুকাবহ, তাহা কলিকাতার মত কবিত্বহীন, সৌন্দর্য্যহীন, প্রাচীনস্মৃতিবিহীন সহরেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিত—কিন্তু তাহা হইলে হাস্যরসের মধ্যে ভয়ানকরসের সংযোগ ঘটিত না।

দিল্লি মোগলরাজমহিমার শ্মশানক্ষেত্র। তাহাতে সমাধিভূমির পবিত্রতা আছে—তাহা প্রলয়লীলারত মহেশ্বরের পীঠস্থান। সেখানে আকবরের মাহাত্ম্যমণ্ডিত স্মৃতিনিকেতনে কর্জ্জনের ন্যায় একজন চটুল নব্য ইংরাজ ভারতের সমস্ত পুরাতনরাজবংশীয়দের প্রাচীন মুকুটের উপর

নিজের অনুকরণলব্ধ সদ্যোনূতন পুচ্ছটি আস্ফালন করিয়া বিশ্বজগতের বিস্মিতদৃষ্টির সম্মুখে নৃত্য করিয়া লইলেন, ইহা কেবলমাত্র অসঙ্গত নহে, ইহা বীভৎস। ইহাতে কেবলমাত্র হৃদয়হীনতা নহে, রুচিবিকার প্রকাশ করে। আমরা ত বুঝিতেই পারি না, যাহা সাধারণ-শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ, তাহা রাজোচিত হইল কি করিয়া?

এই ত গেল রুচি। তাহার পরে নিষ্ঠুরতার কথা যখন স্মরণ করি, তখন স্তম্ভিত হইতে হয়। এ কথা কে না জানে যে, ছোট বড় অনেক রাজাকেই নিজের সঙ্গতির অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া, ঋণ করিয়া এই দরবাররক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল! ট্রান্সভাল্-লড়াই-তহবিল হইতে আরম্ভ করিয়া আর এই কর্জ্জনী দরবার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ধনীর ধন যত ঘনঘন ও যত প্রচুরপরিমাণে শোষণ করা হইয়াছে, এমন বোধ হয় আর কখনো হয় নাই। কর্জ্জনী আমল বোধ করি কর্জ্জের আমল বলিয়া চিরকাল ভারতবর্ষের জনশ্রুতিতে স্মরণীয় দুঃসময়ের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া থাকিবে। আবার শুনিতে পাই, অনতিকাল পরে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের আগমনের সম্ভাবনা আছে। বাদ্‌শাহী আমলে এরূপ যাতায়াতে প্রজাবর্গের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইয়া উঠিত—এখন সম্রাট্ হইতে অধস্তন পুলিসের দারোগা পর্য্যন্ত যিনি যখন যেখানে পদার্পণ করুন না কেন, ইংরাজের কলের শাসনে শূন্যগর্ভ বাক্য ছাড়া প্রত্যাশা করিবার বিষয় কিছুই থাকে না—কেবল ব্যয়ের আশঙ্কাতেই এই বিরলধন দেশের প্রজাদের হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে থাকে। দরিদ্র দেশে রাজভক্তিপ্রচারের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী কি না, সে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া কাজ নাই, কিন্তু ইহা যে নিরতিশয় নিষ্ঠুর, তাহা নিঃসন্দেহ। রাজারা এই যে দরবারযাত্রা উপলক্ষে প্রচুর ব্যয় করিতে ও ঋণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহা বাজিবে কাহার গায়ে? কর্জ্জন্ ও তাঁহার কুটুম্ববর্গের গায়ে ত নহেই। বিবিধ দৈব-মানবীয় দুর্যোগে যে হত-

ভাগ্য প্রজাদের শরীরে কেবল নাড়ী ধুক্‌ধুক্ করিবার মত রক্তটুকুই বাকি আছে মাত্র, এই ব্যয়, এই ঋণ ত তাহাদেরি অর্দ্ধাশন হইতেই! সেই মূক, সেই চিরসহিষ্ণু দুর্ভাগাদের রক্তেই কি দিল্লির দরবারকারীর দম্ভ স্ফীত হইয়া উঠে নাই?

আমাদের দেশে দিল্লির লাড্ডু বলিয়া একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। সে কথাটার ইতিহাস কি, তাহা আমরা জানি না—তাহা কোন বাস্তব পদার্থ বা রূপকমাত্র, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না। এতদিনে সেই কথাটা আমাদের দেশের রাজাদের পক্ষে সার্থক হইয়াছে। দিল্লির দরবার তাঁহাদের পক্ষে এক নিদারুণ দিল্লির লাড্ডু হইয়া উঠিয়াছে। যিনি খাইয়াছেন, তাঁহাকে পস্তাইতে হইতেছে, যিনি না খাইয়াছেন, তাঁর আবার ততোধিক। দরবারে যাঁহারা হাজির হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণ কণ্ঠাগত, যাঁহারা হন নাই, তাঁহাদের পক্ষে ভবিষ্যতে কিরূপ পশ্চাত্তাপের কারণ ঘটিতে পারে, তাহা স্পষ্ট বলা যায় না। মোদকটি অনেককেই প্রকাশ্যে গিলিতেই হইয়াছে, এখন শ্বাসরোধের পালাটা নেপথ্যে সমাধা করিলেই চলিবে। এমন উৎসব কখনো হয় নাই!

এই ত গেল ধনের কথা। আর মানের কথা,—সেটা মনে মনে থাকাই ভাল। ইংরাজ-উপনিবেশগুলির কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই দরবারে বিশেষরূপে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আমাদের ভারতবর্ষের হইয়া ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধির একটুকুও বেদনা বোধ করা উচিত ছিল। যাহারা ভারতবর্ষকে অপমানের সহিত বহিষ্কৃত করে, তাহাদিগকে এই দরবারে সসম্মানে আহ্বান করা ভারতবর্ষের প্রতি মমতার নিরতিশয় অভাব না থাকিলে সম্ভবপর হইত না। আপন জাতভাইকে আপন ঘরের মধ্যে যতই সমাদর করা হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তির অধিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতের দরবারে কেবল ভারতের অনাত্মীয়কে নহে, পরম অহিতকারী অবজ্ঞা-

কারীকে অনাবশ্যক নিমন্ত্রণ করা কেন? নিজের খেয়ালমতে এই প্রবাণ প্রাচীন ভাগ্যহীন ভারতবর্ষকে লইয়া কিরূপ অনায়াসে বৃহৎ তামাসা করা চলে, ভারতের অমিত্রদিগকে তাহাই ডাকিয়া দেখাইবার জন্য?

জানি, ভারতবর্ষকে লইয়া যেমন ইচ্ছা তাহাই করা চলে, জানি ইহা অত্যন্ত সহজ, জানি ভারতবর্ষ দুর্ব্বল এবং কর্জ্জন প্রবল—তথাপি আমাদের মনকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না, আমাদের চিন্তাকে কেহ দলিত করিতে পারে না। রোমের অ্যাম্পিথিয়েটারে বসিয়া রোমরাজ যখন আহূত-অনাহূত দর্শকদলের মধ্যে রক্তাক্তদেহ খৃষ্টানদিগকে লইয়া সাংঘাতিক তামাসা দেখিতেন, তখন সেই কৌপীনধারী লাঞ্ছিত ব্যক্তিগণ নিজের দুঃখমাহাত্ম্যে রোমরাজের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছিলেন—আমরাও যখন দিল্লীর দরবারস্রষ্টার অশিষ্টতা, কুরুচি, নির্দ্দয়তা ও দম্ভকে অন্তরের মধ্যে ঘৃণা করিতে পারিব, তখন রক্তাক্তকলেবর ভারতবর্ষ পুরাতন মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর অধিরূঢ় এই ক্ষমতামদোন্মত্ত নকল বাদ্‌শাহের অতিচেষ্টিত শূন্য আস্ফালনের কাছে আপনাকে খর্ব্ব-ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিবে না।

উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্র।

আজকাল কথা উঠিয়াছে, বঙ্কিমবাবুর নারীচিত্র, ঠিক হিন্দুরমণীর অনুরূপ নহে।

নারীচরিত্রে দুইটি ভাব বেশ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে, একটি তার পত্নীত্ব ও অপরটি মাতৃত্ব। এই পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব, উভয় ভাবের যথাযথ সমবায় ও সামঞ্জস্যই নারীচিত্রকে সম্পূর্ণতা প্রদান করে।

আমাদের দেশে, নারীচরিত্রে এই মাতৃভাবকেই সমধিক প্রাধান্য

দেওয়া হইয়াছিল। সমাজের কল্যাণের জন্য এই মাতৃভাব যাহাতে যথাযথ পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহার জন্য আমাদের দেশে কত না শিক্ষা ও আচারের আয়োজন, কত না সংযম, কত না বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।

কল্যাণময়ী, মহিমময়ী, অন্নপূর্ণা মাতৃমূর্ত্তির অন্তরালে, প্রেমময়ী অভিমানিনী পত্নীমূর্ত্তি যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, বঙ্কিমবাবু এই মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যান নাই। তাঁহার রচিত নারীচিত্রে যেন অনেকটা পাশ্চাত্যভাবের ছায়া পড়িয়াছে—তাঁহার অঙ্কিত স্ত্রীচরিত্র আমরা আদর্শ-হিন্দুনারীর চরিত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারিব না।

বেশ কথা, বঙ্কিমবাবুরও সে উদ্দেশ্য ছিল না।

আমার মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন আর্য্যরমণীর উজ্জ্বল মাতৃমূর্ত্তির পার্শ্বে, সেইরূপ আদর্শ নারীচিত্র অঙ্কিত করিবার কোন আবশ্যকতা বুঝেন নাই। তিনি স্ত্রীচরিত্রের আর একটা দিক্ দেখাইয়া গিয়াছেন—ইহা তাহার পত্নীত্ব—হিন্দুরমণীর পত্নীত্ব।

নারীচরিত্রের এই পত্নীত্ব প্রেমেই জীবন্ত থাকে এবং প্রেমেই পরিণতি লাভ করে। বায়রন্ বলিয়াছেন—

"Love is woman's whole existence"

বঙ্কিমবাবু প্রেমের আলোকে এই পত্নীত্বের বিভিন্নচিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। পারিপার্শ্বিক ঘটনায়, সংসার ও সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রেমের কত বিভিন্ন অভিব্যক্তি হইতে পারে, এবং তাহার ও স্ত্রীচরিত্রের কত পরিবর্ত্তন, কত বিভিন্ন পরিণাম, কত বিচিত্র গতিপ্রকৃতি হইতে পারে, তাঁহার উপন্যাসে তাহা সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পত্নীত্বের একএকটি ভাব বিশ্লেষণ করিয়া একএকটি চরিত্রে যতদূর দেখান যায়, তাহাতে তিনি ত্রুটি করেন নাই।

আর একটা কথা যেন আমরা না ভুলি যে, কোন সমাজের আদর্শ-চরিত্র রচনা করিবেন বলিয়া তিনি উপন্যাস রচনা করিতে বসেন নাই, স্ত্রীচরিত্রের পত্নীভাবটিই বিকশিত করিয়া দেখান তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

ইহাতেও বঙ্কিমবাবুকে দোষ দেওয়া যাইত, যদি দেখিতাম, বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীচরিত্রের মূল আমাদের জাতীয়তার মধ্যে নিহিত নাই। যদি দেখিতাম, ভ্রমর হিন্দুরমণীর চিরক্ষুণ্ণ পথ হইতে সরিয়াও অত্যন্ত সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল, শৈবলিনী হিন্দুরমণীর ধৈর্য্য, সংযম ও পতিভক্তি বিসর্জ্জন করিয়াও তাহার প্রণয়ীকে লইয়া সুখসাগরে ভাসিল, কুন্দনন্দিনী হিন্দুর চিরাচরিত একনিষ্ঠতাসাধনের বিরুদ্ধে বিধবাবিবাহ করিয়াও বেশ সুখ ও শান্তি লাভ করিল, এবং অনুদিন গভীর প্রেম, অসামান্য পতিভক্তি ও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াও সূর্য্যমুখী শেষ জীবনে অনাদৃতা রহিয়া গেলেন এবং যদি দেখিতাম, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল স্ত্রীচিত্র কেবলমাত্র বিলাসিনী, সুরসিকা, রূপযৌবনতরঙ্গিতা সঙ্গিনীর চিত্রমাত্র, প্রেমে, ধর্ম্মে, ভক্তিতে ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে উন্নত সহধর্ম্মিণীর চিত্র নহে, তাহা হইলেও ভাবিতাম, তাঁহার রচিত স্ত্রীচিত্র আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের প্রতিকূলে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু তাহা ত হয় নাই। বঙ্কিমের রচিত স্ত্রীচরিত্র ত প্রবৃত্তির পথে ব্যর্থ হইয়া নিবৃত্তির ভাবেই সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে; সমাজ ও ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া নিষ্পেষিত হইয়াছে এবং প্রায়শ্চিত্তের ভীষণ অনলে একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে বঙ্কিমের স্ত্রীচরিত্রে এ চিত্র কত প্রস্ফুট! তাই বলিতেছিলাম, বঙ্কিম শুধু পত্নীত্ব অঙ্কিত করিয়া যান নাই, তিনি হিন্দুপত্নীত্ব চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার পর তাঁহার উপর দাবীদাওয়া করা নিরর্থক।

কিন্তু তাঁহার রচিত স্ত্রীচরিত্রের প্রভাবে যদি আমাদের দেশের অনিষ্ট হয়, সে আমাদের দুরদৃষ্ট! Lady Macbethএর চরিত্র অঙ্কিত করিবার পর সমস্ত ইরাজরমণী যদি Lady Macbethএর চরিত্র অনুকরণ করে, কর্ডেলিয়া, ডেস্‌ডিমোনা প্রভৃতির চরিত্র বিরাগে ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার জন্য Shakspearকে দোষী করা কি সুবুদ্ধির পরিচায়ক? লোকে রজ্জুর দ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে বলিয়া কি রজ্জুর ব্যবসা উঠাইয়া দিতে হইবে?

নারীচরিত্রের একই দিক্ সকলে অঙ্কিত করেন না। আমাদের দেশে ত মাতৃমূর্ত্তি বিস্তর অঙ্কিত হইয়াছে; প্রাচীনা আর্য্যরমণীর ভাস্বর চিত্রের কথা ছাড়িয়া দিই, সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী"র কাশ্মীররাজ্যের ক্ষুধিত প্রজাবর্গের জন্য বিগলিতা করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তি এবং ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্রের "হৈমবতী", "অন্নপূর্ণা", ফুলকুমারী" ও "সরলা"র মত চরিত্রও ত বঙ্গসাহিত্যে বিদ্যমান।

সেই সমস্ত নারীচিত্রের বিভিন্ন পার্শ্বে, বিভিন্ন পরিণতি দেখিয়াও কমলনয়না কমলমণির রসিকতা, ভ্রমরের অভিমান, কুন্দনন্দিনীর বিষ-পান, লজ্জাভয়শূন্যা শৈবলিনীর প্রবৃত্তির অসংযম যদি আমাদের বঙ্গ-বধূবর্গের মনোযোগ অধিকতর আকর্ষণ করে—তাহা হইলে অপরিণত বয়সে তাঁহাদের এই "নভেলিয়ানা"র প্রশ্রয় না দিয়া এবং তাহার জন্য পূজনীয় লেখকবর্গকে অনর্থক দোষী না করিয়া বরং যাহাতে নভেল পাঠ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের জ্ঞান সমধিক উন্নত, রুচি সম্যক্ মার্জ্জিত এবং হৃদয় হিন্দুমহিলার আদর্শে গঠিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই আবশ্যক মনে করি।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ১৩০৯। { ২য় সংখ্যা।

কবির পরিচয়।

কবির পরিচয় তাঁহার স্বরচিত কবিতায়, ইহা অত্যন্ত সহজ কথা।

সাধারণ লোকের পরিচয় তাঁহাদের জীবনে, মহাপুরুষের পরিচয় তাঁহাদের কৃতকর্ম্মে; কিন্তু এই দুই উপায়ে ঠিক কবির পরিচয় পাওয়া যায় না। অতি জটিল এবং সুবৃহৎ জীবনচরিতে আমরা কবির কোনও সন্ধান পাই না, মহাপুরুষোচিত কোনও অলৌকিককার্য্যেও কবির পরিচয় মিলে না; কবির পরিচয় পাওয়া যায় কেবলমাত্র তাঁহার রচিত কবিতায়।

হয়ত প্রত্যেক খণ্ডকবিতা আলোচনা করিয়া ঠিক কবি-হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না,—সমগ্র কাব্যকলার অন্তরালে কবি-হৃদয় নীরবে অবস্থিতি করে। সমস্ত কবিতায় কবি-হৃদয়ের এক বিচিত্র সুর, এক অভিনব মোহন সঙ্গীত ধ্বনিত হয়; সমস্ত কবিতা পড়িয়া, সমস্ত সুর-সামঞ্জস্যে তবে তাহা পরিপূর্ণ বুঝাযাইতে পারে। ছিন্ন-কুসুম-দল দেখিয়া কে কবে সমগ্র পুষ্পের অপূর্ব্বসৌন্দর্য্য ও সুরভি উপলব্ধি করিয়াছে?—নরদেহ ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া কে কবে প্রাণের অস্তিত্ব পাইয়াছে?

কখনও বা বহু কবিতার মধ্যে একটামাত্র কবিতায় কবির বক্তব্য যেন অলক্ষিতে ফুটিয়া উঠে এবং এইরূপ কবিতার অন্তরালে যেন কবি-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় ও তাঁহার ভাবী অপূর্ব্বকাহিনী ও সুমধুর-সঙ্গীতের আভাষ যেন তাঁহার অজ্ঞাতে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। এই প্রকার আত্মপ্রকাশে তাঁহার পরিচয় পাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। উদাহরণদ্বারা কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

রবীন্দ্রবাবুর কৈশোরকালের রচিত "প্রভাতসঙ্গীত" নামক কাব্যে, "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" নামক কবিতায়, আমরা কবি-হৃদয়ের যে ভাবী পরিচয় পাইয়াছিলাম, আজ এতদিন পরে বোধহয় তাহা বলিবার সময় হইয়াছে।

কবি বলিতেছেন যে, একদিন তাঁহার জীবনের অতিসুন্দর-প্রভাতে কোন সুদূরাগত-কলকণ্ঠ-বিহগকাকলী, কোন মনোমোহিনী অপ্সরা-সঙ্গীত, পুষ্প-কাননে মলয়বায়ুর মত তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল এবং গুহাবদ্ধ-লীলাচঞ্চল-নির্ঝরিণীর মত তাঁহার হৃদয়স্থ ভাবরাশিকে নবভাবে, নবোচ্ছ্বাসে, নবকল্পনায় তরঙ্গিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই বহুদিন পরে কোথা হইতে আনন্দের কনক-কিরণ যেন হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল, জীবনরাজ্যে প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সমস্ত বিশ্বে বিবিধ নব-নব সঙ্গীত, নবতরতান গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। সেদিন আপনার মাঝে সমস্ত প্রাণ যেন জাগিয়া উঠিল—সেদিন কবি বলিতেছেন :—

"জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা!"

তরু-লতা-মণ্ডিত শ্যামল-প্রস্তর-প্রাচীর অতিক্রম করিয়া যেমন আকাশের দু'একটী নক্ষত্র গুহাবদ্ধ-নির্ঝরিণী-বক্ষে খেলিতে থাকে, তেমনি প্রেমের দু'একটী কনক রশ্মি কবি-মনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু তখন কত ভয়, কত সংশয়, কত আশায় স্ফীতবক্ষ, বাসনায় চঞ্চল মন, নিরাশায় আকুল হৃদয়! কবির ভাষায়

"মৃদু ভয়, কভু মৃদু আশ,
মৃদু হাসি, কভু মৃদু শ্বাস;
বহুদিন পরে শোনা বিস্মৃত গানের তান,
দোলেরে প্রাণের মাঝে দোলেরে আকুল প্রাণ,"

প্রকৃতির বিভিন্ন শোভা, বিভিন্ন সুর কবি-হৃদয়ের বিভিন্ন তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিতেছিল, নির্ঝরিণীর রুদ্ধস্রোতের মধ্যে যে একটা অনির্ব্বচনীয় আকুলতা,—দূর সমুদ্রে মিশিবার জন্য যে একটা প্রাণাপণ আগ্রহ, তখন কবি-হৃদয়ে তেমি একটা ভীষণ অতৃপ্তির করুণ স্বর শুনা গেল।

কবি বলিতেছেন, তখন তিনি বিশ্ব-প্রেম লাভ করিতে পারেন নাই, তখনও তিনি বিশ্ব-শোভায় আত্মহারা নহেন, গুহাবদ্ধ-নির্ঝরিণী যেমন বাহিরে বর্ষার জলধারা শুনিতে পায়, শরতের দু'একটী চন্দ্র-কিরণ উপভোগ করে, তিনিও তখন—

"এমনি নিজের কাজে খুলেছি নিজের প্রাণ,
এমনি পরের কাছে শুনেছি নিজের গান!"

স্বার্থের কারাগার তখনও তাঁহার চারিদিকে, তখনও বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে স্বর্গ-ছায়ায় তাঁহার হৃদয় পরিণতি লাভ করে নাই।

কিন্তু জীবন-প্রভাতে অসীমের পরপার হইতে কি মধুময় সঙ্গীত তিনি শুনিলেন! তাহাতে প্রাণ যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল, কি আশা-আশ্বাসে হৃদয় ভরিয়া উঠিল, সে যেন ক্ষুদ্র নিজত্বের সীমায়, স্বার্থপরতার জড়আবরণে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না—সে এখন

"আলিঙ্গন তরে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায়!"

কবির বহুদিনের রুদ্ধভাবরাশি যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কত দিনের,

কত জন্মজন্মান্তরের কত সুপ্তগীতি, কত বিস্মৃতস্মৃতি জাগিল, যেন কোন অজ্ঞাতভাবে, অপূর্ব্বআবেশে, অব্যক্তবেদনায় কবি-হৃদয় ভরিয়াদিল!

এখন এই নবপ্রেমে, নবআলোকে কবির কাছে সমস্ত পৃথিবী যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে এবং সমস্ত ভাবে ও কল্পনায় যেন অসীমের ভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে; কবি বলিতেছেন:—

"সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন?
একটী পাখীর আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন!

কবির এখন সমস্ত পৃথিবী আপনার, আত্মসুখে আর তৃপ্তি নাই; সমস্ত মানবের প্রেমে, সুখে-দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিক্ষুব্ধ-চঞ্চল! কবি এখন বলিতেছেন:—

"এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
প্রাণ হ'য়ে আছে ভোর।"

উপলব্যথিতাগতি নির্ঝরিণী যেমন শিখর ত্যাগ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া যায়, কোথাও পল্লবছায়াঘন গ্রামরাশি, কোথাও তরু-লতা-খচিত শ্যামল-তট, কোথাও বা কুসুমিত কেতকী-কুঞ্জ। কখনও বর্ষার নিবিড় ছায়া, প্রেম ঘনাইয়া আসিয়াছে, কোথাও বসন্তের মদির হাসি,—প্রেম চাঞ্চল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে; কখনওবা কুমুদ-কহ্লার শোভিতা পঙ্কজলক্ষণা শরতের স্নেহহাস্য—প্রেমমাধুর্য্য বাড়িয়া চলিয়াছে। কবি-হৃদয় নির্ঝরিণীর মত বহিয়া চলিয়াছে। স্থানে স্থানে সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠিতেছে। কোথাওবা তট জুড়িয়া বিকশিত কাশকুসুমরাশি, সুরভিত

বনকুঞ্জে কোকিল-পাপীয়ার অশ্রান্ত গান, লক্ষহারা বংশীনিক্কণ, পূর্ণিমা যামিনী, মলয়ের মৃদুমন্দ সঞ্চারণে তরুলতা শিহরিত।

সমস্ত চরাচর, সমস্ত বিশ্বের মধ্যে কবি-হৃদয় এখন যেন তৃপ্ত হইবার নহে, এমনি আনন্দে, এমনি সৌন্দর্য্যে তাহা এখন বিভোর;—এমনি ভাবে, এমনি কল্পনায় তাহা মুগ্ধ। কবি বলিতেছেন:—

"এত সুখ কোথা, এত রূপ কোথা,
এত খেলা কোথা আছে,
যৌবনের বেগে, বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে!"

কবির ভাবোন্মত্ত হৃদয়, আবেগ-মুখর-চিত্ত যেন দিগন্তে ছুটিয়া মিশাইতে চাহিল; তরঙ্গিণী যেমন কল্লোলে কল্লোলে মহাসাগরের দিকে ধাবিত হয়, কবি-হৃদয় তেমনি অনন্ত লক্ষ্য করিয়া ছুটিল—উচ্ছ্বসিত প্রাণ অসীম প্রাণের ধারায় মিশিল।

তখন সমস্ত আকাশে যেন অসীমের গান ধ্বনিত হইতে লাগিল; ঊর্দ্ধে অসীম আকাশ, নিম্নে প্রহেলিকাময় স্তব্ধ মনুষ্য-হৃদয় প্রেমে বিভোর। সেই প্রেমবিভোর হৃদয়ের ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"কে আসিবি কে আসিবি কে তোরা আসিবি আয়!
পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া জুড়ায়ে জগৎ হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা!"

এতদূর যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে বুঝান বাহুল্য বলিয়া মনে করি যে, এই কবিতায় কবি-জীবনের যে আভাষ বহুপূর্ব্বে আমরা পাইয়াছিলাম, আজ তাহা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমার মনে হয়, সেই কবি-হৃদয়ের আদিম অতৃপ্তির ভাব তাঁহার "প্রভাতসঙ্গীত",

"সন্ধ্যাসঙ্গীত" এবং "কড়ি ও কোমল"এ চিত্রিত হইয়াছে। তিনি "মানসী"তে কবির "মানসপ্রিয়া" লাভ করিয়া, নবভাবে, নবআলোকে, প্রেম-পরিপূর্ণ-হৃদয়ে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্বকার অতৃপ্তি ছিল অভাবমূলক, "মানসী" সাক্ষাতের পর তাঁহার যে অতৃপ্তি, সে অতিমাত্রায় আনন্দ লাভ করিয়া, আপনাকে অতিক্রম করিয়া, সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ হৃদয়ে না ধরিতে পারিয়া। ইহারই ফলে "সোণার তরী" :—

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমরি সোণার ধানে গিয়াছে ভরি'।"

এই বিশ্বব্যাপী উদ্বেলিত প্রেম সংযত হওয়া চাই। তাহা যেন চিরন্তন মঙ্গলকে অতিক্রম না করে, অনুদিন তাহা যেন মঙ্গলের কনক-কিরণ সম্পাতে উজ্জ্বল হয়,—কবি এই সংযত প্রেমের উপলব্ধি করিলেন এবং "রাজা ও রাণী"তে "চিত্রাঙ্গদায়"। "চিত্রায়" কবি বিশ্বের অতীত হইয়া অসীম বিশ্বসৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, আর ভাবোন্মত্ত কবি-হৃদয়, আড়ম্বর ও সঙ্কোচ বিহীন হইয়া "ক্ষণিকা"য় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবি মায়াবাদী নহেন, তিনি বলেন না যে এ বিশ্বসংসার মায়া-প্রপঞ্চ ইহাতে ভুলিওনা,—তিনি সমস্ত সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া, যিনি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার, দয়াময়, প্রেমময়, তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছেন। কবি বলিতেছেন :—

"উদ্বেগ অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।

"নৈবেদ্যে" আমরা ইহা উপভোগ করিয়াছি। আজ যেন মনে হইল, আমি আমাদের কবি-হৃদয়ের ভিতর দিয়া সমস্ত পৃথিবীর কবি-হৃদয়ের পরিণতি সুস্পষ্ট বুঝিলাম এবং ইহাও বুঝিলাম যিনি জীবনের শুভ-মুহূর্ত্তে বিধাতার নিকট হইতে এই আনন্দ লাভ করিয়া নূতন জীবন

গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই যেন কবি নামে পরিচয় দেন, আর কেহ নহে। তরঙ্গিণীই মহাসাগরে মিশিতে পারে, কেন না তাহার উৎপত্তি শৈলশিখরের স্বাভাবিক উৎসধারায়; কিন্তু মর্ম্মরমণ্ডিত-তটশালি কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী যতই গভীর হউক না কেন, তাহা দু'দিনেই অর্দ্ধপথে হাজিয়া মজিয়া পূরিয়া উঠিবে।

ক্রিটিক বলিতে পারেন, ইহাতে রবীন্দ্রবাবুর দু'টা ঘরের কথা কই? দু'টা রহস্যের অবতারণা কই? দু'টা নূতন খবর কই? ইহা কি আবার কবির পরিচয় নাকি? উত্তর—আমি কবি-হৃদয়ের পরিচয় লইতে আসিয়াছিলাম, পরিচয় লইয়া চলিলাম, রবীন্দ্র বাবুর নহে।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

প্রাণী ও উদ্ভিদ।

প্রায় দেড় বৎসর হইল, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু য়ুরোপীয় নানা পণ্ডিত-সমাজে ধাতু ও প্রাণি-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে একটা নূতন তত্ত্ব প্রচার করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সেই সময় অধ্যাপক বসু প্রত্যক্ষ পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়াছিলেন, জীববিদ্‌গণ যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, ধাতুকে জীবরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিতেছেন, ধাতু ও প্রাণীর স্বাতন্ত্র্যের সহিত সে সকল ধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই। আঘাত ও উত্তেজনাদি দ্বারা প্রাণি-শরীরে যে ফল উৎপন্ন হয়, অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ধাতু-পদার্থেও যে অবিকল একই ফল প্রকাশ পায়, স্বোদ্ভাবিত যন্ত্র-সাহায্যে অধ্যাপক বসু তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছিলেন। ধাতু প্রাণীর ন্যায়

সচেতন কি না, তাহা কেহ জানে না বটে; কিন্তু প্রাণি-দেহ ও ধাতু উভয়েই যে বাহ্যিক আঘাত-উত্তেজনায় সমান সজাগ, তাহা এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জড়বিদ্‌গণ সমস্ত জড়রাজ্যটাকে জৈব ও অজৈব এই দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া আসিতেছেন। কাঠ, কয়লা, কাপড়, কাগজ, চিনি, সকলেরই মূলে জীব বর্ত্তমান; তাই তাহারা জৈব-পদার্থ। এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু, তাহা অজৈব। জৈব-পদার্থের মধ্যে আবার দু'টা উপবিভাগ আছে,—প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ।

এই প্রাণী পদার্থ এবং অজৈব খনিজ বস্তু যে আঘাত-উত্তেজনায় একধর্ম্মী, তাহাই অধ্যাপক বসুর প্রথম আবিষ্কারের বিষয়ীভূত ছিল। জীব-রাজ্যের উপবিভাগ—উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় গবেষণায় তিনি সেই সময়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। কয়েকমাস নানা পরীক্ষাদি করিয়া, উদ্ভিদের উপর আঘাত-তাড়নার প্রভাব সম্প্রতি অধ্যাপকমহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ধাতু-পদার্থ ও সজীব প্রাণী উদ্ভিদ সকলের উপরেই বাহ্যিক উত্তেজনার ফল একই দেখা যাইতেছে।

অধ্যাপক বসুর এই নূতন আবিষ্কারটীর ব্যাপার বুঝিতে হইলে, প্রাণীর জীবনের লক্ষণগুলি কি, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন ধমনীর স্পন্দন জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ। সুস্থপ্রাণী মাত্রেরই ধমনী নিয়মিতভাবে স্পন্দিত হইয়া থাকে; ক্রোধ-ভয় বা পরিশ্রমাধিক্যাদি কারণে প্রাণী উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, নাড়ীর স্পন্দন-মাত্রায় সেই উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তা' ছাড়া কোন কারণে শারীরিক অবসাদ আসিলে, তাহার লক্ষণও নাড়ীর মন্থর ও দুর্ব্বল কম্পনে দেখা গিয়া থাকে; সুতরাং নাড়ী কেবল জীবনের অস্তিত্ব জ্ঞাপক নয়,—রোগীর শারীরিক নানাবিধ অবস্থাও নাড়ী-স্পন্দন পরীক্ষায় জানিতে পারা যায়। নাড়ী কোন্

সময়ে কত চঞ্চল থাকে এবং তাহার স্পন্দন-বলইবা কোন্ সময়ে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা কেবল অঙ্গুলি-স্পর্শে স্থির করিয়া তুলনা করা বড়ই কঠিন। এইজন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নাড়ী-স্পন্দন, রেখাঙ্কন দ্বারা প্রকাশ করিবার একটা সুন্দর উপায় দেখা যায়। এই রেখাঙ্কন-পদ্ধতিতে একটী ঋজুদণ্ডের মধ্যস্থল আট্‌কাইয়া তাহার একপ্রান্ত নাড়ীর উপর চাপিয়া রাখা হয়, কাজেই নাড়ীর উত্থান-পতনের সহিত এই প্রান্তটী যেমন উঠিতে নামিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ইহার অপর প্রান্তও তদনুরূপ আন্দোলন প্রাপ্ত হয়। এখন যদি দণ্ডের এই মুক্তপ্রান্তে একটী পেন্‌সিল সংলগ্ন করিয়া, তাহার মুখে কাগজ রাখা যায়, তাহা হইলে সেই কাগজে নাড়ী-স্পন্দনদ্বারা যে কতকগুলি উঁচু-নীচু রেখা অঙ্কিত হইতে থাকিবে, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। এই রেখাচিত্রই চিকিৎসকদিগের নাড়ী-স্পন্দন-লিপি। যাহাতে কাগজে একই অংশে উপর্য্যুপরি রেখা অঙ্কিত হইয়া চিত্রটীকে অস্পষ্ট করিয়া না তোলে, তজ্জন্য কাগজখানিকে সমবেগে পেন্‌সিলের সম্মুখ দিয়া সঞ্চালিত করিবার সুব্যবস্থাও এই যন্ত্রে আছে। সুস্থ ও সবল ব্যক্তির নাড়ীর আন্দোলনজ্ঞাপক সেই তরঙ্গরেখা খুব দীর্ঘ ও সুস্পষ্ট দেখায়, দুর্ব্বল ও পীড়িত ব্যক্তির স্পন্দন রেখাগুলি পূর্ব্বের তুলনায় খর্ব্বাকার ও অস্পষ্ট হইয়া অঙ্কিত হয়। মৃতপ্রাণীর নাড়ী-স্পন্দন নাই, কাজেই স্পন্দন-লিপিতে সেই তরঙ্গায়িত রেখাচিত্র দেখা যায় না। এই অবস্থায় দণ্ড-প্রান্ত-সংলগ্ন স্থির-পেন্‌সিলটা, কেবল একটা ঋজুরেখা কাগজে অঙ্কিত করিতে থাকে; ইহাই প্রাণীর মৃত্যুজ্ঞাপক স্পন্দন-লিপি।

প্রাণীর সজীবতার আর একটী লক্ষণ আছে,—ভূশায়ী নিস্পন্দ কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া, সে নিদ্রিত, কি মূর্চ্ছিত, কি মৃত তাহা বাহির হইতে ঠিক করিয়া বলা যায় না; কিন্তু সেই অবস্থায় যদি লোকটার হাত ধরিয়া মোচড় দেওয়া যায় বা তাহাকে চিম্‌টি কাটা যায়,— লোকটা জীবিত

থাকিলে তদ্দ্বারা তাহার জীবনী শক্তির কিছু না কিছু সাড়া নিশ্চয়ই পাওয়া যায়,—জীবনী শক্তি খুব প্রবল থাকিলে চিম্‌টীর বিনিময়ে পরীক্ষকের চপেটাঘাত লাভেরও আশঙ্কা থাকে। লোকটা প্রকৃতই মৃত হইলে শত আঘাত-অপঘাতেও তাহার কোনই সাড়া পাওয়া যায় না, ইহাই জীবনী শক্তি পরীক্ষার দ্বিতীয় প্রথা। মাংসপেশীর সজীবতা এই প্রথায় বেশ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। চিম্‌টি কাটিলে বা কোন প্রকার চাপ বা মোচড় দিলেই, সজীব মাংসপেশী মাত্রেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তা'র পর সেই চাপ তুলিয়া লইলেই, সেটা পূর্ব্বের আকার আবার অবিকল পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

মাংসপেশীর এই আকুঞ্চন-প্রসারণের চিত্র, পূর্ব্বোক্ত নাড়ী-স্পন্দন-লিখন-যন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থায় অঙ্কিত করা যাইতে পারে। আঘাত প্রাপ্তি-মাত্র যেমন মাংসপেশী আকুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে সেই দণ্ড-সংলগ্ন-পেন্‌সিলটাও কাগজের উপর একটা উর্দ্ধরেখা অঙ্কিত করিয়া ফেলে; তা'র পর সেই আঘাত রহিত হইলে মাংসপেশী যখন প্রকৃতিস্থ হইতে আরম্ভ করে, পেন্‌সিলটাও সেই সময়ে একটা পতন-রেখা আঁকিয়া ফেলে। অধ্যাপক বসু আঘাতজনিত মাংসপেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণের বহুবিধ চিত্র এই প্রকারে আঁকিয়াছেন।

সজীব মাংসপেশী মাত্রেই আহত হইলে সাড়া দেয় এবং সেই আঘাত রোধ করিলে, সে পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং দেখা যাইতেছে বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া যেমন সজীব পেশীর একটা ধর্ম্ম, পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টাও ইহার সজীবতার আর একটা লক্ষণ। মাংসপেশী যদি খুব সজীব হয়, তবে বাহ্যিক আঘাত-উত্তেজনায় সেটা খুব সবলে সাড়া দিতে থাকে, কাজেই সেই রেখা-চিত্রে লম্বা লম্বা দাগ পড়িতে থাকে। তা'র পর মাংসপেশী জীবনী শক্তি হারাইয়া যতই নিস্তেজ হইতে আরম্ভ করে, তাহার সাড়া দিবার শক্তিও

সেই অনুপাতে কমিতে থাকে; শেষে যখন মাংসপেশী একেবারে নির্জীব হইয়া পড়ে, তখন ক্রমে পূর্ণ অসাড়তা আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে। মৃত মাংসপেশীর রেখা-চিত্রে আকুঞ্চন-প্রসারণের সেই তরঙ্গ-রেখা দেখা যায় না। নাড়ীস্পন্দনরহিত মৃত ব্যক্তির স্পন্দনচিত্রের ন্যায় একটা অভিন্ন ঋজুরেখা মাংসপেশীরও মৃত্যু ঘোষণা করে।

এতদ্ব্যতীত প্রাণীর মৃত্যু লক্ষণ ধরিবার আর একটা উপায় আছে; ইহাকে সজীবতার বৈদ্যুতিক লক্ষণ বলা যাইতে পারে। সজীব মাংস-পেশী বা স্নায়ুর কোন অংশে আঘাত দিলে বা চিম্‌টি কাটিলে, তাহার আভ্যন্তরীণ আণবিক বিকৃতিদ্বারা স্বতঃই আহত ও অনাহত অংশের মধ্যে একটি তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পড়ে। তা'র পর সেই আঘাত রহিত করিলে সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশী পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয় এবং তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব লক্ষণও আর দেখা যায় না; কিন্তু মৃত মাংস-পেশীতে সেই প্রকার সহস্র আঘাত করিলেও, তাহাতে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় না।

জীবনী শক্তি হ্রাস হওয়ার সহিত নাড়ী-স্পন্দন ও পেশীর আকুঞ্চন-পরিমাণের যে ক্রমিক লোপের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহাতেও ঠিক তাহাই দেখা গিয়া থাকে। সজীব-সন্থ-মাংসপেশীতে আঘাত কর, তজ্জাত বৈদ্যুতিকপ্রবাহ খরপ্রবাহিত হইতে থাকিবে। তা'র পর তাহার নির্জীবতা বৃদ্ধি হইলে, প্রবাহটাকেও মন্দীভূত হইতে দেখিবে; শেষে মাংসপেশী সম্পূর্ণ নির্জীব হইলে, সহস্র তাড়নায় তাহাতে আর তড়িৎপ্রবাহের অণুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাইবে না। জীবনী শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত আঘাতজনিত প্রবাহের যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তাহা তড়িৎ-মাপক যন্ত্রের (Galvanometer) শলাকার বিচলনদ্বারা পরিমাপ করিবার একটা সুন্দর উপায় অধ্যাপক বসু আবিষ্কার করিয়াছেন এবং প্রবাহ-পরিবর্ত্তনের রেখাচিত্র অঙ্কনেরও একটা কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন।

বাহ্যিক আঘাত-উত্তেজনায় মাংসপেশীর আকুঞ্চন ও তড়িৎ-প্রবাহ উভয়ই যুগপৎ উৎপন্ন হয় এবং উভয়ই সজীবতার অভ্রান্ত লক্ষণ। কিন্তু অবস্থাবিশেষে আকুঞ্চনের রেখাচিত্র-অঙ্কন কঠিন দেখিয়া, অধ্যাপক বসু সজীবতার লক্ষণ ও আঘাত-অপঘাতের প্রভাব তুলনা করিবার পক্ষে তড়িৎপরিমাপক যন্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

এই ত গেল সজীব প্রাণি-দেহের কথা, এখন উদ্ভিদের বিষয় আলোচনা করা যাউক। অধ্যাপক বসু একটী সজীব পত্রের এক অংশে চিম্‌টি কাটিয়া বা মোচড় দিয়া স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, সেই অবস্থায় সজীব প্রাণি-দেহে যে প্রকার বৈদ্যুতিকপ্রবাহ উৎপন্ন হইত, ইহাতেও তদ্রূপ প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পড়ে এবং উভয়েরই রেখাচিত্র অবিকল এক দেখায়। এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—ইহাই কি প্রাণী ও উদ্ভিদের সসাড়তার যথেষ্ট প্রমাণ হইল? অপর কারণে উদ্ভিদ-শরীরে কি বিদ্যুতের উৎপত্তি হইতে পারে না? অধ্যাপক বসু মহাশয় একটি সহজ পরীক্ষায় এই সন্দেহের নিরাস করিয়াছেন। পত্রটীতে তীব্র-বিষ সংযুক্ত করিয়া তাহাকে তিনি পুনঃ পুন আহত করিয়াছিলেন; কিন্তু বিষ-জর্জ্জরিত-মৃতপ্রাণীর ন্যায় পত্রটী কোন সাড়াই দেয় নাই। তা'র পর একটা সমগ্র পত্রের অর্দ্ধেকটা ফুটন্তজলে ডুবাইয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল,—আঘাতদ্বারা সুস্থ অংশে প্রবল বৈদ্যুতিকপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাপ-মৃত-অংশ সহস্র তাড়নায়ও কোন সাড়াই দেয় নাই।

সজীব প্রাণি-শরীরের কোন অংশে আঘাত দিলে, আঘাতের প্রকার-ভেদে তাহার সাড়ার চিত্র তিনপ্রকারের হইতে দেখা যায়। একখণ্ড মাংসপেশীতে একটা নির্দ্দিষ্টকালের শেষে সমবলে পুনঃপুন আঘাত দিতে থাকিলে, সেই আঘাতজনিত পেশীর বিকৃতি ও স্বভাবপ্রাপ্তি রেখাচিত্রে স্পষ্ট অঙ্কিত হইতে থাকে এবং চিত্রের সমদীর্ঘ ঊর্দ্ধাধোরেখা

মাপিলে, প্রত্যেক আঘাতে যে একই প্রকার সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু এই নিয়মিত আঘাত আরো কিছুকাল চালাইলে, মাংসপেশীর সাড়া দিবার ক্ষমতাটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠে। পাঠক দেখিয়া থাকিবেন, বহুকাল নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকিয়া হঠাৎ কোন কাজে নিযুক্ত হইলে, প্রথমে একটা বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক হয়। আমাদের দেহের অলস অণুগুলিকে সজাগ করাই এই চেষ্টার কাজ। তা'র পর বহুক্ষণ সেই একই কাজে নিযুক্ত থাকিলে, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অণুগুলি এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন অতি অল্প আয়াসেই, তাহারা যথোপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইয়া কার্য্যটা যন্ত্রবৎ সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করে। কার্য্যের প্রারম্ভে যে চেষ্টার আবশ্যক হয়, মাঝখানে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প আয়াসেই কাজ সুসম্পন্ন হইয়া যায়। মাংসপেশীতে কিছু অধিককাল ধরিয়া নিয়মিত আঘাত দিলে, তাহারও অণুসকল ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণে সজাগ হইয়া বাহ্যিক তাড়নায় অধিক পরিমাণে সাড়া দিতে থাকে; এই সাড়ার রেখাচিত্র, প্রথম চিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম চিত্রের নিয়মিত উত্তেজনাজ্ঞাপক সেই সমদীর্ঘ রেখার পরিবর্ত্তে, কতকগুলি ক্রমদীর্ঘ অসমান রেখা অঙ্কিত হইয়া এক সোপানাকার চিত্রের রচনা করে।

উত্তেজনা থাকিলেই পরে অবসাদ আসে। দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন একটা কার্য্য করিতে থাকিলে, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন অবসন্ন হইয়া পড়ে, সুদীর্ঘকালব্যাপী পুনঃপুন আঘাতে মাংসপেশীতেও তদ্রূপ ক্লান্তি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্লান্তি-বৃদ্ধির সহিত সাড়ার মাত্রাও ক্রমে কমিয়া যায়; সুতরাং এই সাড়ায় যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা একটা ক্রমহ্রাসমান সোপানাকারে অঙ্কিত হইয়া পড়ে।

সম্প্রতি অধ্যাপক বসু মহাশয় উদ্ভিদকেও ঠিক তদনুরূপ অবস্থায় ফেলিয়া, তাহার সাড়শক্তির অবিকল সেইপ্রকারের প্রমাণ পাইয়াছেন।

একই নির্দ্দিষ্টকালের শেষে উদ্ভিদ-শরীরে সমান বলে আঘাত কর, উদ্ভিদ সমভাবে সাড়া দিতে থাকিবে এবং চিত্রও সমদীর্ঘ রেখাময় হইয়া অঙ্কিত হইতে থাকিবে। তা'র পর নিয়মিত তাড়নাটা আরো কিছুকাল চালাও, উদ্ভিদের অণুসকল লাঘবতা লাভ করিয়া খুব সবলে সাড়া দিতে থাকিবে এবং চিত্রটাও তদবস্থ মাংসপেশীর চিত্রের অণুরূপ সোপানাকারে অঙ্কিত হইয়া পড়িবে। সুদীর্ঘকাল এইপ্রকার আঘাত দিতে থাকিলে, সজীব প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদ যে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহাও অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন। অবসন্ন উদ্ভিদ শত তাড়নায়ও কোন সাড়া দেয় না, কাজেই চিত্রের সাড়ানির্দ্দেশক উঁচু-নীচু রেখাপাত হয় না। আঘাত রোধ করিয়া ক্লান্ত উদ্ভিদকে একটু বিশ্রামের অবকাশ দাও, কিয়ৎকাল-মধ্যে সে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িবে। এখন আঘাত কর, উদ্ভিদ ঠিক পূর্ব্ববৎ সাড়া দিবে।

পাঠক দেখিয়া থাকিবেন, মাংসপেশীর কোন অংশ দীর্ঘকাল একই-ভাবে আন্দোলিত করিলে বা তাহাতে অতিদ্রুত আঘাত দিতে থাকিলে, সেটা শীঘ্রই পূর্ণ অবসাদ বা ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় মাংসপেশী এ প্রকার জড়তা লাভ করে যে, কোন উত্তেজনাদ্বারা তাহার সেই অসাড়ত্ব দূর হয় না; কিন্তু কিয়ৎকাল বিশ্রামের অবকাশ দিলে, সেটি আপনা হইতেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে। অধ্যাপক বসুর পরীক্ষায় জীবিত উদ্ভিদ দেহেও ঠিক পূর্ব্বোক্তপ্রকারের ধনুষ্টঙ্কার দেখা-গিয়াছে এবং অবসাদ অপনোদনের জন্য প্রাণীকে যে প্রকার চিকিৎসা করিতে হয়, অবসাদ মোচনের জন্য উদ্ভিদকেও যে তদ্রূপ চিকিৎসা করা আবশ্যক, তাহাও জানা গিয়াছে।

শীতাতপের মাত্রাভেদে উদ্ভিদ-দেহে আঘাতের ক্রিয়া কিপ্রকারে পরি-বর্ত্তিত হয়, তাহাও অধ্যাপকমহাশয় বহু পরীক্ষাদিদ্বারা আবিষ্কার করিয়া-ছেন। মানুষ ও অপর প্রাণী যেমন বায়ুর একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় স্ফূর্ত্তির

সহিত কাজ করিতে পারে, জাতি বিশেষে উদ্ভিদের চরম কার্য্যক্ষমতাও সেইপ্রকার এক একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় স্ফূর্ত্তি পাইতে দেখাগিয়াছে। অত্যন্ত শীতল স্থানে একটি উদ্ভিদপত্র রাখিয়া তাহাকে আঘাত কর, সেটা শীতে আড়ষ্ট হইয়া থাকিবে, শীতার্ত্ত প্রাণীর ন্যায় সে কোনই সাড়া দিবে না। তা'র পর আর একটিপত্রকে অত্যন্ত গরমে রাখ; এই অবস্থায় সে এত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে যে, তখন অতি মৃদু সাড়া দিবার শক্তিটি পর্য্যন্ত তাহার থাকিবে না।

প্রকৃতিভেদে মানুষে শীতাতপ-সহিষ্ণুতার যেমন পরিবর্ত্তন দেখাযায়, উদ্ভিদেও অবিকল তদনুরূপ পরিবর্ত্তন দেখাগিয়াছে। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডবাসী যে শীতে খুব স্ফূর্ত্তির সহিত কাজ করে, আফ্রিকাবাসীকে সেই শীতে মৃত-প্রায় হইতে দেখা যায়। অধ্যাপক বসু আইভি, হোলি ও লিলি জাতীয় কয়েকটি উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—যে শৈত্যে আইভি লতা ও হোলি সজাগ থাকে, সেই শৈত্যেই লিলি মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন বহু আঘাতেও তাহার কোন সাড়া পাওয়া যায় না। তাহার পর শৈত্যের মাত্রা বাড়াইলে লিলির মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়।

নানাজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে কোন্‌টি কোন্ উষ্ণতায় সর্ব্বাপেক্ষা স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন থাকে এবং শৈত্যের পরিমাণ কতদূর বাড়িলে তাহাদের মৃত্যু, তাহা অধ্যাপক বসু স্থির করিয়াছেন। ফাহরণহিটের ১৩০ অংশ উষ্ণজলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসিলে, অধিকাংশ উদ্ভিদেরই মৃত্যু উপস্থিত হয়—দেখা গিয়াছে।

দ্রব্যবিশেষের অবসাদকর ও মাদকক্রিয়ার সহিত আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিচিত। ক্লোরোফরম বা অপর বিষ প্রয়োগকর, প্রাণি-দেহ অসাড় হইয়া পড়িবে এবং মাত্রা প্রচুর হইলে মৃত্যু ঘটিবে। এমোনিয়া বা অপর কোনও উত্তেজক পদার্থের সাহায্য গ্রহণ কর, শরীরের অবসাদ-নাশ ও উত্তেজনা-বৃদ্ধি পাইবে। অধ্যাপক বসু উদ্ভিদ-দেহে নানা উত্তে-

জক ও অবসাদকর পদার্থের ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রাণী ও উদ্ভিদ-দেহে এই পদার্থগুলির কার্য্য অবিকল এক। উদ্ভিদ-দেহে উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করিলে তাহার সাড়ের প্রবলতা স্পষ্ট বাড়িয়া উঠে এবং বিষ বা অপর অবসাদজনক পদার্থের প্রয়োগে প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও অবসাদ-লক্ষণ দেখা যায়। বিষের মাত্রাটা প্রচুর হইলে ইহারও মৃত্যু ঘটে।

প্রয়োগমাত্রার উপর ঔষধের ক্রিয়া অনেক নির্ভর করে। যে ঔষধ স্বল্পমাত্রায় গ্রহণ করিলে প্রাণী রোগমুক্ত হয়, তাহারই অযথা প্রয়োগে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। বেলেডোনা, আরসেনিক্ ও অহিফেন প্রভৃতি দ্রব্য মাত্রাভেদে কি প্রকারে কখনও ঔষধের এবং কখনও বিষের কাজ করে, তাহা সকলেই জানেন। অধ্যাপক বসু উদ্ভিদেও অবিকল অনুরূপ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। উদ্ভিদ-দেহে অল্পমাত্রায় বিষপ্রয়োগ-কর, উদ্ভিদ উত্তেজিত হইয়া প্রবল সাড়া দিতে থাকিবে। বিষের প্রয়োগ-মাত্রা বৃদ্ধিকর, উদ্ভিদ অবসন্ন হইয়া পড়িবে এবং শেষে সাড়ানির্দ্দেশক রেখাচিত্রে মৃত্যু-রেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িবে।

আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দিবার ক্ষমতা যে, সজীব পদার্থ মাত্রেরই একটি বিশেষত্ব, তাহা ইতিপূর্ব্বে জানা ছিল; কিন্তু প্রাণী, উদ্ভিদ ও ধাতবপদার্থের সাড়ারমধ্যে যে এতটা সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে, তাহা কোন জীববিদ্ এপর্য্যন্ত অনুমানও করিতে পারেন নাই। প্রাণীর ন্যায়, ধাতু ও উদ্ভিদের বেদনা-বোধ-শক্তি আছে কি না, সে সম্বন্ধে কোনও কথা এখন বলা চলে না; কিন্তু আঘাতজাত বেদনায় সচেতন প্রাণীর যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করে, সেই আঘাতে উদ্ভিদ এবং ধাতুও যে তদনুরূপ চিহ্নের বিকাশ করে, তাহা আর এখন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত জীবন-ক্রিয়ার মূলটা যে সাড়া দেওয়া ব্যাপারেই আছে, তাহাও অধ্যাপক বসুর পরীক্ষায় জানা গিয়াছে।

জীবন-ক্রিয়ার কথা উঠিলেই, প্রাচীন ও আধুনিক জীববিদ্‌গণ "জীবনী শক্তি" নামক একটা কল্পনাতীত ব্যাপারের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া, জৈবক্রিয়া মাত্রেরই ব্যাখ্যা দিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু এই "জীবনী শক্তিটা" (vitalism) যে কি, জিজ্ঞাসা করিলে দেহবিদ্‌গণ নিরুত্তর থাকিতেন। কোন্ পথে চলিলে পণ্ডিতগণের মনোরাজ্যের অধিবাসী সেই "জীবনী শক্তি"র বাস্তবিক সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার তাহা শীঘ্রই নির্দ্দেশ করিয়া দিবে বলিয়া আশা হইতেছে। যদি জীবন রহস্যের মীমাংসা কখনও সম্ভবপর হয়, তবে অধ্যাপক বসুর আবিষ্কার দ্বারাই তাহার সমাধান হইবে। রহস্যময় জীবরাজ্যের মহা-সিংহদ্বারের চাবি উদ্ভিদ ও তুচ্ছ ধাতুতে আবদ্ধ আছে, প্রাণীর জীবন-ক্রিয়ার শত জটিলতার মধ্যে তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

প্রাণী ও ধাতুর পরস্পর সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া আচার্য্যপ্রবর ইতিপূর্ব্বে যে প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক সমস্যার রচনা করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা হইতে না হইতেই, তাঁহার আর এক নূতন আবিষ্কার জগৎকে বিস্মিত করিয়া তুলিতেছে। অধ্যাপক বসুর এই সকল আবিষ্কার আধুনিক জীব ও জড়বিজ্ঞানে একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব উপস্থিত করিবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন।*

শ্রীজগদানন্দ রায়।

---

* এই প্রবন্ধের কতকাংশ "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

(উপন্যাস)

——:o:——

প্রথম খণ্ড—শ্রীনরেন্দ্র নাথ শর্ম্মার কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আগামী সোমবার হইতে আমাদের এফ,এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। আজ কি একটা যোগ ছিল ;—প্রভাতে উঠিয়া, আমরা কতিপয় সতীর্থ বন্ধু একত্র মিলিয়া গঙ্গাস্নান মানসে পবিত্র সলীলা জাহ্নবীতীরে যাত্রা করিলাম।

যথাসময়ে গঙ্গাস্নান করিয়া আমরা বাসার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময়ে ডাকপিয়ন আসিয়া আমার হাতে দুই খানি পত্র ও একটি Moneyorder দিয়া দাঁড়াইল। পত্র ও Money-order খানি হাতে করিয়া উপরে আসিলাম। তারপর, রসিদ দিয়া টাকা কয়েকটি গুনিয়া ট্রাঙ্কের মধ্যে রাখিয়া পত্র দুই খানি পড়িতে বসিলাম। পত্র দুই খানির এক খানা আমার অগ্রজ হেমেন্দ্র নাথের, অপর খানি স্ত্রীলোকের হাতের বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা—চিনিতে পারিলাম না। স্ত্রীলোকের হাতের লেখা সত্য ; কিন্তু আমার দিদির নহে,—সে লেখা চিনিতাম। প্রথমত ভাবিয়া পাইলাম না, কে আমাকে চিঠি লিখিয়াছে। এ সংসারে একমাত্র দিদি হেমপ্রভা ভিন্ন আমাকে পত্র লিখিবার অন্য কোন স্ত্রীলোক ছিলেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, পরে কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া পত্রখানির আবরণ উন্মোচন করিলাম। পত্র খুলিয়াই দেখিতে পাইলাম, পত্রখানি

আমার বউঠাকুরাণী হেমকুমারী লিখিয়াছেন। আমি অধিক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পত্র পড়িতে লাগিলাম। বউঠাকুরাণী লিখিয়াছেন :—

ঢাকা।

ফাল্গুন।

আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন:—

দীর্ঘকাল আপনার সংবাদ জানি না,—জানিবারও কোন উপায় নাই। তাই অনন্যোপায় হইয়া, এই পত্র লিখিতে বসিলাম। আশা করি, আমার এই প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। বিবাহের পর দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই দুই বৎসর আপনার নাম শুনিয়া আসিতেছি ; কিন্তু আমার এমনই দুরদৃষ্ট যে, এই দীর্ঘকাল মধ্যে এক বারও আপনাকে দেখিতে পাইলাম না। আমি বালিকা বয়স হইতে জগদীশ্বরীর চরণে নিয়ত প্রার্থনা করিয়া আসিতে ছিলাম, শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরের ও স্নেহের পুত্রবধূ এবং দেবর-ননদের অতুল গৌরবে গৌরবান্বিতা বউঠাকুরাণী হইতে পারি। কিন্তু বিধাতা আমার পূর্ব্ব সাধে বাদ সাধিলেও, শেষ সাধ পূর্ণ করিয়াছেন। তথাপি বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শেষ সাধ পূর্ণ হইলেও, অদৃষ্টদোষে এই দীর্ঘ সময়ে একটিবারের জন্যও আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম না,—আপনিও গৃহে আসিলেন না। সকলেই স্বামী গৃহ হইতে পিত্রালয়ে আসিলে, আপন আপন শ্বশুর-শাশুড়ীর অকৃত্রিম স্নেহ ও দেবরগণের স্নেহের ও প্রীতির সম্যক্ আলোচনা করিয়া নিজে সুখিনী হন এবং অন্যের হৃদয়ে বিমল সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। আর আমি এমনই মন্দভাগিনী যে, আপনার ন্যায় স্নেহাস্পদ দেবর থাকিতেও আমি তাঁহার স্নেহ ও ভক্তি উভয় হইতেই এতদিন বঞ্চিত আছি। অনেকেই বিদেশে—আত্মীয়-স্বজন-শূন্য বিদেশে বাস করেন, আবার সুবিধা ও অবসর পাইলেই গৃহে আইসেন ; কিন্তু আপনাকে উক্ত দুই বৎসর কাল

মধ্যে একবারও গৃহে আসিতে দেখিলাম না। তা'রপর, আপনার অগ্রজের পত্রে শুনিলাম যে,—লিখিয়াছেন—"আমি সুন্দর রূপে গৃহ-কার্য্য চালাইতে না পারিলে আপনি গৃহে অসিবেন না।" কিন্তু এখন আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন—আমি সংসারের সকল কাজই এক প্রকার করিতে শিখিয়াছি,—এখন বাড়ী আসিলে আর চারিটি অন্নের জন্য পরের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হইবে না। আশা করি, এবার পরীক্ষার পর বাড়ী আসিতে অন্যথা করিবেন না। আপনার পরীক্ষা শেষ হইলে, ঢাকায় আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। এ বিষয়ে অধিক আর কি লিখিব, ভরসা করি আপনার স্নেহময়ী বউ-ঠাকুরাণীর এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অন্যমত করিবেন না। অদ্য এই পর্য্যন্ত,—সতত আপনার কুশল সংবাদে সুখী করিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—

শ্রীমতী হেমকুমারী দেবী।

বউঠাকুরাণীর পত্র পাঠ সমাপন করিয়া, দাদার পত্র খুলিলাম। দাদা লিখিয়াছেনঃ—

কানপুর।

প্রাণাধিক নরেন্!

দুই বৎসরের অধিক তোমায় দেখি নাই। এই দুই বৎসর তোমায় না দেখিয়া আমি কি ভাবে দিন কাটাইতেছি, এক-মাত্র জগদীশ্বরই তাহা জানেন—পত্রে কি লিখিব। যাহা হউক, এবার পরীক্ষান্তে বিদেশ ভ্রমণের কল্পনা দূর করিয়া, ঢাকা যাইয়া তোমার বউঠাকুরাণী—শ্রীমতী হেমকুমারীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী যাইও। আমিও কালেজ বন্ধ হইলেই, বাড়ী যাইয়া অনেক দিন পরে একবার তোমায় দেখিয়া হৃদয় প্রফুল্ল করিব। তোমার কলিকাতার ব্যয় ও ঢাকা যাইবার ব্যয়ের জন্য অদ্য মনি অর্ডার করিলাম। এখন তোমার

বউঠাকুরাণী সংসার চালাইবার বেশ উপযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং এখন বাড়ী গেলে আর কোন কষ্ট বা খেজালত ভোগ করিতে হইবে না। তবে বড় বাকে লইয়া যাইবার সময় সেই সঙ্গে শ্রীমতী রাজকুমারীকেও আনিবে, নহিলে তাঁহার একাকিনী থাকিতে কষ্ট হইতে পারে। আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমার শুভ বিবাহ দিবার মনন করিয়াছি। বাড়ী যাইয়া শ্রীমান্ ভবতোষের বাচনিক সব শুনিয়া তাহার উত্তর দিও। সতত শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। অধ্যয়ন করা যেমন বিশেষ আবশ্যক, শরীর রক্ষা করাও ততোধিক কর্ত্তব্য। আগে শরীর, পরে অধ্যয়ন। শরীর রক্ষা না হইলে—স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে অধ্যয়ন করিয়া কি ফল লাভ করিবে। আর কি লিখিব সতত তোমার কুশল সংবাদে সুখী করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

তোমার দাদা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি ঢাকায় আসিয়া পৌছিলাম। ইতিপূর্ব্বে কোন দিন ঢাকায় আসি নাই; সুতরাং পথঘাট সম্পূর্ণ অপরিচিত,—সঙ্গে জিনিস পত্রাদিও কিছু আছে। শেষে অনুসন্ধানে জানিলাম যে, দাদার শ্বশুরের বাসা ষ্টেসন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে। অগত্যা অনেক চেষ্টার পর, একখানি ছ্যাক্‌রা গাড়ী ভাড়া করিয়া সহরাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আজ চৈত্রের পূর্ণিমা-নিশা—বাসন্তী পূর্ণিমার ফুল্ল চন্দ্রালোকে প্রাচীন মুসলমান রাজধানী ঢাকার অতীত গৌরব ভাবিতে ভাবিতে দাদার শ্বশুর নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসার নিকট পৌছিলাম। বাসার দ্বারে গাড়ী লাগিবামাত্র আমি গাড়ী হইতে নামিবার পর, হঠাৎ বহির্ব্বাটীর বারান্দার দ্বারদেশে যে ভুবন-

মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিলাম, ক্ষণকালের জন্য সেই দৈবী মূর্ত্তি হইতে, আমার নবযৌবনের আবেগময় আকাঙ্ক্ষা-পরিপূর্ণ-নয়নযুগল সহসা অপসারিত করিতে পারিলাম না। আমি আমার উন্মেষোন্মুখ নবযৌবনের আবেগময় নয়নে বসন্তের সেই ফুল্ল চন্দ্রালোকে দেখিলাম যে, বহির্ব্বাটীর দ্বারদেশে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষের পরম লাবণ্যময়ী কুসুম-প্রতিমারূপিণী একটি কিশোরী আপনার অপূর্ব্ব রূপরাশিতে আজিকার মত বসন্তের এই ফুল্ল চন্দ্রালোককে নিষ্প্রভ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নিদাঘের শেষে নবজলধর ধারা পাইলে বিটপি-শ্রেণী যেমন নবপত্রে সুশোভিত হইয়া, মানব চক্ষুর অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে, এই কিশোরীও তেমি আপনার কৈশোর কাল অতীত করিয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করত আপনার অতুল সৌন্দর্য্য-রাশিতে মানব চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিলেন। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া কতক্ষণ যে আপনার মনে এই সুন্দরীর অতুল সৌন্দর্য্য পানে চাহিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না,—তখনকার সময়ের প্রতি আমার বড় একটা লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ অপরিচিত পর পুরুষকে দেখিয়া, সেই সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা খানি ত্বরিত পদে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বোধ হয় যাইবার সময় সুন্দরীর পায়ের মল চারিগাছি একটু অধিক মাত্রায় মৃদু মধুর নিক্কণে বাজিয়া উঠিয়াছিল, আর সেই মধুর নিক্কণে আমার মোহ কাটিয়া গেল;—অমনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চাহিয়া দেখি যে, অপরিচিতা চলিয়া গিয়াছেন।

আমি গাড়ী হইতে জিনিস পত্রাদি নামাইয়া লইতে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময় অন্তঃপুর মধ্য হইতে দ্বাবিংশ কি ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়স্ক একটি যুবক হাসিমুখে আসিয়া আমার কণ্ঠ জড়াইয়া হাসিমুখে কহিলেন,—"এত বিলম্ব হলো, কেন হে?"

আমি—"পথে কোন সুহৃদের গৃহে তিন দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।" এই যুবকের নাম বিমল প্রসাদ,—বিমল প্রসাদ হেম কুমারীর জ্যেষ্ঠ সহোদর।

যথাসময়ে জিনিষ পত্রাদি নামাইয়া লইয়া গাড়ী ভাড়া দিতেছি,—এমন সময় চাকর আসিয়া তামাক দিয়া গেল। কলিকাতার মেসের মহিমায় অল্প বয়স হইতেই ধূমপান বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলাম; সুতরাং তাড়াতাড়ি গাড়ী ভাড়া মিটাইয়া দিয়া, তামাক খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমশ

শ্রী—

মা আমার!

(১)

মা আমার!

স্বর্গ হ'তে কোন্ রথে গেছ তুমি কোন্ পথে,—
তোমার সংসার খানি করি অন্ধকার!
কোন্ জ্যোতির্ম্ময় লোকে, কে দেখেছে মর্ত্ত্য-চোখে,
কত তারা-দীপ্ত পথ হ'য়ে গেছ পার!
মা আমার!

(২)

কোন্ নিশিহীন দেশে— নীলিমার রাজ্য শেষে—
নূতন প্রভাত বুঝি পেয়েছ আবার!
শুচি-স্নাত পুণ্য দেহ, পেয়েছ নূতন গেহ,—
ত্যক্ত পুরাতন ধরা মনে নাই আর!
মা আমার!

(৩)

কে নিয়েছে বুকে টেনে, ভুলে গেছ সব জেনে,
তোমার বিহনে কারা করে হাহাকার!
সেথা কি মমতা নাই— অশোক—অপাপ ঠাঁই,
সেথা কি হ'য়েছ তুমি হেন নির্ব্বিকার!
মা আমার!

(৪)

রবি শশী ছাড়ি' দূরে— সে কোন্ অমৃত পুরে
গেছ চলি মরণের ছাড়ি' অধিকার!
সঙ্গহীন পথ থেকে কেবা নিয়েছিল ডেকে,
দিয়েছিল হাতখানি ধরিতে তাহার!
মা আমার!

(৫)

বর্ষ দশ ছাড়ি যাঁরে রহিলে দাঁড়ায়ে দ্বারে
আজি কি পাইলে তুমি দরশন তাঁর?
আছ যদি এক-লোকে— আমরা কাতর শোকে,
সে কথা বলিতে বাধা আছে কি তোমার?
মা, আমার!

(৬)

ক্ষুদ্র গৃহে ছিলে তুমি,— আজি জুড়ে' বিশ্বভূমি;
আকাশের মত ধ্রুব ব্যাপ্ত একাকার!
প্রতি তরু—প্রতি ফুলে, তোমারে দেখিব ভুলে,
অণু-পরমাণু-মাঝে তোমার বিকার!
মা, আমার!

(৭)

তাই হোক্—তাই হোক্,— জলুক্ অন্তরে শোক,
জানিব না—বুঝিব না, কোথা মা আমার!
মা আমার চিত্তপটে— মা আমার সর্ব্বঘটে,
অন্তরে বাহিরে মা যে ব্যাপিয়া সংসার!
মা আমার!

(৮)

দেখিব করুণা যথা, বুকভরা আকুলতা,
মমতার মন্দাকিনী বহে শতধার;—
বরাভয় হাতে ধরি', শত চক্ষে ল'ব ভরি—
রমণীতে মাতৃরূপ—সে কি ভুলিবার?
মা, আমার!

(৯)

তোমারি শোণিত দেহ,— মাগিব তোমারি স্নেহ,
তোমারি কল্যাণ রবে ঘেরিয়া সংসার!
অলক্ষ্যে তোমার আঁখি, —দূরে বা নিকটে থাকি—
স্নেহ-পূত দৃষ্টিখানি দিবে উপহার!
মা, আমার!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

অনুকরণ-রহস্য।

আমরা যখনই "অনুকরণ" শব্দটা ব্যবহার করি, প্রায় নিন্দা করিবার জন্যই করি। কিন্তু অনুকরণ মাত্রই কি নিন্দনীয়? তাহা ত নহে। ইহা প্রমাণ করা যায় যে, মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ, বর্জিলের কাব্য হোমরের কাব্যের অনুকরণ, ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্র রোমক ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অনুকরণ। তাই বলিয়া কি মহাভারত, ইলিয়াড, ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্র নিন্দনীয়?

তাহা ত নহে। বরং অনুকরণ যে অনেক সময় অনুকৃতের উপরেও যায়, ইহার পরিচয় সাহিত্যে আছে। যোসেফ্ স্ক্যালিগার প্রাচীনতার —অর্থাৎ, গ্রীক্ ও ল্যাটিন সাহিত্যের—বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক লেখকদিগকে তিনি নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। মিউরেট্স্ নামক একজন লেখক তাঁহার উপর এক বড় চাল্ চালিয়াছিল। একটি কবিতা লিখিয়া, তাহা একখানি পুরাতন হস্ত লিখিত গ্রন্থে প্রাপ্ত বলিয়া স্ক্যালিগারের হস্তে অর্পণ করেন। স্ক্যালিগার সেই কবিতা পড়িয়া এতটা মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার De Re Rustica নামক গ্রন্থে প্রাচীন কবিদিগের উৎকর্ষের নিদর্শন স্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার পক্ষে আর পিছাইবার পথ নাই, তখন মিউরেটস্ প্রকাশ করিলেন যে, ইহা তাঁহার নিজের লিখিত কবিতা; প্রাচীন গ্রীক্ বা ল্যাটিন কবিতা নহে। স্ক্যালিগার যে অভ্রম হইলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। অনুকরণ মাত্রই কি ব্যর্থ?

চিত্র-শিল্পের সম্বন্ধে একটা গল্প করি। পিটর্ মিগ্নার্ড একখানি 'ম্যাগডালেন' চিত্রিত করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, ইহা গিডোর চিত্র।

প্রকাশকের চাতুরী ও ষড়যন্ত্রে শিভালিয়ার দে ক্লেয়ারভিল্ অনেক টাকা দিয়া ইহা ক্রয় করিলেন। চিত্র-বিদ্যার তখন প্রধান সমালোচক, লে ব্রুন্। তিনি প্রকাশ করিলেন, ইহা নিশ্চিতই গিডো। তাহার পর মিগ্নার্ড প্রকাশ করিলেন যে, ইহা তাঁহার নিজের অঙ্কিত, গিডোর নহে। গিভালিয়ার মিগনার্ডকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন —"আজ অনেক বড় লোকের সঙ্গে আপনার দেখা হইবে—লে ব্রুনের সঙ্গে ও হইবে।" নিমন্ত্রণ সভায় লে ব্রুণ বলিলেন ইহা গিডোছাড়া অন্য কিছুই হইতে পারে না। শিভালিয়ার ক্লেয়ারভিল বলিলেন, ইহা নিশ্চিত গিডোর। তখন মিগ্নার্ড বলিলেন, আমি নিজে অঙ্কিত করিয়াছি। যদি প্রমাণ আবশ্যক হয়, দিতে প্রস্তুত আছি। তখন ইউরোপে লে ব্রুণ সর্ব্বপ্রধান চিত্রবিদ্যার সমালোচক। তিনি অবশ্য অভ্রম হইলেন; তবে অনুকরণ বিষয়ে মিগ্নার্ডের যে কতটা মাহাত্ম্য তাহাও ত প্রকাশ হইল।

দুই একটা দেশের কথাও বলিতে ইচ্ছা করে। বঙ্কিম বাবুর ভাষার যাঁহারা অনুকরণ করিয়াছেন, প্রায়শঃ কাহারই ভাষা ভাল হয় নাই। রবীন্দ্র বাবুর কবিতা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাঁহার শিষ্যদিগের কবিতা দুরধিগম্য। কি যে দুঃসময় পড়িয়াছে, যে কেহ কবিতা লিখিতে যান, তিনিই আপনাকে শেলী বলিয়া বিবেচনা করেন। যেমন ঋগ্বেদ আর লেখা হইতে পারে না; তেমনই শেলীর মত আর লেখা হইতে পারে না। বৈদিক ঋষিরা প্রভাতগগণে আলোক দেখিয়া বলিতেন, তাহা সূর্য্যের অশ্ব; বিদ্যুতকে বলিতেন, অগ্নির পাখী; মেঘকে বলিতেন, দেবতাদের গোধন। শেলী সেই প্রণালীর কবি। আমাদের শ্যাম বাবু রাম বাবুরা যদি আপনাদিগকে শেলী মনে করেন, তাহা হইলে হাসিব কি কাঁদিব, তাই ভাবি।

অনুকরণ যে অতি চমৎকার হইতে পারে, তাহার পরিচয় আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যে পাইয়াছি। বাইরণের ম্যানফ্রেড্ প্রকাশ হইলে ইউরোপশুদ্ধ লোক বলিয়াছিল ইহা গেটের ফাউষ্টের নকল। কিন্তু গেটে স্বয়ং বলিয়াছিলেন, যে আমি বোধ হয় ম্যান্‌ফ্রেড্ লিখিতে পারিতাম না। যদি নকলই হয়, এ রকম নকল বাঞ্ছনীয়।

যেথানে ক্ষমতা আছে, সেথানে অনুকরণেও সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত হয়। যেথানে ক্ষমতা নাই, সেথানে অনুকরণে ব্যর্থতাই হয়। প্রতিভা এক জিনিষ; নকল আলাদা, দেশে যদি বহুসংখ্যক প্রতিভাশালী পাইতাম, তাহা আমাদের বড় গৌরবের কথা হইত।—প্রতিভা নাই, ক্ষমতা নাই, কিন্তু লেখক আছে। আমাদের দেশের যে বড় দুর্ভাগ্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পয়গম্বর মহম্মদের এবন্‌সায়দ নামে একজন মুহুরি ছিল, মহম্মদ নিজে লেখা পড়া জানিতেন না সুতরাং কোরাণ তিনি মুখে বলিয়া যাইতেন এবন্ লিখিয়া লইত। একদিন কোরাণ লিখিতে লিখিতে এবন্‌সায়দ বলিয়া উঠিল, "জগদীশ্বরের জয় হোক, এমন সৃষ্টি আর হয় না," মহম্মদ বলিলেন, এ কথাকেও—কোরাণের অন্তর্গত কর। এবন্‌সায়দের সেই দিন মনে হইল তবেত আমিও কোরাণ লিখিবার অধিকারী, দেবতার নিগ্রহে বিপর্য্যস্ত হইয়া শেষে কিন্তু এবন্‌কে জানু নত করিয়া স্বীকার করিতে হইল যে কোরাণ লিখিবার জন্য তিনি প্রেরিতও হন নাই, এবং ভগবানের সে অভিপ্রায় ও নহে। নকল নবিশদের এ কথাটা মনে করিয়া রাখা ভাল।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

কবিচন্দ্র।

(নবাবী ও ইংরাজি আমল।)

কিছুদিন হইল "ভারতী" নামক মাসিক পত্রিকায় বঙ্গসাহিত্য সংসারে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় প্রাচীন কবি "কবিচন্দ্র" সম্বন্ধে—কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণে "কবিচন্দ্রের অনেকগুলি কবিতা ও কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার তালিকা দীনেশ বাবু এক প্রকার দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় পাঠ্যাবস্থার প্রথমে "শিশুবোধকে" "গঙ্গার বন্দনা" ও দাতাকর্ণ নামক দুটী ভাষাকাব্য পাঠ করিয়াছেন তাহাও কবিচন্দ্রের লিখিত বলিয়া প্রকাশ। দীনেশ বাবু বলেন যে উক্ত কবিচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধোক্ত কবিচন্দ্র নহেন। তাঁহার "কবিচন্দ্র" "গোবিন্দমঙ্গল" ও "গৌরীমঙ্গল" প্রণেতা; এসম্বন্ধে তিনি কোন বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। "পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণে কতকগুলি পুঁথিতে "কবিচন্দ্র" কতকগুলিতে "দ্বিজ কবিচন্দ্র" আর কোন কোন পুঁথিতে "কবিচন্দ্র মিশ্র ও কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী" প্রভৃতি নামে ভণিতা দৃষ্ট হয়। দামুন্যার দরিদ্রকবি চণ্ডীকাব্য প্রণেতা মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের এক ভ্রাতা অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র 'গঙ্গার বন্দনা' রচনা করেন, পরিষৎপত্রিকায় ও তাঁহার পুঁথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে এই অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র আর দীনেশ বাবু কথিত কবিচন্দ্র একই ব্যক্তি কি না এ প্রশ্নও কোন কোন পাঠকের মনে উঠিতে পারে।

আমাদের বিবেচনায় উভয় কবিচন্দ্র একই ব্যক্তি। উভয়েই ব্রাহ্মণসন্তান এবং উভয় কবির লিখন-ভঙ্গী (Style) ও পুঁথিগুলির

আরম্ভ ও ভণিতা (শেষ চরণ) একই ধরণের বলিয়া বোধ হয়। এ-সম্বন্ধে অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত না করিয়া নিম্নে কতকগুলি উদ্ধৃত করা গেল :—

"দাতাকর্ণ" কবিতার রচয়িতার আরম্ভ যথাঃ—

বৈশম্পায়ন কহিলেন শুন জন্মেজয়
মহাভারতের কথা শুন মহাশয়।

ইহার শেষ চরণ যথাঃ—

এতদূরে দাতাকর্ণের পালা হইল সায়।

দীনেশ বাবুর প্রবন্ধোক্ত কবিচন্দ্রের পুঁথির আরম্ভ যথাঃ—

পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণের ২৪ নং পুঁথি-একাদশী ব্রত পালা—আরম্ভঃ—

শুক বলে পরীক্ষিৎ ধরহ বচন
একাদশী ব্রত রাজা কর আরম্ভণ।

শেষ চরণ--(ভণিতা) যথাঃ—

দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ব্যাসের রাঙ্গাপায়
হরি হরি বল সবে পালা হ'ল সায়।

১৩৫ নং পুথি—মহাভারত—(বনপর্ব্ব) আরম্ভ যথাঃ—

বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুন জন্মেজয়
কাম্যবনে যুধিষ্ঠির বৃকোদরে কয়।

শেষ চরণ (ভণিতা) যথাঃ—

বনপর্ব্বের কথা এত দূরে সায়
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জীবনচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে উহাদের বংশের উপাধি মিশ্র ও চক্রবর্ত্তী। দীনেশ বাবুর প্রবন্ধোক্ত কবিচন্দ্রের অনেক গুলি কবিতায় কবিচন্দ্র মিশ্র ও কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এই দুই ভণিতাও দৃষ্ট হয়। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য "কবিচন্দ্র" উপাধিধারী এই দুই ব্যক্তি একজন কিনা "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" পুস্তক প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ দীনেশ বাবুই তাহার মীমাংসা করুন। ইনিই বর্ত্তমান প্রবন্ধ কথিত নবাবী আমলের কবিচন্দ্র।

ইহা ব্যতীত ইংরাজি আমলে আর একজন কবিচন্দ্রের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ১৩০৯ সালের "কল্যাণী" নামক মাসিক পত্রিকার ৭।৮ সংখ্যার জনৈক লেখক আর একজন কবিচন্দ্র ও তাঁহার অনেক গুলি কবিতার নমুনা প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক কবিচন্দ্রের এই-রূপ পরিচয় দিয়াছেন।

"যশোর জেলার অন্তর্গত বারইখালী গ্রামে কিঞ্চিদধিক একশতবর্ষ পূর্ব্বে "কবিচন্দ্র" বাস করিতেন। ইনি মৌখিক কবিতা রচনা ও সমস্যা পূরণে খ্যাতিলাভ করেন। ইঁহার কবিতাগুলির ভাষা কতক সংস্কৃত কতক বাঙ্গালা কতক বা সংস্কৃত বাঙ্গালা অথবা সংস্কৃত বাঙ্গালা পারসিক ভাষায় মিশ্রিত। "বাল্যে ইঁহার অপর একটী নামছিল; কিন্তু উপস্থিত পদ্য রচনায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন বলিয়া তাঁহার "কবি-চন্দ্র" নামই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। টোলে কিছুদিন সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার শিক্ষালাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

পরলোক গত ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "মুখার্জ্জিস্ ম্যাগেজিন" নামক মাসিক পত্রে কবিচন্দ্রের রহস্য বিষয়ক কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধের ইংরাজি নাম "বিদ্রূ-পাত্মক সংস্কৃত শ্লোকের নমুনা। শ্লোকগুলি হাস্য পরিহাসের চূড়ান্ত; এবং ইহাদের রচয়িতাও একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইহার নাম "পণ্ডিত রামচন্দ্র অপর নাম কবিচন্দ্র" নিম্নে ইহার শ্লোক কয়টী উদ্ধৃত করা গেল। প্রথমটী "হুক্কার স্তব—

"হুক্কাং, কৃষ্ণবর্ণাং দ্বিনেত্রাং উর্দ্ধদণ্ডধরাং
ধুতুরাপুষ্প সমন্বিতাং বরুণবহ্নি সংযুক্তাং।

হা হুক্কায়ৈ নমঃ। এতেগন্ধ পুষ্পে হাং হুক্কায়ৈ নমঃ। আর একটী যথাঃ—

হুক্কে হুক্কে মহাভাগে বৈঠকোপরি সংস্থিতে
সর্ব্বরোগ হরে দেবি! ধূমোদ্গারে নমোস্তুতে।

ধূম পান বিরত ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ নামক কবিতা যথাঃ—

তাম্রকূটং ন খাদন্তি যোনিন্দতি নরাধম
শৃগাল যোনি সংপ্রাপ্য হুক্কা হুক্কা সদারবেৎ।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-সেবিত মস্তিষ্ক ও মেধা পরিষ্কারক নস্যের প্রশংসা বিষয়ক শ্লোক যথাঃ—

প্রশান্ত দৃষ্টি; দৃঢ়দন্ত কেশঃ শশাঙ্কবক্ত্র,
কমলস্য গন্ধ পিকাতকণ্ঠ-পলিত বিহনঃ
নস্যোপভোগী ভবতীহলোকে"।

এই সকল কবিতা বহুকাল হইতে লোকের মুখে চলিয়া আসিতেছে। পণ্ডিত হইতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সময় সময় স্থান বিশেষে উপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিয়া সাধারণের বড়ই প্রীতি ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন; এই জন্যই ইহার একটু পরিচয় দিলাম।

"কল্যাণী" পত্রিকার প্রকাশিত কবিচন্দ্রের রহস্যাত্মক সংস্কৃত শ্লোকাদি এবং "মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন্"-কথিত সংস্কৃত শ্লোকাদির রচনাভঙ্গী একই ধরণের বলিয়া বোধ হয়। প্রবন্ধ লেখক "কল্যাণীর" কবিচন্দ্রের প্রকৃত নাম প্রকাশ করেন নাই কিন্তু মুখার্জিস্ ম্যাগাজিনের কবিচন্দ্রের প্রকৃত নাম রামচন্দ্র। প্রভেদ এইটুকু। এক্ষণে এই উভয় "কবিচন্দ্র" একই ব্যক্তি কি না তাহা সাহিত্যসেবীগণ বিচার করিবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু

গান।

কি কথা বলিব বলে',
বাহিরে এলেম চলে',
দাঁড়ালেম দুয়ারে তোমার,
ঊর্দ্ধমুখে উচ্চরবে
বলিতে গেলেম যবে,
কথা নাহি আর!
যে কথা বলিতে চাহে প্রাণ
সে শুধু হইয়া উঠে গান!
নিজে না বুঝিতে পারি
তোমারে বুঝাতে নারি,
চেয়ে থাকি উৎসুক নয়ান!
তবে কিছু শুধায়োনা,
শুনে যাও আনমনা,
যাহা বোঝ' যাহা নাই বোঝ'!
সন্ধ্যার আঁধার পরে
মুখে আর কণ্ঠস্বরে
বাকিটুকু খোঁজ'!
কথায় কিছু না যায় বলা,
গান সেও উন্মত্ত উতলা!
তুমি যদি মোর সুরে
নিজ কথা দাও পুরে
গীতি মোর হবে না বিফলা!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিঁদূরে পাহাড়।

—Believe me, Sir,
It carries a rare form—But 'tis a Spirit.

The Tempest.

সাধারণে—এই পাহাড়ের বিষয় বিশেষ অবগত নহেন এবং কেনই বা ইহার এরূপ অদ্ভুত নাম হইয়াছে তাহাও জানেন না। সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় অলৌকিক কাণ্ডের প্রকাশ-বাসনায় আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার অবতারণা।

বাঁকুড়া সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি। নানা আভরণে বরবপু সাজাইয়া প্রকৃতিদেবী এস্থলে মনোমোহিনীরূপে বিরাজ করিতেছেন। নিত্য নবীন ভূষণে ভূষিতা হইয়া তাপিতের তপ্ত গায়ে শীতল হাত বুলাইতে প্রকৃতির প্রেম-প্রবণ-হৃদয় চিরকালই তৎপর। এস্থানে তাঁহার সেই পর-দুঃখকাতরতা সম্ভূত তৎপরতা অধিক পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। এই শোভাময়ী বাঁকুড়া নগরীর তিন মাইল পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র গিরি পথিকের নয়ন আকর্ষণ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। পর্ব্বতদুহিতা স্রোতস্বিনী যমুনা কল কল নাদে কি এক অস্ফুট প্রেমের গান গাহিতে গাহিতে ইহার পাদদেশ বিধৌত করিয়া দ্বারকেশ্বর নদের সহিত মিলন আশায় সানন্দে নাচিয়া নাচিয়া বহিয়া যাইতেছে। ধ্যানেরত যোগীর ন্যায় ধূসর নগশির আকাশপানে তুলিয়া অচল গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে, পর্ব্বতটী নিতান্ত উচ্চ নহে,—যে কোন সাহসী ব্যক্তি ইহার শিখরদেশে বিনায়াসে নিরাপদে উঠিতে পারেন। ইহার শৃঙ্গের কোন এক স্থল বিদীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিচ্ছেদ অবস্থা মূলদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, ইহার বিস্তার প্রায় দুই হস্ত পরিমাণ হইবে। "সিঁদূরে পাহাড়" এই আখ্যায় অনেকে হয়ত

মনে করিবেন যে, হয় এই পর্ব্বত রক্তরাগে রঞ্জিত, না হয় ইহা রক্তবর্ণ লতাগুল্মাদিতে আচ্ছন্ন; কিন্তু তাহা নহে। এই নামের সহিত একটী অদ্ভুত উপাখ্যান জড়িত আছে। পুরবাসিগণের এই উপাখ্যানে সম্পূর্ণ আস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। উপাখ্যানটী এই,

বহুশতাব্দি পূর্ব্বে—কোন সময়ে তাহার কিছু নির্দ্ধারণ নাই এই পর্ব্বতের অনতিদূরে কোন গৃহস্থ দম্পতি বাস করিতেন। পতি-পত্নীর মধ্যে অকপট, অমল প্রণয় সদা শান্তি-সুধা দান করিত। সে প্রণয়-উদ্যানে চির বসন্ত বিরাজ করিত, প্রতিদিন নব নব কুসুম মধুর হাসি হাসিত; সুরভি-চোর মলয়ানিল নবযৌবনা কুসুম কলিকার সহিত নিরন্তর কেলি করিত; অলিকুল দিবানিশি মধুলোভে গুন্ গুন্ গান গাহিত; পূর্ণিমার রজত-কিরণ এক পবিত্র ভাবের সৃষ্টি করিত; সেখানে কালিমাময় লালসার অধিকার ছিল না। প্রণয়বিভোর দম্পতি সংসারের যাবতীয় বস্তুতে আস্থাশূন্য ছিলেন। সংসার-সংঘাতে তাঁহাদের সে অমূল্য প্রেমের বিন্দুমাত্র হানি হয় নাই; সংসারের কোন বস্তুই এই স্বর্গীয় প্রেম অপেক্ষা তাঁহাদিগের নিকট সমধিক আদর পায় নাই।

একদা কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে স্বামী, প্রিয়তমা ভার্য্যা ও আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্দ্দেশে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। বিরহ-বিধুরা পতি-সোহাগিনী প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রিয়তমের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গৃহের বাহিরে সামান্য শব্দমাত্র শ্রুতিগোচর হইলেই, তাঁহার মনে হইতে লাগিল তাঁহার প্রাণাধিক বুঝি আসিতেছেন। এ বিরহদশা বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না। কিয়ৎকাল এইরূপে কালের অনন্ত অতল গর্ভে ডুবিয়া গেল। সময় যেরূপ কাহারও কাতরোক্তির অপেক্ষা না করিয়া নিজমনে নিজপথে অলক্ষ্যে সবেগে চলিয়া যায়, তেমনি যাইতে লাগিল। সময় যাইতে

লাগিল, আর প্রতিপদে আমাদের সরলার প্রাণে চিন্তা-বিষ ঢালিতে লাগিল। কতক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল। অবশেষে বিচ্ছেদ কাতরা রমণী চিন্তার পাষাণ হাত এড়াইবার বাসনায় কাজে মন ঢালিয়া দিলেন; বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বামী গৃহপ্রত্যাগত হইলে, সুবেশিনী নবভাবে তাঁহার মনোরঞ্জন করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। প্রিয়তমের হৃদয়ক্ষেত্রে নিরন্তর আনন্দের বারি বর্ষণ করা পতিপরায়ণার প্রধান কর্ত্তব্য। তাই বিরহিণী স্বভাব-সুন্দর দেহলতিকা আপনমনে সাজাইতে লাগিলেন।

বেশবিন্যাস সমাধা হইল;—স্বামী আসিলেন না। রমণী কাতরনয়নে গৃহদ্বার পানে চাহিয়া রহিলেন,—সাগ্রহচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন;—স্বামী আসিলেন না। হৃদয় কাঁদিতে লাগিল, নয়ন ঝরিতে লাগিল, চরণ টলিতে লাগিল;—স্বামী আসিলেন না। অবরোধ কারা বোধ হইতে লাগিল, মন-পাখী স্বামীসন্ধানে উড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল; কিন্তু তাহা হয় কৈ? হিন্দুরমণীর একাকিনী বহির্গমন নিষেধ;—নিরুপায়া অসহায়া কামিনী কম্পিত চরণে শূন্য মনে শূন্যগৃহে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আর অশ্রুভারাক্রান্ত আঁখিযুগল তুলিয়া মুহুর্মুহু বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কৈ? অবশেষে ক্লান্তমনে একস্থলে উপবেশন করিলেন; ললাটে সিঁদুর অঙ্কিত করিবার মানসে কৌটা হস্তে লইলেন, সিঁদুর তুলিলেন। সহসা হস্তরোধ হইল, সিন্দুর বিন্দু কপালে উঠিল না। নয়নে অশ্রুবিন্দুরাশি মুক্তার ন্যায় ঝরিতে লাগিল! হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে দু' একটী দীর্ঘশ্বাসের বাতাস বহিতে লাগিল, কি কাতরতা, কি ব্যাকুলতা, হৃদয়ের কি গভীর লুকানো কথা সেই দু' একটী নিঃশ্বাসে! অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিল,—পতি আসিলেন না। পবনবেগে কোথা হইতে কে আসিয়া বলিয়া গেল—

'তাঁহার স্বামী পর্ব্বতবাসী কোন ব্যাঘ্রকবলে নিহত হইয়াছেন, ব্যাঘ্র পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত হইয়াছে।' হাতের সিন্দুর হাতেই রহিল,—অভাগিনীর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।—তিনি মূর্চ্ছাক্রান্তা হইয়া ধরায় পড়িলেন—সোণার শরীর ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল!

মূর্চ্ছাপগম হইল, সংজ্ঞা আসিল। রমণী চেতনা পাইলেন, কিন্তু জ্ঞান হারাইলেন। স্বামি-শোকে জ্ঞান-হারা উন্মাদিনী বায়ুবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন;—নয়নে অনৈসর্গিক স্থির দৃষ্টি, বদনে ঘোর বিষাদ-মেঘ;—আলুলায়িত কুন্তল; শ্লথবাস! হস্তে সিন্দুরের কৌটা তখনও বিরাজ করিতেছে। পাগলিনী পাগলবেশে বাহির হইল, গৃহের পর গৃহ অতিক্রম করিল। উন্মাদিনী ছুটিতে লাগিল, আর এক উৎকণ্ঠিত জনতা তাঁহার পৎশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। যমুনাসৈকতে পর্ব্বততলে রমণী স্থির নিশ্চল হইল; পর্ব্বতমূলে জানু পাতিয়া রুদ্ধহৃদয়ের প্রবল বেগ ছাড়িয়া দিল; বাঁধ-ভাঙ্গা বারিরাশির ন্যায় অশ্রুস্রোত প্রবলবেগে বক্ষ ভাসাইয়া সে স্থল প্লাবিত করিল; হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে দিক্ সমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, গগন বিদীর্ণ হইল; দর্শকমণ্ডলীর নয়ন হইতে অশ্রু তীরবেগে ছুটিল। তৎপরে এক ভীষণ দৃশ্য দেখা দিল। রমণী সেই পাষাণে বারংবার আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল, বারংবার সেই কঠিন পাষাণে মস্তক আঘাত করিতে লাগিল; আর সেই পর্ব্বতের নিকট নিজস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বারংবার কাতরপ্রাণে, করুণ প্রার্থনা করিতে লাগিল;—যেন সেই জড়পদার্থ শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি সম্পন্ন, তাহার গতজীবন স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে সমর্থ! ললাটভেদ করিয়া রক্তস্রোত ছুটিল, তথাপি শান্তি নাই! সে নিরর্থক আত্মবিলাপে, সে প্রলাপ প্রার্থনায়, সে মুহুর্মুহু শিরাঘাতে কোন ফল ফলিল না,—তথাপি বিরাম নাই!

অচল টলিল না, তাহার বিলাপ শুনিল না, তাহার প্রার্থনা রাখিল না। রমণী উঠিল, অচলভাবে দাঁড়াইল ;—আকৃতি, ভীষণ উদাসভাব ব্যঞ্জক, নয়নে যেন বহ্নি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, অযত্নরক্ষিত ঘনকৃষ্ণ অলকমালা পবন-সোহাগে পৃষ্ঠে এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে। রমণী দাঁড়াইল ;—নয়নে অশ্রু নাই ; কমল-কোমল করপুট অঞ্জলি আবদ্ধ, উৎক্ষিপ্ত ; মুখে কথা নাই ; কি যেন একটা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রভা মণ্ডলাকারে তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে! দর্শক-মণ্ডলী অননুভূত-পূর্ব্ববিস্ময়ে নিশ্চল নিস্পন্দ!

কোন সাড়া নাই শব্দ নাই ; সব নিস্তব্ধ! কুলায়ে পাখীগণ কূজন বন্ধ করিয়াছে, পবনতাড়িত দূরস্থ কোন অস্ফুট ধ্বনিও শ্রুত হইতেছে না, কলনিনাদিনী ও অব্যক্ত সঙ্গীত বন্ধ করিয়াছে।

সহসা গগন ভেদ করিয়া সাধ্বীর স্তোত্র বাক্য উত্থিত হইল—"হে তপনদেব! হে ত্রিদিববাসী দেবগণ! আপনারা সাক্ষী থাকুন। যদি আমি সতী সাধ্বী হই, যদি আমার পতিপদে একান্ত মতি থাকে, যদি আমি পতিদেবকে দিবানিশি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকি, যদি কল্পনা বা কাজে কখন কোন পাপ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই নগণ্য ক্ষুদ্র সিন্দুর পাত্র দ্বারা আমি এই কঠিনহৃদয় পাষাণের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া আমার গতপ্রাণ স্বামীধনকে উদ্ধার করিয়া আনিব! সতীর মুখ হইতে এই তেজঃপূর্ণ কথা গুলি নিঃসৃত হইল; কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধতার যবনিকা আবার পতিত হইল। সহসা শ্রুতিভেদী গভীর গর্জ্জন শ্রুত হইল ;—যেন গগনদেশে জীমূতমন্দ্র বজ্র-গম্ভীর নাদ করিতেছে, বা অদূরে একসঙ্গে সহস্র তোপধ্বনি হইতেছে!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়! সতী সিঁদুরকৌটা পর্ব্বতগাত্রে নিক্ষেপ করিবা মাত্র গিরি-হৃদয় দ্বিধা হইয়াগেল!

ক্ষণেক পরে বিস্ময়-বিহ্বল দর্শকনিচয় প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু কি দেখিলেন? সাধ্বীপদপ্রান্তে একটা বিশালাকার ব্যাঘ্র মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে! স্বর্গ হইতে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, অমরসঙ্গীতে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া যাইতেছে! মৃত শার্দ্দূলের ভীষণ কবল হইতে রমণীর প্রাণারাম হৃদয়ের ধন নিষ্ক্রান্ত হইলেন—মুখে স্বর্গীয় হাসি, শরীর অক্ষত!

পুনর্মিলিত দম্পতি হৃদয়ের অদম্য আবেগে পরস্পরকে আলিঙ্গনের দৃঢ়পাশে আবদ্ধ করিলেন—সে আলিঙ্গনের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে ভাষায় উপযুক্ত কথা নাই, অভিধানে প্রয়োজনীয় শব্দ নাই। তৎপরে উভয়ে একত্রে জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে এই অত্যদ্ভুত ব্যাপারের বিধাতা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপিতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

"বৎসে" সমস্ত শব্দ ডুবাইয়া গম্ভীর বাক্যধ্বনি উঠিল "বৎসে! পতির প্রতি তোমার এই প্রগাঢ় অনুরাগে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অদ্যাবধি আমার এই নগ্ন হৃদয়ে তোমার পবিত্র করনিক্ষিপ্ত এই সিঁদুর বিন্দু চিরবিরাজিত থাকিয়া জগতে সাধ্বী রমণীর অমর সাধুকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি—মঙ্গলময় তোমাদের চিরমঙ্গল করুন!" জড়দেহ পাষাণময় ভূধর অধর হইতে কথাগুলি নিঃসৃত হইল! প্রকৃতি আবার নীরবমূর্ত্তি ধারণ করিল।

অদ্যাপি পর্ব্বত শরীরে এই ভগ্নস্থান লক্ষিত হয়। আজিও চারিদিকের হিন্দুমহিলাগণ এই "সিঁদুরে পাহাড়ের" পাদদেশে দলে দলে নানা উপহারে পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন, এবং এই চিরস্মরণীয়া পুণ্য-শ্লোকা সাধ্বীর ন্যায় পতিপ্রেম লাভ করিবার জন্য প্রার্থনাদি করিয়া থাকেন। আজিও অনেক পল্লীর বালক বালিকাগণ রুদ্ধশ্বাসে, একাগ্র মনে বয়োবৃদ্ধদিগের নিকট এই অদ্ভুত কাহিনী আনন্দচিত্তে শ্রবণ

করিয়া থাকে। শত সহস্রবার এই কথা কথিত হইতেছে, তথাপি ইহা পুরাণ হয় নাই। এই কাহিনী শ্রবণে পুরাণবর্ণিত সাধ্বী রমণী-শিরোমণি সাবিত্রী দেবীর যমপুরী হইতে মৃত স্বামীর জীবন আনয়নের বৃত্তান্ত কি স্বতই মনে জাগিয়া উঠে না?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ধর মজুমদার।

ভিকটার হিউগো হইতে।

বনে সুপ্ত দীর্ঘিকায় মানবের (ও) মনে
দুটি বস্তু এক (ই) কালে পড়ে যে নয়নে
নীরব—নিথর জলে ছায়ায় প্রকাশ
মেঘ আর রৌদ্র মাখা বিস্তীর্ণ আকাশ
আর সেই জলাধার গভীর—আঁধার
চলে ফেরে সরীসৃপ তলে তলে যার।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

অভিমান।

তোমার করুণদৃষ্টি রয়েছে যখন
কেন নাথ তবু পাপে ভরি' উঠে মন?
উজ্জ্বল আলোক যেথা জ্বলে সর্ব্বক্ষণ
সেথায় কি আশীবিষ করে বিচরণ?

শ্রীঃ—

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ১৩১০। { ৩য় সংখ্যা।

হেমচন্দ্র।

কোন জাতির জাতীয় জীবনের অন্তর্গত কালবিশেষের প্রবল হৃদয়-ভাব যাঁহার রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়, তিনিই সেই জাতির তাৎকালিক জাতীয় কবি। এই হিসাবে হেমচন্দ্র বাঙলার উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় কবি।

পাঁচশত বৎসরের মুসলমান রাজত্বে জাতীয় জীবন মৃতপ্রায় ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। জীবনের লক্ষণ একে একে নির্ব্বাপিত হইতেছিল। নিদারুণ নৈতিক অবনতি ও পঙ্কিল-বিলাসিতার দারুণ পূতিগন্ধ চতুর্দ্দিকে সামাজিক জীবনহীনতার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। সেই সময়ের জাতীয় কবি ভারতচন্দ্রের রচনা তাহার প্রমাণ।

এমন সময়ে ইংরাজের সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবের প্রবল বন্যা আসিয়া মৃতপ্রায় সমাজকে আহত করিল। এই বিপরীত শক্তির আঘাতে অব-সন্ন-নিদ্রামগ্ন-জাতি যেন সচকিতে জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া উঠিবামাত্র অবসাদের অন্তরালে সুপ্তিমগ্ন-স্বাধীনতা-লালসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং সহসা সুপ্তোত্থিত পরাধীন জাতি কতকটা নিদ্রাঘোরেই দেশ-কাল-পাত্র

ভুলিয়া, "স্বাধীনতা" "স্বাধীনতা" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল। প্রতিভা-শালী জাতীয় কবি জাতীয় ভাব অবলম্বন করিয়া গান ধরিলেন—

"আর ঘুমাও না, দেখ চক্ষু মেলি ;
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানব জাতিরে লয়ে।"

বহুদিনের অবসাদ ও জড়ত্বের পরে উদ্দীপনার দীপক রাগিণী বাঙ্‌লা দেশে বিঘোষিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এ উদ্দীপনা-উত্তেজনা স্থায়ী হইল না। কোন নদীর স্রোতে উপনদীর জল সম্মিলনের ন্যায়, রাশীকৃত বুদ্বুদ ও ঘূর্ণাবর্ত্তের উৎপত্তি করিয়াই এই আন্দোলন-আলোড়ন নির্ব্বাপিত হইল। কিছুকাল রাশি রাশি "ভারত উদ্ধার" ও "ভারত সঙ্গীত" রচিত হওয়ার পরেই সব ধীর, স্থির, শান্ত হইয়া গেল।

কবির দুর্ভাগ্য—কবি সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা কিছু উন্নত চরিত্র। কবির হৃদয়-বৃত্তি প্রবলতর, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর, স্বদেশহিতৈষিতা বলবতী।

সুতরাং কবি এই অপদার্থ জনতার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণে উত্তেজিত, ক্ষণে অবসাদবিমগ্ন হইতে পারিলেন না। তাঁহার করুণ বীণা-ধ্বনি এই সুপ্তি-সুখ-রত স্বদেশবাসীকে জাগাইবার জন্য, নানা বিচিত্র সুরে অবিরাম নিনাদিত হইতে লাগিল। কবি কখনও ধিক্কার দিয়া গাহিলেন—

"হয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি!
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!—
আর কি ভারত সজীব আছে ?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে!"

কখনো আমাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া, আমাদের উত্তেজিত করিবার জন্য ভারতমাতার মুখ দিয়া বলাইলেন—

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে
জগত ব্রহ্মাণ্ডে নখর দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে ;
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অচল
নক্ষত্র অর্ণব আকাশমণ্ডল—
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে ;
যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
জগতের দুঃখ সুকপিলবস্তু
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্য,
তখন (ও) তাহারা ঘৃণিত নহে ;"

কখনো আমাদের লজ্জিত করিবার জন্য আমাদের নিদারুণ অবনতির ঘৃণিত চরিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন—

"যে ভাব-পরশে মানবের মন
বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ,
করে তেজোজালে পৃথিবী দাহন,
মৃত্যুর মূরতি বিস্মরি ;—
না পরশে কভু তাদের পরাণ ;
জীবন কাটায় করি মধুপান ;
নারীগত মান—নারীগত প্রাণ—
নারী-পায়ে ধরা চাকরি !"

কিন্তু এই অবসন্ন জাতির বীরত্ব-বহ্নি আর জ্বলিল না। বীরত্ব-বহ্নি না জ্বলুক, পাশ্চাত্য সংঘর্ষের ফলে জাতীয় জীবনে যে সজীবতা আসিয়াছিল, তাহা একেবারে বিনষ্ট হইল না। জাতীয় উৎসাহ "ভারত উদ্ধারের" পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চালিত হইল। স্বনামধন্য মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পথের অগ্রণী হইলেন। বাঙালী বুঝিল সামাজিক সংস্কার ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব।

জাতীয় প্রকৃতির এই ভাবান্তর কবির তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না—কবির বীণা নবতর সুরে বাজিয়া উঠিল। "ভারতকামিনী", "কুলীন মহিলা বিলাপ", "বিধবা রমণী"—জাতীয় জীবনের এই ভাবান্তর প্রকটিত করিল।

হেমচন্দ্রের কবিজীবনে যে যে প্রবল ভাব বাঙালী জাতির হৃদয়কে বিচলিত করিয়াছে, সমস্তই কবির মধুর কবিতায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাৎকালিক কোন স্মরণীয় ঘটনাই কবির অমর লেখনীস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

"স্বায়ত্তশাসন", "ইলবার্ট বিল" "বকুলতলার ব্যাপার", "ভারত মহিলার উপাধি লাভ", ১২৮০সালের দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কিছুই কবির লেখনী অতিক্রম করে নাই।

জাতীয় কবির যাহা কর্ত্তব্য হেমচন্দ্র তাহার কিছুই ত্রুটি করেন নাই। বাঙালীর অপরিণত হৃদয়ভাব পরিস্ফুট করিয়া, তাহাদের জীবন গঠন কার্য্যে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

কিন্তু জাতীয় কবির একটা অপরূপ দুর্ভাগ্য আছে। জাতীয় কবি যতক্ষণ জাতীয় ভাবের পরিপোষক কবিতা রচনা করিয়া জাতীয় জীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করেন, ততক্ষণই তাঁহার সমাদর থাকে। যেদিন তিনি জাতীয় ভাবের অনুসরণ করিতে বিরত হন, সেই দিন হইতেই তাঁহার যশঃসূর্য্য অস্তাচলাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন।

হেমচন্দ্রের অদৃষ্টেও এই কঠোর সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। হেমচন্দ্র নানাকারণে কিছুকাল হইতে জাতীয়ভাবের অনুসরণ করিতে বিরত ছিলেন ; সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বেই লোকে তাঁহাকে ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—সেই কারণেই হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে তেমন কোন প্রবল আন্দোলন বাঙ্‌লা দেশে স্থান পাইল না। এখন জাতীয় ভাব অন্য পথে গিয়াছে। বাঙালী বুঝিতেছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত তাহার উন্নতি স্থায়ী হইবে না ; সেজন্য এক্ষণে বাঙালীর উৎসাহ-স্রোত ক্রমশঃ "ভারত উদ্ধার" ও "সমাজ সংস্কারের" পথ ছাড়িয়া ধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। বর্ত্তমান জাতীয় কবি নবীনচন্দ্রের কবিতায় এই ভাব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে ; কাজেই হেমচন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব্বে জাতীয় ভাব হইতে কিছু দূরে পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ হেমচন্দ্র কেবলমাত্র জাতীয় কবি নহেন। তাঁহার কবিতার মধ্যে মহাকবির নিত্য নবীন কবিতার বহু উপকরণ সন্নিবিষ্ট আছে।

লোকে তাঁহার "দেশালাইয়ের স্তব" "বাজিমাৎ" বিস্মৃত হইতে পারে ; কিন্তু মধুর ওজস্বী ছন্দে রচিত বিপুল কল্পনা ও প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার

লীলাক্ষেত্র "দশমহাবিদ্যা" বা সৌন্দর্য্য ও বীরত্বের অপূর্ব্ব সমাবেশ রুদ্র-পীড়, অথবা কামিনীর সুমধুর স্নিগ্ধ কোমল গুণাবলীর প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপা ইন্দুবালার সুকুমার মুখখানি বা ইন্দ্রানীর মহিমামণ্ডিত মহামহীয়সী সম্রাজ্ঞী মূর্ত্তি বিস্মৃত হইতে পারিবে না। তাঁহার দধীচির তনুত্যাগ চিরকাল বাঙালীকে স্বার্থ বিসর্জ্জন শিক্ষা দিবে—তাঁহার নন্দনকানন ও বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালা বাঙালীর কল্পনাকে পরিতৃপ্ত ও স্তম্ভিত করিয়া রাখিবে।

আর এক প্রধান গুণ, যাহাতে কবিকে অমর করিয়া রাখে, তাহাও হেমচন্দ্রের ছিল। হেমচন্দ্রের কবিতার একটা নিজত্ব—একটা বিশেষত্ব আছে। হেমচন্দ্র কাহারও অনুকরণ করেন নাই,—তিনি বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে এক নূতন পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতায় যে ওজস্বিতা ও তেজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার নিজস্ব।

মধুসূদন বাঙলা কবিতায় বীরত্ব-স্রোত প্রবাহিত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে বাছিয়া বাছিয়া অভিধান হইতে কঠোর দুরুচ্চার্য্য শব্দাবলী আহরণ করিতে হইয়াছিল। হেমচন্দ্র অতি সহজ ভাষায় বিনাড়ম্বরে যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, তাহার বেগ ও তীব্রতা মধুসূদনের কবিতার ওজস্বিতা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত" পড়িতে পড়িতে ক্ষণকালের জন্যও রোমাঞ্চিত কলেবর ও উৎসাহ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠে না, এমন অবসাদমগ্ন কেহ আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

এই ওজস্বিতা শুদ্ধ "ভারতসঙ্গীতে" নহে, হেমচন্দ্রের কবিতায় সর্ব্বত্র পরিস্ফুট।

হেমচন্দ্রের কবিতার আর এক বিশেষত্ব তাঁহার প্রদীপ্ত কল্পনা। কি অন্ধকারময় তরঙ্গ-বিক্ষোভিত পাতালপুর, কি সকল সৌন্দর্য্যের

আধারভূমি অমরনিষেবিত নন্দনকানন, কি আলোক-তরঙ্গিত শান্তিময় ব্রহ্মালোক, কি ধূমবাষ্প কোলাহলময় বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালা সর্ব্বত্রই তাঁহার কল্পনার প্রদীপ্ত আলোকে আলোকিত।

তাঁহার বিশ্বগ্রাসী কল্পনায় অভ্রভেদী হিমাচল সদৃশ যে সকল প্রকাণ্ড মহাভাব নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে করিতে হৃদয় স্তম্ভিত ও লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

"পন্নগ সুভীষণ ফণা প্রসারণ
রক্ত জলধিদেহ লেহি লেহি চলিছে,
কূর্ম্ম কমঠীকুট উর্ম্মিতে লটপট
লোহিত তৃষাতুর সংপুট খুলিছে।

পড়িতে পড়িতে শরীর শিহরিয়া উঠে।

এই জ্বালাময়ী ওজস্বিতা—এই কল্পনার বিপুল ঐশ্বর্য্য হেমচন্দ্রের আপনার। ইহার তুলনা বাঙলার অন্য কোন কবির কাব্যে নাই; সুতরাং এপথে হেমচন্দ্র অদ্বিতীয়। হেমচন্দ্রের এই সকল অনন্যসাধারণ গুণাবলী চিরদিন তাঁহাকে বঙ্গদেশে অমর করিয়া রাখিবে এবং এক শ্রেণীর কবিসম্প্রদায় চিরদিন তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করত তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই। হেমচন্দ্রের স্থান নির্ণয়ের এখনো সময় হয় নাই। যখন সে স্থান নির্ণীত হইবে, তখন যে তাহা সাধারণ কবি-সিংহাসনের বহুউর্দ্ধে স্থাপিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ দেখি না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

পণ্ডিতের অপমৃত্যু।

প্রায় ছাব্বিশ শত বৎসর পূর্ব্বে আইয়োনিয়ান (গ্রীস) দেশে সক্রেটিশের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। বাগ্মীতায়, বুদ্ধিতে, পাণ্ডিত্যে এবং লিপি-চতুরতায় তৎকালে তাঁহার মত লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই ছিল। তিনি বলিতে, বুঝিতে ও বুঝাইতে যেমন পটু ছিলেন; লিখিতে এবং লিখনের দ্বারা লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে, তেমনি অসাধারণরূপে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। সক্রেটিশ যেমন পারদর্শী কথক ছিলেন, তেমনি সুদক্ষ পাঠক ছিলেন। তিনি নিজে একজন কাব্যকার ছিলেন না; কিন্তু অপরের কবিতা সমূহ এরূপ আশ্চর্য্য পটুতার সহিত আবৃত্তি করিতে পারিতেন যে, তাহা শ্রবণ করিলে বোধ হইত কবি স্বয়ং যেন সেগুলি আওড়াইয়া নিজের মনের ভাব অভিব্যক্ত করিতেছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, সময়নীতি, ধর্ম্মনীতি, বাগ্মীতা, দর্শন, আধ্যাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বাস্তবিক গ্রীস দেশে তখন তাঁহার মত আর দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিল না। পলাতুশ (Plato), জিনোফন, জম্‌দেন্ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতেরা তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

সক্রেটিশের পিতা চিত্রকরের কার্য্য করিতেন,—জননী একজন প্রসিদ্ধা ধাত্রী (midwife) ছিলেন। চিত্রকরের হৃদয়-সাগর মধ্যে সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের যে প্রবল উদ্বেল উঠিত, যুবক সক্রেটিশের মনে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, এইজন্য প্রকৃতিপুঞ্জের অপূর্ব্ব সুন্দরতা দর্শন করিয়া সক্রেটিশ প্রায়ই বিমুগ্ধ থাকিতেন। জননীর শরীরতত্ত্ব বিদ্যার জ্ঞানে তাঁহার চিত্তও বিশিষ্টরূপে আলোকিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ পণ্ডিতপ্রবর সক্রেটিশ বিবিধ গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। কিন্তু একবিন্দু গোমূত্রের স্পর্শে যেমন এক কটাহ দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায় অথবা একবিন্দু

হলাহলের সংযোগে যেমন সমুদয় সুভোজ্য দ্রব্যাদি বিষাক্ত হয়, তেমনি বহুগুণ-সমন্বিত সক্রেটিশের একটিমাত্র দোষে তাঁহার অতুলনীয় গুণরাশি প্রকীর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। মেঘাবৃত-সূর্য্য কিম্বা ভস্মাচ্ছাদিত-বহ্নি যেমন রৌদ্র বা উত্তাপ প্রকাশ করিতে পারে না, অথবা হেমন্তের নিশির শিশির কর্ত্তৃক অভিসিক্ত সর্প-শিশু যেমন অবসাদগ্রস্ত হইয়া স্বকীয় প্রভাব প্রকাশে পারক হয় না, তেমনি সক্রেটিশের একটি মহাদোষে তাঁহার গুণরাশি প্রকৃষ্টরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে নাই; ঐ মহাদোষের নাম—অপ্রিয়বাদিতা। "সদাসত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ" এই মহাপ্রাচীন এবং মহাসারগর্ভ-নীতির তিনি সুন্দররূপে অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই,—সত্য এবং প্রিয়ভাষণ এই দুইটি মহাগুণ তাঁহাতে একাধারে সম্মিলিত হইতে পারে নাই। তিনি যেমন হঠকারী ছিলেন, তেমনি অপ্রিয়বাদী বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার তর্ক-শক্তি বা বিচার-শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, এ কথা সত্য; কিন্তু প্রিয়ভাষণ ভিন্ন সদুপদেশ কিম্বা সদ্বুদ্ধিসঞ্জাত-যুক্তি বা তর্ক যে পরিণামে স্থায়ী সুফল প্রদানে সমর্থ হয় না, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পাঠকেরা দেখিয়া থাকিবেন, ময়ূরের আকৃতি কেমন সুন্দর, তাহার শরীরস্থিত বিচিত্র বর্ণ সমূহের অঙ্কন কি মনোহর, তাহার পুচ্ছের গঠন ও চিত্রন কতদূর সুন্দর হইতে সুন্দরতর, কিন্তু ময়ূর এতাদৃশ সৌন্দর্য্যশালী হইয়াও, অপ্রিয় ও কর্কশ কণ্ঠস্বরে দর্শক ও শ্রোতার বিরক্তি উৎপাদন করিয়া তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয়! গ্রীসীয় পণ্ডিত সক্রেটিশেরও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল।

সক্রেটিশের সাংসারিক বুদ্ধি খুব কম ছিল। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থগত বিদ্যা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবলভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কে একাধারে তিনি একত্রিত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। বৈরাগ্য ও সংসারোপকার উভয়দিকেই

তাঁহার প্রখরা দৃষ্টি ছিল বটে; কিন্তু তিনি তত্ত্বদর্শী হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারেন নাই। সংসারে সংসারী পুরুষের সহিত কেমনে জীবন কাটাইতে হয়, এই কঠিন বিদ্যায় তাঁহার অধিকার খুব কম ছিল। এইজন্য তিনি কথায় কথায় অপ্রিয়বাদিতার পরিচয় দিয়া লোকের মনোমধ্যে বিরক্তির উৎপাদন করিতেন,—সত্যের প্রচার করিয়াও—নিষ্কামভাবে কার্য্য করিয়াও তিনি জীবিত কালে যশস্বী হইতে পারেন নাই, অথবা লোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কাহার সহিত কেমনে কথা কহিতে হয়, তিনি তাহাও ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই; তজ্জন্য তাঁহার সহধর্ম্মিনীর সহিত তাঁহার কখনই সদ্ভাব ছিল না। এত বড় দেশমান্য পণ্ডিতের পক্ষে এ দোষ অবশ্য মহাদোষ—অমার্জ্জনীয় দোষ বলিয়া গণ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি। কাজেই সক্রেটিশের শত্রু-সংখ্যা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ঐ সময়ে গ্রীসদেশে চামড়ার ব্যবসা করিয়া একজন লোক মহাধনী হইয়া উঠিয়াছিল। সংসারে ধনবানের সর্ব্বত্রই প্রভুত্ব; সুতরাং বহুসংখ্যক লোক এই ধনী পুরুষের বশীভূত ছিল। ইহার পুত্র সক্রেটিশের নিকট আগমন করিয়া সদুপদেশ শ্রবণ করিত; সক্রেটিশ ইহাকে চামড়ার ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া কেবল গ্রন্থ পাঠ ও জ্ঞানচর্চ্চায় পরামর্শ দিয়াছিলেন। বালকের ব্যবসার দিকে অমনোযোগিতা দর্শন করিয়া ধনী পুরুষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন, "সক্রেটিশ তাহার পুত্রের মাথা খাইয়াছে। তাহার পুত্র ঐ পণ্ডিতের পরামর্শ মতে কার্য্য করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।" ধনবান ব্যক্তি সক্রেটিশের প্রবল বৈরীরূপে দর্শন দিলেন। ক্রমে ক্রমে যাহারা পণ্ডিতের উপরে বিরক্ত ছিল, তাহারা অগ্রসর হইয়া সক্রেটিশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। সক্রেটিশ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু সকল বিষয়েরই যেমন একটা সীমা থাকে, শিক্ষারও তেমনি একটা সীমা আছে। সক্রেটিশ সেই সীমার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া,

স্ত্রীলোকদিগকে এমন শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, মেয়েছেলেরা গার্হস্থ্য কর্ম্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল পুঁথি লইয়াই দিবানিশি ব্যাপৃতা থাকিতে লাগিল। এদিকে দেশ ও সমাজপ্রচলিত কতকগুলি প্রাচীন প্রথার কটুভাষায় প্রতিবাদ করিয়া, তিনি প্রায় দেশশুদ্ধ লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। সহরের লোকেরা তাঁহার নামে নিম্নলিখিত অভিযোগ সমূহ উপস্থিত করিল—

১ম। সক্রেটিশ দেবতাদ্বেষী।

২য়। সক্রেটিশ দেবালয়ের বৈরী।

৩য়। সক্রেটিশ গ্রীকদিগের পুরাতন দেবতার পরিবর্ত্তে নূতন দেবতার সৃষ্টি করিতে প্রস্তুত।

৪র্থ। তিনি যুবকদিগকে প্রথম পরামর্শ দেন, যাহাতে তাহারা পৈত্রিক ব্যবসা বা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল দিবা-রাত্রি পুঁথি লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

৫ম। সক্রেটিশের উপদেশে অনেকে বিবাহ করে না। ইহাতে লোক সংখ্যা এবং প্রধান প্রধান প্রাচীন বংশ লোপ পাইবে।

৬ষ্ঠ। সক্রেটিশ স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করিয়া গার্হস্থ্য অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখনকার গ্রীসদেশীয় আইন মতে ঐ সকল অভিযোগের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইত। রাজা "আর্চ্চন" সক্রেটিশের বিচার করেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ সমূহের অতিরিক্ত আর একটি নূতন অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা এই :—

"সক্রেটিশ বলিয়া থাকেন, পৃথিবীতে আমার অপেক্ষা আর বড় পণ্ডিত নাই। এই অহঙ্কারের জন্য সক্রেটিশ দণ্ডার্হ।"

বিচারের সময়ে, সক্রেটিশ বলিয়াছিলেন—"আমি সত্যই বলিতেছি, এ সময়ে পৃথিবী মধ্যে আমার তুল্য আর পণ্ডিত নাই। যদি এ কথায়

বিশ্বাস না হয়, সমুদয় পণ্ডিতকে একত্রিত করিয়া তাহাদের পার্শ্বে আমাকে বসাইয়া দাও, আমি তাহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়া দিব।" এত বড় পণ্ডিতের পক্ষে এরূপ অহঙ্কার নিশ্চয়ই নিন্দার বিষয় সন্দেহ নাই।

যাহা হউক ৫৫৭জন নগরবাসী একত্রিত হইয়া জুরীর কার্য্য করেন। মিলিটশ্ নামে বক্তা ও সুপণ্ডিত পুরুষ সক্রেটিশের বিরোধী পক্ষের উকিল ছিলেন। ২৭৬ জন জুরর তাঁহাকে নির্দ্দোষী এবং ২৮১ জন তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্থ করিয়াছিলেন। সে সময়ে গ্রীসদেশে এরূপ আইন ছিল যে, আসামীকে দণ্ডিত করিবার পূর্ব্বে আসামী কোন্ প্রকার দণ্ড পছন্দ করে, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইত। সক্রেটিশের সম্মুখে এবম্প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি দ্বাদশ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড দিতে পারি।" কিন্তু জুররগণ তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। বিচারপতি রাজা অবশেষে পণ্ডিতের প্রাণদণ্ডের ঘোষণা করেন। "দিলিয়ান" (Delian festival) নামক মহাপ্রসিদ্ধ গ্রীসীয় উৎসবের সময়ে কাহারও প্রাণদণ্ড হইবার নিয়ম ছিল না; ঘটনাক্রমে ঐ উৎসব উপস্থিত হওয়ায়, একমাস কাল পর্য্যন্ত সক্রেটিশকে কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। একমাস পরে ৮৪ বৎসর বয়ক্রমে এক প্রকার বিষাক্ত বনস্পতির রস প্রয়োগে সক্রেটিশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। সে সময়ে "হেম্লক্" নামক লতা বিশেষের মহাবিষাক্ত রস খাইতে দিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত আসামীর দেহ হইতে প্রাণবায়ু নির্গত করা হইত।

এইরূপে গ্রীসের জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর সক্রেটিশের অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল। তিনি যদি প্রিয়ভাষী এবং সদালাপী হইতেন—তিনি যদি সত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়বাদিতা অভ্যাস করিতেন—তিনি যদি তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধিকে কার্য্যক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় ব্যবহার করিতে শিক্ষা

করিতেন—তিনি যদি বিষয় বিশেষের নির্দ্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করিয়া হঠকারিতা না দেখাইতেন এবং "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং" এই মহানীতির অনুসরণ করিয়া বিনয় ও সহিষ্ণুতা দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে এত বড় পণ্ডিত হইয়া অকারণে অপমৃত্যুর কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইতেন, ইহা নিশ্চয়।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

অশোকবনে সীতা।

অশোকের পুষ্পসম্ভার যেন পৃথিবী স্পর্শ করিবার জন্য শাখাগ্র হইতে অবনমিত হইয়া আছে,—অবিদূরে সহস্রস্তম্ভ-চৈত্যপ্রাসাদ পাণ্ডুর কৈলাসগিরির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; সেখানে নাগ, চম্পক, সপ্তপর্ণ ও উদ্দালক কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধবহকে আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে। এই অশোক বনিকায় রাবণ সীতাদেবীর আবাস নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিল। ত্রিকূটের উর্দ্ধে শোভাময়ী লঙ্কাপুরীর বর্ণনা, কবিগুরুর সমৃদ্ধ লেখনীতে আলেখ্যের ন্যায় সুন্দর হইয়া সুন্দরকাণ্ডের মুখবন্ধকে চির উপাদেয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সেই সাধু-পুষ্পিত স্বর্ণ-রজত কক্ষপূর্ণ বিলাস-নিকেতনে সীতাকে বাস করিতে হয় নাই,—যে পর্য্যন্ত সীতা রাবণকে প্রত্যাখান করিবেন, সে পর্য্যন্ত ভীমা রাক্ষসীবৃন্দ-পরিবৃতা হইয়া, তিনি অশোকবনের পাদপ-চ্ছায়ায় বাস করিবেন, ইহাই তাঁহার দণ্ড। চিরাদরণীয়া সুন্দরী সীতার সঙ্গিনীগণ ভয়াবহ স্বপ্নের ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের কেহ একাক্ষী, কেহ এককর্ণা, কেহ ধ্বান্তকেশী, কেহ কেশকম্বলধারিণী, কেহ লম্বোষ্ঠী, কেহ বা চিবুকোষ্ঠী, কেহ বা লম্বোদরী। ইহারা যেন অন্ধকারময়ী রজনীর গুপ্তচর, সীতার পার্শ্বে ঘুরিয়া তাঁহার ভীতি সম্পাদন করিতে অদৃষ্ট

কর্ত্তৃক নিযুক্ত। অপরদিকে স্বর্ণসৌধ-কিরীটিণী লঙ্কা—সমস্ত কাম্য ও বিলাসোপযোগী দ্রব্যভাণ্ডার। সীতা রাবণের প্রতি প্রীতা হইলেই সেই সমস্তের অধিকারিণী হইবেন. সঙ্গিনীগণের মুখে বারংবার এই কথা শুনিতেছেন। রাম দুস্তর-সমুদ্র পার হইয়া কিরূপে লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইবেন? যে রাবণের ভয়ে বায়ু শঙ্কিত হইয়া প্রবাহিত হয়—তীব্রাংশু ও শিশিরাংশু ভয়ে আকাশ হইতে পতিত হয়, রাবণের উপস্থিতি অনুভবমাত্র ভয়ে তরু-পত্র নিষ্কম্প হয় এবং নদী-স্রোত স্তিমিতগতি ও আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, সেই রাবণের করতল হইতে শত যোজন সমুদ্রের অপরপারস্থিতা সীতাকে জটাচীরধারী একমাত্র ভ্রাতৃ সহায় রামচন্দ্র কিরূপে পুনঃ লাভ করিতে পারিবেন? এই নিরাশার মধ্যে সতীত্বের পরীক্ষা চলিতেছে। রাবণের প্রতি অনুরাগ জানাইবামাত্র, ইতস্ততঃ আহৃত ষোড়শ শত সুন্দরী সীতার পাদ সম্বাহন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবেন এবং রাবণ তাঁহাকে "মমাগ্র মহিষী ভব" বলিয়া বরণ করিয়া লইবেন—কি উৎকট পরীক্ষা ও জীবনের কি বিষম সন্ধি স্থল! বিনতানাম্নী নির্ণতোদরী রাক্ষসী আসিয়া সীতাকে বলিতেছে—"রাবণং ভজ ভর্ত্তারম্"—যদি স্বীকৃত না হও, তবে "সর্ব্বাস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামহে।" বিকটানাম্নী লম্বমানপয়োধরা রাক্ষসী মুষ্টি দেখাইয়া সীতাকে বলিতেছে—"ন ত্বাং শক্তঃ পরিত্রাতুমপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।" সুতরাং হে মদিরেক্ষণে! রাক্ষস-রাজসহ রম্য পার্ব্বত্য উপবনরাজিতে বিচরণ করিয়া যৌবন সার্থক কর। যদি স্বীকৃতা না হও, তবে—"উৎপাট্য বা তে হৃদয়ং ভক্ষয়িষ্যামি মৈথিলি।" তৎপর চণ্ডোদরীনাম্নী রাক্ষসী মহৎ শূল ভ্রামণ করাইয়া বলিতেছে—"এই ত্রাসোৎকম্পপয়োধরা হরিণশাবাক্ষী রমণীকে দেখিয়া আমার বড় লোভ হইতেছে, ইহার যকৃৎ, প্লীহা, ক্রোড় ও হৃদয় "খাদয়েমিতি মে মাতঃ।" সমভাবিনী প্রঘসানাম্নী রাক্ষসী এই ইচ্ছা অতিবিহিত বলিয়া স্বীকার করিল। তৎপর অজামুখীনাম্নী রাক্ষসী বলিল—

"বিবাদে প্রয়োজন নাই, আমরা ইহাকে সমভাগে বিভক্ত করিয়া খাইব; কিন্তু পানীয় (মদ্য) ভিন্ন এই সুললিত মাংসের স্বাদ ভাল করিয়া পাওয়া যাইবে না।" শূর্পণখানাম্নী অপর এক রাক্ষসী বলিল—"এই প্রস্তাব আমার নিকট অতি সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে "সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রং সর্ব্বশোক বিনাশিনী।"—আমরা অদ্য মনুষ্য-মাংসের স্বাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হই। বাল্মীকি উপসংহারে লিখিলেন—"বিরূপা রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক এই ভাবে নির্ভৎস্যমানা সীতা ধৈর্য্যহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য রোদিতি।"

এই ছায়াময় নারকীয় পরিবার-পরিবৃতা লুপ্তসংজ্ঞা দীনা জনকদুহিতা চরিত্রের দৃঢ়তায় জগতের চির পূজনীয়া। রাবণ এই অশোকবনে আসিয়া বারংবার তাঁহাকে ভীতা ও প্রলুব্ধা করিতে চেষ্টা পাইতেছে; কিন্তু মৃতকল্পা সীতা সিংহিনীর ন্যায় তেজস্বিনী—তিনি বলিতেছেন—"দ্বিজাতি-মন্ত্র-সম্পূতা স্রগ্‌ভাণ্ডমণ্ডিতা যজ্ঞ-মধ্যস্থা বেদী চণ্ডাল কি সাহসে দলন করিতে অগ্রসর হইতেছে? আমি মহোদধি তুল্য অক্ষোভ্য এবং মহাগিরি তুল্য অকম্প্য পুরুষশ্রেষ্ঠের অনুব্রতা, পাপী রাক্ষসের কি সাধ্য আমাকে স্পর্শ করে?" তারপর নিজের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—"ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং বন্ধ বা ঘাতয়স্ব বা,—নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবতং বা পি রাক্ষস।" রমণীর অকুতোভয় দৃঢ়তার এইরূপ দৃশ্য এমন ভুবনবিজয়িনী ভাষায় আর কোন কবি লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

হনুমান অশোকবনে সীতাকে যে অবস্থায় দেখিলেন, তাহা কারুণ্যের একখানি মূর্ত্তিমতী ছবি। তাঁহার সুতনু ভূতলে সমাসীন; যিনি শ্রীঅঙ্গে অলংকার পরিলে সমস্ত শিল্পীর শ্রম সার্থক হয়, তিনি অলংকারহীনা; যিনি চিরসুখোচিতা, তিনি চির দুঃখ-সন্তপ্তা,—"সুখার্হা দুঃখসন্তপ্তা, মণ্ডনার্হা অমণ্ডিতা।" তাঁহার শোক-পাণ্ডুর মূর্ত্তিখানি শুক্ল-

পক্ষীয় চন্দ্রলেখার ন্যায়; অতুলনীয়শ্রী ধূমগ্রস্ত-বহ্নি-শিখার মত প্রচ্ছন্ন। কখনও অশোকের শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতেছেন, তাঁহার পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় মুখখানির এবং শুভ্র চারুবৃত্ত পয়োধরের প্রভায় সমস্ত দিক তিমির শূন্য হইতেছে, কৃষ্ণ বক্রাক্ষি পক্ষে অশ্রুবিন্দু মুক্তার ন্যায় সংলগ্ন রহিয়াছে, নক্ষত্ররাজের প্রভা যেন কালমেঘে বিজড়িত হইয়া পড়িতেছে। প্রিয়জন কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না—কেবল রাক্ষসীদিগকে দেখিতে পাইতেছেন, হরিণীর মত ইতস্ততঃ ভয়াতুর-দৃষ্টি প্রক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহার অনশন-কৃশ-দেহযষ্টির পশ্চাতে লম্বমান বেণী শোভা পাইতেছে, পদ্মপলাশাক্ষী একখানি মাত্র পীতবস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সেই ঈষৎ প্রচ্ছন্ন ঈষৎ প্রকাশিত রূপ-প্রভা জগতের ইষ্টকারিণী। সন্দিগ্ধের স্মৃতি এবং পাপীর নির্ম্মল বুদ্ধি যেরূপ সহসা উদয় হয়; কিন্তু বিকাশ পায় না,—পঙ্কদিগ্ধা পদ্মিনী যেরূপ বিকাশ পায় অথচ পায় না, (পদ্মিনী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ) নীলকণ্ঠী বিম্বোষ্ঠী সীতার সৌন্দর্য্য সেইরূপ, তদ্ভাতি মলিনা অথচ প্রকাশমানা।

এই নিরাশাময়ী যখন দুর্বৃত্তা রাক্ষসীগণের উৎপীড়নে দুঃখের প্রান্ত-সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন শিংশপাবৃক্ষের শাখাগ্রে সহসা "রাম" নাম ধ্বনিত হইল,

ততঃ সা বক্রকেশান্তা সুকেশী কেশসংবৃতাম্।
উন্নম্য বদনং ভীরুঃ শিংশপামন্ববৈক্ষত॥"

সুকেশীর বক্রান্ত-কেশদাম-সুন্দর মুখখানি আবৃত করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তিনি সেই সুন্দর মুখখানি উন্নত করিয়া শিংশপাবৃক্ষের ঊর্দ্ধ ভাগে দৃষ্টি করিলেন,—রাম নাম শুনিয়া এই বিষম বিপৎকালে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে পদ্মদল-ক্ষরিত সলিলবিন্দুর ন্যায়, অজস্র অশ্রু পতিত হইতে লাগিল।

এই অবস্থায় হনুমান নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—"হে পদ্মপলশাক্ষি কৌশেয়বাসিনি অনিন্দিতরূপময়ি! দ্রুম-শাখা অবলম্বন করিয়া নৈরাশ্যের জীবন্ত-মূর্ত্তির ন্যায় তুমি কে?"—সহসা সীতা বানরের কণ্ঠে চিরইপ্সিত মধুর রাম-কথা শুনিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন—"এ কি আমার চিত্ত-মোহ,—দিবা-স্বপ্ন, না মৃগতৃষ্ণিকা? হে বানর নদী-স্রোত যেরূপ নদী-কূল হরণ করে, তোমার কথা তদ্রূপ আমার চিত্ত হরণ করিতেছে।" কিন্তু এই বানর-বেশধারী ত ছদ্মবেশী রাক্ষস-রাজ নহে? পরিব্রাজক-রূপ ধরিয়া যে পাপী তাঁহার নিকট প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল, এ ত তাহারই বেশান্তর নহে? এই সন্দেহ হওয়া মাত্র সীতার মুখখানি শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি অশোকের শাখা ছাড়িয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন, হনুমান প্রণাম করিল; কিন্তু ইন্দীবরেক্ষণা তাহার দিকে চাহিতে সাহসী হইলেন না।

হনুমানের রাম-নাম কীর্ত্তনে সীতার সন্দেহ নিরাকৃত হইল, তাহার নিকট অভিজ্ঞান স্বরূপ রাম-নামাঙ্কিত অঙ্গুরী পাইয়া সীতা যেন রামকে ফিরিয়া পাইলেন। "গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্ত্তুঃ কর বিভূষিতম। ভর্ত্তারমিব সম্প্রাপ্তা জানকী মুদিতা ভবৎ।" তখন তাঁহার সুচারু মুখ-মণ্ডল রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ক্ষণেকের জন্য প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল।

রাম সতত অনিদ্র এবং সুপ্ত হইলেও "সীতা" এই মধুর বাণী তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। রমণীজনের প্রিয় কোন ফল বা পুষ্প দেখিলে তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া উঠেন, তাঁহার বিরহে রাম, মাংস ও মধু পরিত্যাগ করিয়াছেন ইত্যাদিরূপ রামের অবস্থার কথা শুনিয়া, সীতা এই দুঃখ সাগরের মধ্যেও যেন সুখসাগরের স্বপ্ন দেখিলেন—আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—

"অমৃতং বিষসম্পৃক্তং ত্বয়া
বানর ভাষিতম্।"

আরও বলিলেন—রাবণ আর দুইমাস কাল আমার জীবন রক্ষা করিবে, এই দুইমাস কাল আমি শ্রীরামচন্দ্রের মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিব ; কিন্তু—

"ঊর্দ্ধং দ্বাভ্যান্তু মাসাভ্যাং ত্যক্ষ্যামি
জীবিতম্।"

যে সীতা বনগমনকালে রামকে বলিয়াছিলেন—"আমি রাজ-প্রাসাদের ছায়া হইতে তোমার পাদচ্ছায়া স্পৃহণীয় মনে করি।" বহুমঞ্জরীশালিনী পুষ্পিতাগ্রা বনলতারাজি দেখিতে দেখিতে যিনি অধ্বক্লান্তি ভুলিয়া প্রফুল্লমনে পথ পর্য্যটন করিয়াছিলেন ; সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু হইতে ভয় পাইলে যিনি রামচন্দ্রের বাহু আশ্রয় করিতেন ; রামের সেই দণ্ডকারন্যের সঙ্গিনী চিরদুঃখসহায়া পত্নীর এই শোক-মূর্ত্তিখানি বাল্মীকি সুন্দরকাণ্ডে যেরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা জগতের কোন কাব্যে নাই। আমরা অতি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধ সঙ্কলন করিলাম ; কিন্তু যাঁহারা এই বিষন্ন সৌন্দর্য্যের পরিম্লান-ভাতি এবং তাপসীর ন্যায় একব্রত সতীত্ব সংকল্প নারীকুলের আদর্শ তেজোময়ী কমনীয়তা এবং স্বামী-অনুরাগিণীর ব্যাকুল প্রেমোন্মাদ ভাল করিয়া বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগের মূল কাব্যই অধীতব্য।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

গঙ্গাতটে।

১

আজি মা তোমার তটে
ল'য়ে শূন্যপ্রাণ,
এসেছি জুড়াতে মন
লভিতে বিরাম।

২

সন্তাপনাশিনী তুমি-
প্রেম-প্রবাহিনী
তোমার পবিত্র নীর
শান্তি প্রদায়িনী।

৩

তাই মা এ হৃদয়ের
জ্বলন্ত অনলে
আসিয়াছে নিবাইতে
শীতল সলিলে।

৪

উত্তাল তরঙ্গমালা
হৃদয়ে ধরিয়া,
চলেছ মা সিন্ধুপানে
উল্লাসে মাতিয়া॥

৫

পতির মিলন আশে
উন্মত্ত অন্তরে
ছুটিছ আপন মনে,
কে রোধিতে পারে ?

৬

তোমার প্রবল স্রোতে
নিত্য নরগণ
হারাইছে কত শত
অমূল্য রতন।

৭

কত সুখ, কত প্রেম—
আশা জীবনের
ভাসিয়া যেতেছে নিত্য
অভাগা নরের।

৮

কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই
কলনিনাদিনি,
বারেক না চাহ ফিরে
সাগরগামিনি !

৯

আমারও মা, জীবনের
একটী রতন
হারায়েছি তব তীরে
জন্মের মতন।

১০

পুণ্যময় তটে তব
এসে কতবার,
খুঁজেছি মা মিলে নাই
সে রত্ন আমার।

১১

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কত
মিশে গেল মনে ;
সে অমূল্য নিধি ফিরে
পাব কি জীবনে ?

১২

মণিময় কণ্ঠহার
ছিল মোর গলে,
সহসা পড়িল ছিঁড়ি
তোমার সলিলে।

১৩

কত সাধিলাম মাগো
নিত্য তোর পায়,
তবুত আমার নিধি
দিলি না আমায়।

১৪

শোক-তাপ-দুখভরা
এ মর সংসার,
তাই কি রেখেছো তারে
কোলেতে তোমার ?

১৫

তবে মা আমারে কেন,
রেখেছ হেথায় ?
দাও মা আশ্রয় দাও
দেবতার পায় !

শ্রীসুরবালা রায়।

পিপীলিকা।

পুংজাতীয় পিপীলিকার জীবন কেবল বংশবৃদ্ধির জন্য। পিপীলিকাদিগের পাখা উঠিলেই উহারা উড়ে এবং সেই সময়েই শূন্যে উহাদিগের সংযোগ হয়। তখনই পুংজাতীয়গণের মৃত্যু হয় ও স্ত্রীজাতীয়গণ গর্ভধারণ করে। এই সময়ে স্ত্রীগণের পাখা খসিয়া পড়ে এবং উহারা কোন এক নিরাপদ স্থানে বাস করতঃ ডিম্ব প্রসব করে। এই সময়ে উহাদিগের পরিচর্য্যা-কার্য্য ক্লীব শ্রেণীর পিপীলিকাগণ করিয়া থাকে। ক্লীবগণও স্ত্রীজাতীয়; কিন্তু স্ত্রীঅঙ্গ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত না হওয়ায়, উহারা গর্ভধারণে সক্ষম নহে। পিপীলিকার বাসাতে একটী গর্ভিণী স্ত্রী-পিপীলিকা ও কতকগুলি অসম্পূর্ণ স্ত্রী-পিপীলিকা অর্থাৎ ক্লীব, ইহারাই বাস করে; পুংজাতীয়ের সম্পূর্ণ অভাব। এই ক্লীবগণ ডিম্বগুলিকে মায়ের ন্যায়

রক্ষণাবেক্ষন ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকে। যিনি প্রকৃত মাতা তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁহাতে মাতৃস্নেহের কোনই লক্ষণ দেখা যায় না; কিন্তু যে ক্লীব (বৎ), এবং কখনও সন্তান প্রসব করে নাই, সেই মাতৃস্নেহের সমস্ত পরিচয় দেয়, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ক্লীবের এই ডিম্ব প্রতিপালন-ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল? তাহার পিতা গর্ভ-সংস্থানের পরেই মরিয়া গিয়াছিল, অপত্য স্নেহ তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। মাতা জীবিত থাকিয়াও না থাকার ন্যায়,—পুত্র স্নেহের কোন লক্ষণই তাহার শরীরে দেখা যায় না। তবে এই ক্লীব পিপীলিকাগণ এবৃত্তি কিরূপে পাইল? উপরন্তু ক্লীবগণও স্ত্রীজাতীয়। স্ত্রীচিহ্ন সকল পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই।* ক্লীবগণ প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীজাতীয়; তবে ক্লীবগণের ন্যায় স্ত্রী-পিপীলিকারও ডিম্ব-পালন-ইচ্ছা প্রবল হয় না কেন? তাহার পর, ক্লীবগণই পিপীলিকা সমাজের সমস্ত আবশ্যকীয় কার্য্য করে। তাহারাই বাসা প্রস্তুত করে এবং শত্রু হইতে রক্ষা করে। ও আবশ্যক হইলে সংস্কার করে;—তাহারাই স্ত্রী-পিপীলিকাকে বাসায় লইয়া যায়, তথায় ডিম্ব প্রসব হইয়া গেলে, তাহাতে তাপ দেয় এবং বিপদাশঙ্কা হইলে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়; শেষে ডিম্বগুলি ফুটিলে ক্ষুদ্র কীটগুলিকে রক্ষা করে। আহার যোগাইবার ভারও তাহাদিগের উপর। ক্লীবগণের সামাজিক বৃত্তি এত প্রবল যে, সমাজের মঙ্গলের জন্য অনেক সময় তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয়-প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করে। ক্লীবের এই প্রবল সামাজিক বৃত্তি উত্তরাধি-

---

* Neuters * * being simply females, the sexual organs of which are undeveloped. * * * * In all probability the cause of this differentiation of sex is dependent upon the nature of the food with which during the carval state the ant is fed. Encyclopædia Britannica Vol 2. P. 94.

কারী সূত্রে কেহই প্রাপ্ত হয় না ; কারণ তাহারা ডিম্ব প্রসব করে না। পুংজাতীয় ও স্ত্রীজাতীয়গণ যাহারা বংশবৃদ্ধি করে, তাহাদিগের এই সামাজিক বৃত্তির কোনই চিহ্ন দেখা যায় না। তবে পিপীলিকা সমাজ রক্ষা হয় কি প্রকারে? শুধু তাহাই নহে, ঐ সমাজ বুদ্ধি ও কার্য্য কৌশল গুণে এত উন্নত যে, কোন কোন স্থলে মনুষ্যকেও শিক্ষা দিবার উপযুক্ত। এ প্রশ্ন অতি গুরুতর। এই শ্রেণীর প্রশ্নের মীমাংসার উপর অনেক জটিল তর্কিত বিষয় নির্ভর করে।

শ্রীশশধর রায়।

রাতের চৌকিদার।

[অনুকৃতিকৌতুক—Parody.]

ভোরের পাখী ডাকে কোথায়
ভোরের পাখী ডাকে।
রঙ্গদর্শন, নবপর্য্যায়, ৩য় বর্ষ, বৈশাখ।

চৌকিদার হাঁকে ঐ গো—
চৌকিদার হাঁকে।
চোর পালালে খবরদারী
জবরদস্ত রাখে॥
কেউ যদি গে নালিশ করে
শালা বলে' হাতটি ধরে
থানায় পাড়ায় ঘুরিয়ে মারে
হাজার লক্ষ পাকে।

চৌকিদার সুপ্ত চোখে
ঝেঁকে ঝেঁকে হাঁকে॥

ওগো তুমি চৌকিদার,
রাতের চৌকিদার।
কোন্ দারোগার মন জোগাতে
ঘুষ কচ্ছো পার॥
রুগ্ণ-ভগ্ন পেটের খাঁজে,
বোক্‌নো-ভাঙা মগ্ন মাঝে,
ঝুল্‌ছে কেমন তারির ধারে
ডাণ্ডা চমৎকার।
ওগো তুমি চৌকিদার
রাতের চৌকিদার॥

পানের দোকান ঐ রয়েছে
পাটায় তক্তা পাতা।
বাড়ী গিয়েছে খিলিওলা
গাঁজা-সিদ্ধি-দাতা॥
দাঁড়িয়ে তারি একটি পাশে,
মাতোয়ালা বাবুর আশে,
ঘাড় মুচ্‌ড়ে ঘুমিয়ে ছিলে
ধরে' চালের বাতা।
যেথায় দোকান খালি এখন
পাটায় তক্তা পাতা॥

ওগো রাতের সান্‌কি-মিঞা
কহ আমায় কহ।
আঁধার-ঘেরা দুপুর-রাতে
যখন ঘুমে রহ॥
হঠাৎ তব কাণের ঘরে
কেমন করে' প্রবেশ করে
রোঁদের বেলা জুড়ির গলা
বলে' "খাড়া রহ।"
ওগো রাতের সান্‌কি-মিঞা
কহ আমায় কহ॥

কোঁক্‌ড়া তব দাড়ীর গোছা
চুম্‌রে কেমন ওঠে।
পাক্‌ড়ো বলে' জুড়ীদার
দৌড়ে যখন ছোটে॥
চক্ষু মেলি মোড়ের বাগে,
নিদ্রা-ভাঙা বেজায় রাগে,
রসুনিত রসনাতে কি
আদিরস ফোটে।
কোঁক্‌ড়া তব দাড়ীর গোছা
চুম্‌রে কেমন ওঠে॥

ভাল মানুষ দেখ্‌লে তোমার
চোর যে মনে হয়।

চোরের সঙ্গে কুটুম্বিতা
আছে অসংশয়॥
তুমি বল দোকানদারে,
তেল নুন চাল দিতে ধারে,
শোধ দেব না শোধ দেব না
মনটি তোমার কয়।
ভাল মানুষ দেখ্‌লে তোমার
চোর মনে হয়॥

মাল নিয়ে চোর ভাগো ভাই
মাল নিয়ে চোর ভাগো।
চৌকিদার হাঁকে ওই
আর সরিয়ো নাগো॥
বাড়ীর লোকের পাচ্ছি সাড়া,
হয় তো জেগে উঠ্‌বে পাড়া,
মোড়ের কাছে হ'য়ে খাড়া
বখ্‌রা দিয়ে যা গো।
পয়সা পেয়ে চৌকিদার
আনন্দেতে জাগো॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।
ষ্টার থিয়েটার।

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

(উপন্যাস।)

——:০:——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দাদার শ্বশুর, গ্রামেই এক জমিদার বাটীতে চাকুরী করিতেন। সে-কেলে লোক—ধর্ম্ম পথে চলিয়া সুখে দুঃখে একপ্রকারে দিন যাপন করিতেন। বিশেষতঃ প্রেমময়ী ভার্য্যা যাঁহার গৃহের গৃহলক্ষ্মী, সে গৃহের গৃহস্থ সহস্র দরিদ্র হইলেও, সে গৃহে সর্ব্বদার জন্য শান্তি বিরাজমান থাকে। নিত্যানন্দের স্ত্রী—বিমল প্রসাদের মা শৈলবালা, আপনার স্ত্রীজনোচিত অপার প্রেমে সংসারের সকলকে আপন করিয়া, আপনাদের ন্যায় ভাল বাসিতেন। নিত্যানন্দের সংসারে নিত্যানন্দের গৌরী ও অন্নপূর্ণা নাম্নী দুইটি বিধবা ভগিনী গৌরীঠাকুরাণীর দুইটি পিতৃহীন অনাথ শিশুপুত্র, আর বাসন্তী নামে একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষের একটি কন্যা। তা'রপর নিত্যানন্দের নিজের বিমলপ্রসাদ ও নির্ম্মলপ্রসাদ নামে দুইটি পুত্র, আর শ্যামকুমারী, হেমকুমারী ও রাজকুমারি নাম্নী তিনটি অলোকসামান্যা ভুবনমোহিনী কন্যা। জ্যেষ্ঠা শ্যামকুমারী প্রায়শই শ্বশুর-গৃহে থাকিতেন, কালেভদ্রে বৎসরান্তে এক এক বার পিত্রালয়ে আসিতেন।

অত্যন্ত সমাদরে দাদার শ্বশুর-গৃহে তিন দিন অতীত করিয়া, চতুর্থ দিন প্রতঃকালে কর্ত্তাকে কহিলাম—"আজিকার মেলে বাড়ী যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

কর্ত্তা কহিলেন—"তাহাতে আমার আপত্তি কি? তবে সবে এই নূতন আসিলে, আরও দুই চারি দিন থাকিয়া পরে বাড়ী গেলেই ভাল হ'তো। কলেজ তো এখনও দীর্ঘকাল বন্ধ আছে।

আমি—"হাঁ, কলেজ দীর্ঘকাল বন্ধ আছে,—সত্য; কিন্তু এবার এই তিন চারি দিন রহিলাম, এ যাত্রায় আজই যাই, বাড়ীতে বিশেষ কাজ আছে, আবার কত সময়ে বউঠাকুরাণীকে নিতে আসিতে হ'বে, তখন দু'দশদিন থাকিব।"

কর্ত্তা—"আচ্ছা"—বলিয়া পঞ্জিকা খুলিলেন। অনেকক্ষণ পঞ্জিকা দেখিয়া কহিলেন—"দিন ভাল নহে—রিক্তাদোষ; আগামী কল্য যাইবার দিন স্থির করিলাম।"

আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া কহিলাম—"আচ্ছা তাহাই হউক। আর দাদা বউঠাকুরাণীর সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী রাজকুমারীকেও লইয়া যাইতে উপদেশ করিয়াছেন, নহিলে বউঠাকুরাণীর একা থাকিতে কষ্ট হইবে।"

কর্ত্তা—"রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে; সুতরাং কন্যা দেখিবার জন্য লোকজন আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।"

—"রাজকুমারীর বিবাহ!"—কর্ত্তার মুখে রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া, সহসা আমার মস্তকের ভিতর দিয়া যেন তড়িৎ খেলিয়া গেল। পূর্ব্বেই রাজকুমারীর নাম শুনিয়া—বউঠাকুরাণীর সহোদরা ভগিনী জানিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; তা'রপর এখানে আসিয়া এই কয়দিনে স্বচক্ষে রাজকুমারীর অতুল্য রূপরাশি দেখিয়া, সর্ব্বোপরি তা'র সরলতা-পরিপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া ও মৃদুমধুর কথা শুনিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম, বউঠাকুরাণীর সহিত রাজকুমারীকে আমাদের গৃহে লইয়া যাইয়া, বউঠাকুরাণীকে দিয়া আমার সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ প্রস্তাব করাইব;—যতদূর বুঝিয়াছিলাম, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, নিত্যানন্দ অথবা শৈলবালার নিকট হেমকুমারীর অনুরোধ উপেক্ষনীয় হইবে না। যাহাহউক সহসা

কর্ত্তার মুখে রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব এবং যতদূর জানিলাম তাহাতে অপরের সহিত এই বিবাহ হইবে জানিতে পারিয়া, আমার হৃদয়ে একটা বড় আঘাত লাগিল। কিন্তু, কি করিব—উপায়হীন। উপায়হীন ব্যক্তির ন্যায় আশার মোহিনীশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, হৃদয়ের দুর্ব্বিষহ বিষ-যন্ত্রণা হৃদয়ে রাখিয়া কহিলাম—"তা, বেশ তো, যখন আপনি লিখিবেন,—তখনই রাখিয়া যাইব।"

কর্ত্তা এবার "আচ্ছা" বলিয়া কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন। কর্ত্তা উঠিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই একজন পরিচারিকা আসিয়া আমায় কহিল—"বাবু মাঠাকুরাণী আপনায় ডাকিতেছেন।"

আমি—"আচ্ছা,—চল যাই"। এই বলিয়া বিষণ্ণবদনে পরিচারিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, গৃহিণীঠাকুরাণী মৃত্তিকার দ্বারায় শিব-মূর্ত্তি গড়িতেছেন। এমন সময়ে আমাকে দেখিয়া মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া ধীরকণ্ঠে রাজকুমারীকে কহিলেন—"ননি! নরেনকে বসিবার একখানি আসন দাও।" ননি ওরফে রাজকুমারী আমাকে বসিবার জন্য একখানি আসন আনিয়া দিল, আমি তাহাতেই উপবেশন করিলাম। উপবেশন করার পর গৃহিণীঠাকুরাণী আপনার স্বভাব সুলভ কোমলকণ্ঠে স্নেহপূর্ণ মধুস্বরে কহিলেন—"তুমি আজই না কি বাড়ী যাইতে চাহিতেছ।"

আমি—"না, আজ যাওয়া হ'লো না—দিন ভাল নয়। আগামী কল্য যাইবার দিন স্থির হইয়াছে।"

গৃহিণীঠাকুরাণী পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন—"যদি আসিয়াছ, তবে আর দু'দশদিন থাকিয়া যাওনা কেন? বাড়ীতে তো আর মা নাই।"

"মা নেই,"—স্নেহময়ী গৃহিণীর মুখে "মা নেই"—কথা কয়েকটি শুনিয়া, জানি না কেন অকস্মাৎ ক্ষুদ্র দুইবিন্দু অশ্রু আসিয়া আমার নয়নে দেখা দিল; তা'রপর আপনার মনে আপনি নয়নদ্বয় প্লাবিত করিয়া গড়াইয়া পড়িল। জীবনের এই দীর্ঘকালে জীবনে কত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছি; কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি, একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার বহুদিন মৃতা জননীর কথা আমার মনে হয় নাই, অথবা জননীর জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, আমার নয়নে কেহ কখন জল দেখে নাই। কিন্তু আজিকার এই দিনে গৃহিণীঠাকুরাণীর সেই স্নেহপূর্ণ করুণাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে আমার নয়নে সহসা জল দেখা দিল। এতদিন,এই দীর্ঘকালব্যাপী জীবনে কখন কাঁদি নাই—কাঁদিতে পারি নাই; আজ কিন্তু বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলাম। যতদিন মা ছিলেন, ততদিন মা'র মমতা—পুত্রের প্রতি মা'র সমুদ্রতুল্য অপার স্নেহ—কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। সহসা দীর্ঘকাল পরে গৃহিণী-ঠাকুরাণীর স্নেহময় মধুরস্বরে আমার সেই বহুদিন মৃতা মা'র মধুমাখা স্নেহপূর্ণ কথা—অধম ও অকৃতজ্ঞ তনয়ের প্রতি মা'র যে সমুদ্রতুল্য অপার-অপরিমেয় স্নেহ, সে স্মৃতি পুনরায় নূতন হইয়া হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। এ জীবনে একদিন একমুহূর্ত্তের জন্যও অভাব কি, তাহা জানি নাই—জানিতে পারিনাই—জানিবার প্রবৃত্তিও বুঝি ছিল না। আজ জীবনে এই প্রথম রাজকুমারীর লাভ বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া অভাব বুঝিতে আরম্ভ করিলাম; সুতরাং এই সঙ্গে মা'র অভাবটিও বেশ বুঝিতে পারিলাম;—চক্ষে জল দেখা দিল।

সহসা আমার নয়নে জল দেখিতে পাইয়া, গৃহিণীঠাকুরাণীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে প্রেমের পূতমন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইল;

তাহাই তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ-পরিপূর্ণ মধুরস্বরে কহিলেন—"ছি, বাবা কান্না কেন? বাপ-মা কা'দের ক'দিন বেঁচে থাকে?—বড় হইয়াছ—লেখাপড়া শিখিতেছ, এখন বিবাহ করিয়া দুই ভাইয়ে সংসার করিলেই আবার সুখের সংসার হইবে।" তা'রপর আপনার মনে আপনি অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন—একবার শিব-মূর্ত্তিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—শেষে কহিলেন—"এখন বিবাহ করায় আপত্তি কি?"

এবার সহসা গৃহিণীঠাকুরাণীর মুখে বিয়ের কথা শুনিয়া, আমার নিরাশা কাতর অন্তরের অন্তঃস্থলে আশার সঞ্চার হইল। আমি উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"হাঁ, সুবিধা বুঝিলে এখন বিবাহ করিব—স্থির করিয়াছি।"

পুনরায় গৃহিণীঠাকুরাণী বলিলেন—"তা, যদি তোমার মত হয়, তবে আমার ননদিনীর কন্যা বাসন্তীর সহিত তোমার বিবাহ দিতে পারি। আমাদের বড় সাধ বাসন্তী ও হেমকুমারী একত্রে থাকে?"

ও হরি! এই কি সে আশার ফল? কি শুনিবার জন্য আগ্রহ-ভরে অপেক্ষা করিতেছিলাম, আর এ কি শুনিলাম!

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মনে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে ছিলাম; সুতরাং অন্যমনস্ক হেতু গৃহিণীর কথায় উত্তর দিতে পারিতে-ছিলাম না। এদিকে গৃহিণীঠাকুরাণী আমাকে নীরব হইতে দেখিয়া আবার কহিলেন—"নরেন্! আমার কথার উত্তর কি,— ?"

বিষণ্ণমুখে আমি কহিলাম—"ইহার উত্তর এখন দিতে পারিলাম না, হয়ত বাড়ী যাইয়া দিব।"

আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষে পরদিন বউঠাকুরাণী ও রাজকুমারীকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ক্রমশ

শ্রীউমেশ চন্দ্র মৈত্রেয়।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ১৩১০। { ৪র্থ সংখ্যা।

ভাষা ও কৌশল।

গভীর রজনী, সম্মুখে মুক্তপ্রকৃতি চন্দ্রকর-প্রভাসিত হইয়া, তরলী-কৃতরজত-প্লাবনে আবৃতবৎ প্রতিভাত হইতেছে। চারিদিকে শান্তি বিরাজিত, তুমি দূরপ্রসারিত জলধি-তীরে বসিয়া সে শান্তিময়—মাধুর্য্যময় গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছ। প্রকৃতি নির্ব্বাত, নিস্পন্দ, নিশ্চল-বায়ুস্তর-বিকম্পনরহিত, জলধিকক্ষ চাঞ্চল্যবিহীন জড় প্রকৃতি আপনার বিরাট জড়মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া, সুষুপ্তিময়, শান্তিময়, অথচ প্রদীপ্ত, কেমন এক শান্তি-মাধুর্য্যজড়িত গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তির পূর্ণতা সম্পাদন করিতেছে; অথবা সুললিত কণ্ঠের মৃদুস্ফুরিত সঙ্গীতস্বর বায়ুস্তরমধ্যে মৃদুসঞ্চারিত হইয়া, কিম্বা অতি ক্ষীণবায়ু-প্রবাহসম্ভাবিত অতি ক্ষুদ্রাকার বীচি-সমূহ জলধিবক্ষে অলসক্রীড়াতৎপরভাবে তীরে তরণী-গাত্রে বা তুমি যে সোপান-শীর্ষে উপবিষ্ট, তাহার নিম্নতম খণ্ডে মৃদু আঘাত করিয়া বৈপরিত্যে প্রকৃতির সে বিরাট গাম্ভীর্য্যের ভাব—সে গাম্ভীর্য্যময় শান্তির ভাব তোমার হৃদয়ে অধিকতর প্রকটিত করিতেছে; সেই সঙ্গে সেই কোমল সঙ্গীতস্বর বা জলচাঞ্চল্যের মৃদু কলরবে কৌমুদীজনিত প্রকৃতির সে শান্ত-গম্ভীর ভাবের মাধুর্য্য সংবর্দ্ধিত হইতেছে। সে বিরাটভাবে—

সে শান্তির ভাবে—সে মাধুর্য্যের ভাবে পূর্ণ হইয়া তুমি প্রকৃতির ধ্যান করিতেছ; ভাবেই কেবল ভাবের অভিব্যক্তি হইতেছে তুমি ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছ না; অথবা যদি তাহার কোনরূপ শব্দায়িত অভিব্যক্তি অনুভূত করিয়া থাক, সে কেবল সেই মৃদু কণ্ঠস্বরে—সেই মৃদু বীচিকলরবে—প্রকৃতির আপনার সেই লীলাসামর্থ্যে,—মনুষ্য-ভাষায় নহে। কবিগণের ভাষাশক্তি পৃথক; যে ভাবের অভিব্যক্তির ভাষা তুমি খুঁজিয়া পাওনা, অল্প কথায় বা শব্দবিশেষের নূতনবিধ প্রয়োগে কবি তাহা অনায়াসে ব্যক্ত করিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যে সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও শান্তির মূর্ত্তি—যে মাধুর্য্যময় মুক্তপ্রকৃতির ছবি তুমি ধ্যান করিতেছিলে, দেখ কবি অতি অল্প কথায় কেমন সুন্দরভাবে তাহার পূর্ণাভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন :—

"পুলিনে সুষুপ্ত মধুর কৌমুদী;
নীরব নিশীথ;—কোমল মিলন!
শোভিত সময়; তানলয় ধ্বনি,
মৃদু সঙ্গীতের, পরশয়ে শ্রুতি।"*

—দেখ এক "সুষুপ্ত" কথার ব্যবহারে ভাবের কিরূপ সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে, প্রকৃতির সে অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি ভাষায় কতদূর প্রতিফলিত হইয়াছে! "সুষুপ্ত প্রকৃতি", "সুষুপ্ত হৃদয়" ইত্যাকার ভাষার আমরা এখন বহুল ব্যবহার করিয়া থাকি; জানি না কবিগণের ভাষাদৃষ্টে

* "How sweet the moon-light sleeps upon this bank!
Here will we sit, and let the sound of music
Creep in our ears; soft stillness, and the night,
Become the touches of sweet harmony."
—*Shakespeare.*

আমরা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি কি না। যাহাই-হউক মুক্ত প্রশস্ত সমুদ্র-সৈকত নিশীথ সময়ের শান্তি-গাম্ভীর্য্যের সহিত চন্দ্রকর-মাধুর্য্য সংযোজিত হইয়া, সেই সৈকতভূমির পৃষ্ঠে যে মহতী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা—যে মহান্ ভাবের অবতারণা করিয়াছে, তাহার প্রকটন বা অভিব্যক্তি এইরূপ কবিভাষায় ভিন্ন হয় না। তাই বলিতেছিলাম কবিগণের ভাষা-শক্তি পৃথক,—তাঁহাদের প্রতিভা ভাবে, ভাষায়, সৌন্দর্য্য-সৃজনে সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়।

সেই স্নেহের পুত্তলী—সেই সৌন্দর্য্যের আধার—সেই অমৃতভাষিণী বালিকার কমনীয় মুখচ্ছবি, সেই হৃদয়ার্দ্ধভাগিনী প্রেমময়ীর প্রেমানন,—সন্দর্শনে আমার হৃদয়ে আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে; বালিকার প্রকৃত নাম ভাঙ্গিয়া গড়িয়া কতভাবে রূপান্তরিত করিয়া, অন্যের অবোধ্য আমার নিকট অর্থপূর্ণ কত কি অনাভিধানিক শব্দে তাহাকে অভিহিত করি, যুবতীকে কত আদরসম্ভাষণে আপনার বলিয়া জানাইবার যত্ন করি, কত প্রকারে সে হৃদয়ের বস্তুকে অধিকতর হৃদয়সন্নিহিত করিবার প্রয়াস পাই,—কিছুতেই হৃদয়ের তৃপ্তি জন্মায় না; কি নামে অভিহিত করিলে—কি ভাষায় সম্ভাষণ জানাইলে, সে হৃদয়ভাবের অভিব্যক্তি হইতে পারে, হৃদয়ে যাহা অনুভূত করিতেছি, কথায় যাহা প্রকাশিত করিবার এরূপ অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষা, ভাষায় তাহা প্রতিবিম্বিত করিতে সমর্থ হই—বুঝিয়া উঠিতে পারি না; কেমন একটা অতৃপ্তির ভাব, কেমন একটা অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার ভাব মনে সমুপস্থিত হয়। কেবল কবির ভাষায় এ ভাবের অবসান অনুভূত করি—এ অতৃপ্তির নিরাকরণ দেখিতে পাই—এ অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ে শান্তি প্রদান করে,—মনে করি এই ত সে হৃদয়ভাবের অভিব্যক্তি; যে অভিব্যক্তির অভাবে হৃদয়-প্রবাহ রুদ্ধ বলিয়া বোধ করিতেছিলাম। কবিও অনেক সময়ে নূতন কিছু বলেন না অথচ

তাঁহার কথায় হৃদয় তৃপ্তি লাভ করে। যখন কবির ভাষায় পড়িলাম,

"তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য
প্রিয়ো জনঃ।"

তখন হৃদয়ে শান্তি উপজাত হইল, আপনার ভ্রম আপনি বুঝিতে পারিলাম; বুঝিলাম যে অভিব্যক্তির জন্য হৃদয় এত প্রয়াসবান্ হইয়াছিল, সে অভিব্যক্তির কেবল এই একমাত্র ভাষা, ইহাতেই সে ভাবের প্রকৃত অভিব্যক্তি, অন্য ভাষায় তাহা সম্ভাবিত নহে; হৃদয়ের অতৃপ্তির ভাব মিটিল, যাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছিলাম না, কবিবাক্যে তাহা বুঝিলাম; যাহা প্রচ্ছন্নভাবে অনুভূত করিতেছিলাম তাহা মানসচক্ষে স্পষ্টতা লাভ করিল; বুঝিলাম যে যাহার প্রিয় ব্যক্তি, সে যে তাহার কি পদার্থ তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রদীপ্তালোকে প্রকৃতি প্রফুল্লতাময়ী; সে প্রদীপ্ত কিরণজাল সাগর-বক্ষে নিপতিত হইয়া, সে স্ফটিকপ্রভ প্রভূত জলরাশিকে অতি উজ্জ্বল দৃশ্যে পরিণত করিয়াছে; সাগর-তরঙ্গ সে আভা নিজ শরীরে প্রতিবিম্বিত করিতে করিতে তীরে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইতেছে। কবি সে রবিকরপ্রদীপ্ত, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন তরঙ্গবারি দর্শনে বলিতেছেন :—

"দ্রবীভূত সূর্য্যালোক, নক্ষত্রধারায়,
বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন তীরে, তরঙ্গ শরীরে!"*

—সুন্দর সুব্যক্ত উপমা, উপমায় বর্ণিত দৃশ্যের উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইতেছে।

—স্বর্গ দৈত্যাধিকৃত, দেবগণ স্বর্গচ্যুত পাতালবাসী। ইন্দ্রের শচী

* "I See the wave upon the shore
Like light dissolved in star-showers thrown."
—*Shelley.*

চপলাসহ মর্ত্ত্যে নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছেন; দানবরমণী ঐন্দ্রিলার সন্তুষ্টিসাধন জন্য শচীকে নৈমিষ-কানন হইতে বলপূর্ব্বক আহরণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। অন্যান্য দৈত্যবীরের অকৃতকার্য্যতার পর বৃত্রসুত রুদ্রপীড় এ কার্য্যে ব্রতী হইয়া নৈমিষে উপস্থিত হইলে, তথায় শচীনন্দন জয়ন্তের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম বাধিল; সে সংগ্রামে অকস্মাৎ রুদ্রপীড়ের দ্রুঘণাঘাতে বাসবনন্দন মূর্চ্ছাগত হইলেন। কবি তাঁহার মূর্চ্ছাগত অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন :—

"কিম্বা যেন রাশীকৃত,
চন্দ্ররশ্মি আভাহৃত,
খসিয়া পৃথিবী-অঙ্গে হইল পতন।"

জ্যোতির্ম্ময়, জরা-মরণ-বিরহিত দেবশরীরের সাময়িক অবসাদের দৃশ্য ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে এরূপ অনুমান হয় না।

আবার দেখুন বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী রাইয়ের কৃষ্ণদর্শন লালসা, কৃষ্ণের অদর্শনজনিত হৃদয়ের ব্যাকুলতা, হৃদয়ের বিরহব্যথা কিরূপ ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন :—

"হিয়ার ভিতরে, লোটাঞা লোটাঞা,
কাতরে পরাণ কাঁদে॥"

—সুন্দর ভাষা! অশরীরী প্রাণের কাতরতা প্রকাশের ভাষা না পাইয়া শ্রীরাধিকা আপনার প্রাণকে শরীরী কল্পনা করিতেছেন, শরীরী প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে লোটাইয়া পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে আবার কাঁদিয়া লোটাইতেছে। এইরূপ উপমার ভাষায়, অলঙ্কারের ভাষায় কবিগণ অনেক সময়ে ভাবের অভিব্যক্তি সাধন করিয়া থাকেন। এ প্রতিভা সম্ভাবিত,—সহজ ভাষার অন্তর্ভূত নহে।

জড় জগতের দূরত্বের পরিমাণ আছে; দণ্ড, রজ্জু বা শৃঙ্খলদ্বারা

তাহা মাপিতে পারা যায়; সে দূরত্ব অপরিবর্ত্তনীয় তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। অন্তর্জ্জগতের দূরত্ব অপরিমেয় এবং স্থায়িত্ববিহীন; গিরি-নদী-সমুদ্র-পারে শত যোজনান্তে অবস্থিতি করিয়াও কেহ তোমার হৃদয়-সন্নিহিত, আর যে তোমার পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহাকেও হয় ত তুমি শত যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ; অপরিচিতকে পরিচিত, হৃদয়ের বস্তু করিয়া লইতেছ, আবার যে হৃদয়ের বস্তু তাহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতেছ; কাল যে হৃদয়ের প্রতিমারূপে হৃদয়ের অন্তরতম স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল, আজ তাহাকে উৎপাটিত করিয়া বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছ। অন্তর্জ্জগতে নৈকট্যস্থলে দূরত্ব, দূরত্বস্থলে নৈকট্য, এইরূপ অহরহ ঘটিতেছে, কে তাহার পরিমাণ করিবে? তবে ভাবে ও ভাষায় এ দূরত্ব ও নৈকট্যের বাহ্যবিকাশ, কবির কৌশলময় বর্ণন ও ভাষায় কখন কখন এ দূরত্ব ও নৈকট্যকে যেন পরিমেয় করিয়া তুলে, কবির প্রতিভার বলে অসাধ্য যেন সাধ্য হইয়া উঠে। পিতৃহীনা, নিরাশ্রয়া, সরলা বালিকা তিলোত্তমার একমাত্র প্রাণের আশা তাঁহার সেই প্রাণের অধীশ্বর জগৎসিংহে নিহিত, জীবনের অমানিশায় কেবল সেই একমাত্র আশা-প্রদীপপানে তাকাইয়া জীবিত রহিয়াছেন। অন্যদিকে জগৎসিংহ, তিলোত্তমা কতলু খাঁর বিলাসপর্য্যঙ্কশায়িনী ধারণায়, তাঁহার সে হৃদয়ের প্রতিমাকে উৎপাটিত করিয়া বিস্মৃতির অতলজলে নিমগ্ন করিয়াছেন; কাল যে হৃদয়ের অন্তরতম স্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ তাহাকে অন্তর হইতে কত দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন তাহার পরিমাণের উপলব্ধি কেবল একমাত্র কবির ভাষাতেই হইতে পারে। পিতৃশত্রু, নরপশু পাঠান সেনাপতির অত্যাচার ভয়ে প্রপীড়িতা হইয়া, সরলা বিমূঢ়া তিলোত্তমা তাঁহার একমাত্র আশ্রয়স্থল, ভরসাস্থল, জগৎসিংহের সমীপাগতা হইলে, জগৎসিংহ তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন, "কেও, বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা?" বালিকার হৃদয়ে শেল বিঁধিল। তাঁহার

নাম পর্য্যন্ত রাজকুমার বিস্মৃত হইয়াছেন মনে করিয়া তিনি মর্ম্মপীড়িত হইলেন; তিনি প্রতিমা বিসর্জ্জনের খবর রাখিতেন না, সরল মনে এরূপ আশঙ্কার ছায়ামাত্রও পতিত হয় নাই, অন্যথা এই ত্রিশব্দাত্মক বাক্য শত বজ্রের যুগপৎ পতনবৎ তাঁহার হৃদয়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করিত, অন্তর্জ্জগতের অসীম শক্তির বলে সে আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হইলেও, সে হৃদয় নিষ্পেষিত হইয়া আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিত। এইরূপ স্থলবিশেষে, অবস্থাভেদে ভাষার অর্থ অতি দূরপ্রসারী; বক্তার কথার শব্দগত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ভাবার্থের অনুসন্ধান করিতে হয়। সাধারণ ভাষায় সময়ে সময়ে আমরা এরূপ কথার ব্যবহার না করিয়া থাকি তাহা নহে, তথাপি কবি-লেখনী-প্রসূত ভাষার বিশেষত্ব আছে।

প্রেমানুরাগ কবি কল্পনায় স্বর্গীয় পদার্থ, মনুষ্য হৃদয়ে মহত্ত্ব প্রদান করিবার জন্য পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। বস্তুতঃও যে হৃদয়ে প্রেমানুরাগ অসম্ভব সে হৃদয়ে মহত্ত্ব সম্ভাবিত নহে। কবির উক্তি:—

"সঙ্গীতবিহীন হয় অন্তর যাহার,
তানলয় ধ্বনি যাহে করে না চালিত,
রাজদ্রোহ, কুমন্ত্রণা, দস্যুবৃত্তি আদি,
করিতে সমর্থ সেই নরের মাঝারে;
রজনীর নির্জ্জীবতা অন্তরে তাহার,
পাতালপুরীর ন্যায় তামস হৃদয়;
বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে এরূপ কুজনে।" *

* "The man that hath no music in himself,
Nor is not mov'd with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils;
The motions of his spirit are dull as night,
And his affections dark as Erebus:
Let no such man be trusted."—*Shakespeare.*

প্রেমানুরাগ সম্বন্ধেও সেই কথা, যাহার হৃদয়ে অনুরাগের ভাব সঞ্চারিত হইতে পারে না, কোনরূপ মহত্বের ভাবও তাহাতে লক্ষিত হওয়া সম্ভবপর নহে; কেন না, অনুভূতিই অনুরাগের মূল, সৌন্দর্য্যানুভূতি হইতে সৌন্দর্য্যের আধারের প্রতি হৃদয়ের প্রবণতা জন্মায়। গুণানুভূতি ও সৌন্দর্য্যানুভূতি, গুণ চরিত্র সৌন্দর্য্যের নামান্তর মাত্র। এইরূপ ধর্ম্মানুরাগ, কর্ম্মানুরাগ সকলই কোন না কোনরূপ অনুভূতি হইতে উৎপন্ন। তাই কবিগণ তাঁহাদের আদর্শ চরিত্রের উপকরণ মধ্যে প্রেমানুরাগকে বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইজন্য বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি চোরের সহিত বন্ধুত্ব বরং মনোনীত করিতেন, তথাপি নির্জ্জনে কখনও এক বিন্দু অশ্রুপাত করেন নাই এরূপ সাধু পুরুষের বন্ধুত্বের প্রয়াসী ছিলেন না।

রাজা দুষ্মন্ত মহাকবির মহতী সৃষ্টি; এক দিকে কবি যেমন দুষ্মন্ত হৃদয়ে প্রেমের আধিপত্য দেখাইয়াছেন, অন্য দিকে সেইরূপ সে চরিত্রে সংযমন ও চরিত্র দৃঢ়তারও একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। যে দুষ্মন্ত কণ্বের তপোবনে, শকুন্তলার রূপে, শকুন্তলার প্রেমানুরাগে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন; সেই দুষ্মন্ত রাজভবনে, রাজসভায়, সংযমন ও চরিত্রবত্তার পরিচয় দিবার স্থলে তাঁহার পরিণীতা পরিচয়ে, সমীপাগতা সেই অনুপমরূপ-লাবণ্যবতীর রূপরাশি ও প্রেমানুরাগের অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিলেন; রূপলাবণ্যে তাঁহার ধর্ম্মনিরত মনকে বিচলিত করিতে পারিল না। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যানুরাগ কেমন ধর্ম্ম-বুদ্ধিনিয়মিত, তপোবনে রূপমুগ্ধাবস্থায়ও সে ধর্ম্ম-বুদ্ধির, সে চরিত্রবত্তার পরিচয় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। সে রূপজ অনুরাগের যথাবিহিত পরিণাম পরিণয়প্রয়াসী হইয়া রাজা আপনার মনে প্রশ্ন করিতেছেন:—

"অপি নাম কুলপতেরিয়মসবর্ণ ক্ষেত্রসম্ভবা ভবেৎ?"

—পরিণয় অবৈধ হইলে আত্মসংযমনের, আত্মনিগ্রহের ক্লেশ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই এরূপ প্রশ্ন করিতেছেন। অত মোহের মধ্যেও

এরূপ বৈধাবৈধের বিচার প্রবৃত্তি দুষ্মান্তান্তঃকরণের বিশুদ্ধতা ও গৌরব প্রদর্শন করিতেছে। প্রকৃতিগত চরিত্র সৌন্দর্য্য এই ভাবেই প্রকাশ লাভ করিয়া থাকে।

—দুষ্মন্ত চরিত্রের এই বিভিন্নাংশের সামঞ্জস্যের জন্য কবিকে দুর্ব্বাসার শাপরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে; যেখানে এত রূপমোহ, যেখানে এত প্রেমানুরাগ, সেখানে এরূপ বিস্মৃতি অন্যথা অস্বাভাবিক হইত। ঘটনাবৈচিত্র্যে, কাব্যান্তর্গত ব্যক্তিসমূহের চরিত্রের স্ফুরণ বা বিকাশন জন্যও কবিগণ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অবতারণ করিয়া, কৌশল-কুশলতার পরিচয় দিয়া থাকেন, এস্থলে দুর্ব্বাসার শাপ তদুদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়া থাকিলেও এ ক্ষুদ্র ঘটনার অবতারণের অন্যতর উদ্দেশ্য বিরোধী ঘটনার অবিরোধিত্ব সম্পাদন।

সদৃশ স্থলে, ভবভূতি তাঁহার পাঠকগণকে ঋষিবাক্যের অব্যর্থতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না বলিয়া ভিন্নরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন,—তিনি ছায়ার সৃষ্টি করিয়া প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন। যেখানে ভাবের আন্তরিকতা প্রকৃত, সেখানে বাক্যস্ফূর্ত্তি কম; হৃদয়ের ভালবাসা প্রণয়পাত্রের নিকট প্রচারবিমুখ। আবার বাক্য হইতে সকল সময়ে ভাবের প্রকৃতত্ব উপলব্ধ হয় না; কথায় যাহা প্রকাশিত হয় তাহার আন্তরিকতা কত দূর, সকল অবস্থায় তৎসম্বন্ধে প্রতীতির উৎপাদন সহজ নহে। সরলহৃদয়া রামময়জীবিতা জনকদুহিতার রামের হৃদয়ের প্রতি অবিশ্বাস না থাকিলেও, নির্ব্বাসন ঘটনার পর, অন্ততঃ জানকীর নির্ব্বাসনক্লেশের প্রশমন জন্য, সে বিশ্বাসের সমূলকতা প্রতিপাদনের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। সীতার সম্মুখে রামের সীতাবিরহবেদনা বাক্যে প্রকাশ লাভ করিতে পারিলেও, তাহা অন্ততঃ কতক পরিমাণে নির্ব্বাসননিগ্রহজনিত সীতার মানসিক ক্লেশের অপনোদন জন্য কি না, সীতার মনে এ সন্দেহ অস্বাভাবিক হইত না;

যদিও প্রকৃত সীতাগতপ্রাণ রাম কোন ভাবাই জানকীর প্রতি তাঁহার হৃদয়ভাবের অতিরঞ্জন বলিয়া মনে না করিতে পারিতেন। আবার মনুষ্যপ্রকৃতি সূক্ষ্মতররূপে পরীক্ষা করিতে গেলে ইহাও অসম্ভব নহে যে, প্রজারঞ্জনানুরোধে সীতার প্রতি অতটা কাঠিন্যাচরণের পর, রাম সীতা সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়গতির উপরে ততটা আস্থাবান হইতে পারিতেন না; কেবল প্রকৃত প্রণয়ের প্রচার বিমুখতার জন্য নহে, হৃদয় যতদূর অগ্রসর হইত তাহার প্রকৃতত্বসম্বন্ধে সংশয়যুক্ত হইলে, সরলহৃদয়ে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি ঘটিত না। কবিকে এই সকল বিবেচনা করিয়া কৌশল উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে; প্রতিভাসূচিত সে কৌশলপ্রয়োগে তিনি কৃতকার্য্যতা লাভও করিয়াছেন।

বঙ্গের কবি আপনার প্রতিভাবলে এ বিষয়ে কালিদাস ও ভবভূতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন; নগেন্দ্রসূর্য্যমুখীর পুনর্মিলনে উত্তরচরিতের ছায়ানামক সর্গের অনুকরণ করিতে গিয়া, অনুকৃতের উপর তিনি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। সে সুন্দর দৃশ্য—সে কৌশলের বিবৃতি কবির ভাষা উদ্ধৃত করিয়া, পাঠকগণের স্মরণপথে পুনরানয়ন করিব; যে সুন্দর কৌশলময় উপায়ে, তিনি সূর্য্যমুখীর হৃদয় হইতে সকল ব্যথার অপনোদন করিয়া স্বামিপ্রেমে তাঁহার পূর্ব্ববৎ বা তদপেক্ষাও দৃঢ়তররূপে, আস্থা সংস্থাপন করাইয়াছেন, তাহা তাঁহার আপনার ভাষায় ভিন্ন বিকাশিত হইতে পারে না। নগেন্দ্রনাথ, সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন, জানিলেন রোগগ্রস্ত হইয়া সূর্য্যমুখী এক বৈষ্ণবীর গৃহে বাস করিতেছিলেন, তথায় গৃহদাহে তাঁহার প্রাণনষ্ট হইয়াছে। সূর্য্যমুখীর অভাবে গৃহস্থাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা মিটিল, সে আশ্রমের নিকট বিদায় লইবার জন্য দেশে প্রত্যাগমন করিয়া যে গৃহে, যে পর্য্যঙ্কে, সূর্য্যমুখীর সহিত একত্রে শয়ন করিতেন, জন্মের শোধ একবার সেই শয্যায় শয়ন করিবেন বলিয়া,

শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন; সূর্য্যমুখীর জন্য কত কাঁদিলেন, দেয়ালে সূর্য্যমুখীর স্বহস্তের লেখা ছিল তাহা কতবার পড়িলেন, পরে দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ দেখিয়া শয়ন করিতে গেলেন। সেই সময়ে প্রবলবেগে ঝটিকা ধাবিত হওয়ায় "শূন্যতৈল দীপ প্রায় নির্ব্বাণ হইল—অল্পমাত্র খদ্যোতের ন্যায় আলো রহিল। সেই অন্ধকারতুল্য আলোতে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল। ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে চমকিত হইয়া খাটের পাশে যে দ্বার মুক্ত ছিল, সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্ত দ্বারপথে, ক্ষীণালোকে এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী, কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কণ্টকিত এবং হস্তপদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীরূপিণী মূর্ত্তি সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে, এ সূর্য্যমুখীর ছায়া, অমনি পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়াপ্রতি ধাবমান হইতে লাগিলেন। ছায়া অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে আলো নিবিল। তখন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।"

কেমন স্বাভাবিক সুন্দরভাবে কবি সূর্য্যমুখীকে নগেন্দ্রের শয্যাগৃহে তাঁহার সমীপে উপনীতা করিলেন। নগেন্দ্র জানেন সূর্য্যমুখী এ পৃথিবীতে নাই, তিনি ছায়ারূপিণীতে তাঁহার অবয়বদর্শনে বিস্মিত হইলেন; শোকে, দুঃখে, চিন্তায়, অনুতাপে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা জন্মিয়াছে, তিনি জ্ঞান হারাইলেন। কেবল সূর্য্যমুখীই এখন তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূতা, তিনি আরও প্রকৃষ্টরূপে, নূতন ভাবে, সে চিন্তার স্রোতে মিশিয়া গেলেন। অথচ অন্য দিকে নগেন্দ্রের ধারণা সূর্য্যমুখী মরিয়াছেন। "যখন নগেন্দ্রের চৈতন্যপ্রাপ্তি হইল, তখনও শয্যাগৃহে নিবিড়ান্ধকার। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা পুনঃ সঞ্চিত হইতে লাগিল। যখন মূর্চ্ছার কথা সকল স্মরণ হইল, বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহার

শিরোদেশে উপাধান কোথা হইতে আসিল? আবার এক সন্দেহ—এ কি বালিশ? বালিশ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—এত বালিশ নহে। কোন মনুষ্যের উরুদেশ। কোমলতায় বোধ হইল, স্ত্রীলোকের উরুদেশ। কে আসিয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার মাথা তুলিয়া উরুতে রাখিয়াছে? একি কুন্দনন্দিনী? সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?' তখন শিরোরক্ষাকারিণী কোন উত্তর দিল না—কেবল দুই তিন বিন্দু উষ্ণবারি নগেন্দ্রের কপোলদেশে পড়িল। নগেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, যেই হউক, সে কাঁদিতেছে। উত্তর না পাইয়া নগেন্দ্র তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন। তখন অকস্মাৎ নগেন্দ্র বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন। তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল তিনি নিশ্চেষ্ট জড়ের মত ক্ষণকাল পড়িয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে রমণীর উরুদেশ হইতে মাথা তুলিয়া রাখিলেন।"

সূর্য্যমুখীর সহিত পুনরায় সংসারাশ্রমে বাসের আজ্ঞা নগেন্দ্রের ছিল না, কেননা তাঁহার ধারণা সূর্য্যমুখী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আশার সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাও তিরোহিত হইয়াছিল; কারণ আশার অবিদ্যমানে আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল অতঃপর নগেন্দ্রের ব্যবহার এবং সূর্য্যমুখী সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে সে আকাঙ্ক্ষার কিয়ৎপরিমাণ সঞ্চার আবশ্যক। আবার কৌশলে নগেন্দ্রের প্রকৃত হৃদয় দেখাইয়া সূর্য্যমুখীর মন স্বামীর ভালবাসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহবিরহিত করাও প্রয়োজন। কবি যে কৌশলে এ উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচায়ক। গৃহমধ্যে এখন অল্প অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে, "নগেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে, রমণী গাত্রোত্থান করিল—ধীরে ধীরে ধীরে দ্বারোদ্দেশে চলিল। নগেন্দ্র তখন অনুভব করিলেন, এ ত কুন্দনন্দিনী নহে।

তখন এমন আলো নাই যে, মানুষ চিনিতে পারা যায়; কিন্তু আকার ও ভঙ্গী কতক কতক উপলব্ধ হইল। আকার ও ভঙ্গী নগেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল বিলক্ষণ করিয়া দেখিলেন; দেখিয়া সেই দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলেন। কাতরস্বরে অশ্রুপরিপূর্ণ লোচনে বলিলেন,

"দেবীই হও, আর মানুষই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও; নচেৎ আমি মরিব।"

"রমণী কি বলিল, কপালদোষে নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কথার শব্দ যেমন নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তিনি তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোককে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। কিন্তু তখন মন ও শরীর দুই মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে—পুনর্ব্বার বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ সেই মোহিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন, আর কথা কহিলেন না।

"রমণী আবার উরুদেশে মস্তক তুলিয়া লইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন নগেন্দ্র মোহ বা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দিনোদয় হইয়াছে। গৃহমধ্যে আলো, গৃহপার্শ্বে উদ্যানমধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষিগণ কলরব করিতেছে; শিরঃস্থ আলোকপন্থা হইতে বালসূর্য্যের কিরণ গৃহমধ্যে পতিত হইতেছে। তখন নগেন্দ্র দেখিলেন, কাহার উরুদেশে তাঁহার মস্তক রহিয়াছে। চক্ষু না চাহিয়া বলিলেন—'কুন্দ তুমি কখন আসিলে? আমি আজ সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিতেছিলাম সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে তবে কি সুখ হইত।" রমণী বলিল, "সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে যদি তুমি অত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম।"

স্বামিপ্রেমে সূর্য্যমুখীর বিশ্বাসের মাত্রা আরও চড়ান চাই; সে বিশ্বাসে বিন্দুমাত্রও অভাবের ভাব না থাকিতে পারে, তাই নগেন্দ্র

চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন, চক্ষু মুছিয়া মুছিয়া চাহিলেন, পুনশ্চ মুখাবনত করিয়া মৃদুস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—"আমি কি পাগল হইলাম—না, সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!"

ইহার পর সূর্য্যমুখীর হৃদয় খুলিয়া না দেখাইলে, এ চিত্র সম্পূর্ণ হয় না; তাই সূর্য্যমুখী, ভূপতিত রোরুদ্যমান নগেন্দ্রনাথের চরণযুগল ধরিয়া, সে চরণযুগলে মুখাবৃত করিয়া তাহা অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া, বলিতে লাগিলেন,—"উঠ, উঠ! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ পাইয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।"

যাহা গিয়াছিল তাহা যে সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিল, সূর্য্যমুখী যাহা ছিলেন আবার যে সম্পূর্ণভাবে তাহাই হইলেন, কেবল বাহিরে নহে, অন্তরে বরং অধিকতর পরিমাণে, তাহা ব্যথার মাত্রা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অবশেষে কবি সূর্য্যমুখীকে দিয়া বলাইতেছেন,—"এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভালবাস না—তুমি আমার গায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।"

সূর্য্যমুখী কি পরিমাণে পূর্ব্ব বিশ্বাস ও পূর্ব্ব প্রকৃতিতে সংস্থাপিত হইয়াছেন, হৃদয় হইতে সকল মুছিয়া গিয়া কিরূপ সরলতা উপজীত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী হইতে পারে না। ভাষায় মনুষ্যহৃদয় চিত্রিত করিবার এরূপ ক্ষমতা অল্প লেখকেরই লক্ষিত হয়।

ষ্টোরেজ ব্যাটারি।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল স্বচলযান (automobile) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দুই প্রকার—একটি বাষ্প চালিত, অপরটি বিদ্যুত চালিত। শেষোক্ত যানের শক্তি বিদ্যুত হইতে প্রাপ্ত এবং এই শক্তি সংরক্ষণ জন্য যে ব্যাটারি ব্যবহৃত হয় তাহাকে ষ্টোরেজ (storage) ব্যাটারি বলে। এই ব্যাটারিতে প্রথমে তাড়িত প্রবাহ দ্বারা বিদ্যুত সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, পরে প্রয়োজন অনুসারে সেই সঞ্চিত তাড়িত শক্তি ব্যবহার করা হয়। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে প্রথমে প্ল্যান্টে ইহা আবিষ্কার করেন। কতকগুলি সীসার চতুষ্কোণ চাদর একটি কাচের কিম্বা এবোনাইট বাক্সে রাখিয়া তাহাতে তাড়িত প্রবাহ প্রেরণ করা হয়, ইহাতে সীসার অবস্থার রূপান্তর হয়। যে গুলি positive poleএর সহিত সংযুক্ত থাকে তাহাদের উপর সীসা অক্সাইড্ জমে ও negative poleএ সংযুক্ত চাদরগুলিতে spongy lead জমিয়া যায়, পুনরায় ঐ রূপান্তরিত দুই প্রকার চাদরের সীসা একত্রিত করিলে তাড়িত প্রবাহ পাওয়া যায়। এইরূপে বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণে তাড়িত শক্তি সঞ্চয় করা যায় ও আশ্লেষণ দ্বারা তাড়িত প্রবাহরূপে পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত অনেকেই এই ব্যাটারির উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কেহই সীসা ও গন্ধক দ্রাবক ভিন্ন অন্য কোনও উপাদান ব্যবহার করেন নাই। সীসা ব্যাটারির দোষ অনেক। প্রথমতঃ অত্যন্ত ভারি, ও দ্রাবকের দুর্গন্ধময় বাষ্প উঠে; দ্বিতীয়তঃ ইহা অত্যন্ত সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়; এমন কি অধিক-পরিমাণে তাড়িত সঞ্চয় কিম্বা ব্যয় করিলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়; তৃতীয়তঃ ইহার দাম অত্যন্ত অধিক! কিন্তু এই সমস্ত দোষ সত্ত্বেও ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রথমোক্ত দোষের জন্য ইহা বৈদ্যুতিক যানে

ব্যবহারের অন্তরায় হইয়াছে,—কারণ সচরাচর ১০০০ হইতে ১২০০ পাউণ্ড ওজনের ব্যাটারি এক একটি যানে ব্যবহৃত হয় এবং গন্ধক দ্রাবকের বাষ্পে যানের ধাতব অংশগুলি শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আজকালের বৈজ্ঞানিকগণের মত যে যদি কোন প্রকার লঘু, স্থায়ী ও সস্তা ষ্টোরেজ ব্যাটারি আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতের যান বিদ্যুত দ্বারা চালিত হইবে। এই অভাব মোচন করিবার জন্য এডিসন্ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা কয়েক মাসের মধ্যে নূতন ষ্টোরেজ ব্যাটারি আবিষ্কার করিয়াছেন। সীসা ষ্টোরেজ ব্যাটারির যত দোষ ছিল এই নূতন ব্যাটারি তাহা দূর করিয়াছে। ইহাতে সীসার পরিবর্ত্তে লৌহ ও নিকেল অক্সাইড্ এবং গন্ধক দ্রাবকের পরিবর্ত্তে কষ্টিক্ পটাশ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে গন্ধক দ্রাবকের বাষ্পের মত কোনরূপ দুর্গন্ধময় অপকারজনক বাষ্প বাহির হয় না, বর্ত্তমান সীসা ব্যাটারির ওজনের এই ব্যাটারির তেজ তিন গুণ অধিক, ইহা লঘু এবং ইহাতে তাড়িত অধিক সঞ্চয় কিম্বা ব্যয় করিলে ও অপব্যবহার করিলে নষ্ট হয় না। এই সমস্ত গুণের জন্য এই ব্যাটারি বিদ্যুত চালিত যানে ব্যবহার করিবার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। নিউইয়র্ক সহরের বৈদ্যুতিক যানের ব্যাটারির ওজন ১০০০ হইতে ১২০০ পাউণ্ড এবং একবার তাড়িত সঞ্চয় (charge) করিলে ৩০ মাইলের অধিক যাইতে পারে না। কিন্তু ঐ ওজনের নূতন ব্যাটারি ব্যবহার করিলে উহার তিনগুণ পথ অনায়াসে যাইতে পারা যায়। এডিসন বলেন যে, ইহার দাম সীসা ব্যাটারি অপেক্ষা অনেক কম হইবে।

এই নূতন ব্যাটারি আবিষ্কারে আমাদের দৈনিক ভারবাহী গো ও অশ্ব শকটের স্থান বৈদ্যুতিক যান যে শীঘ্র অধিকার করিবে তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক যান ধনীর খেলার সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার

ব্যাটারির অত্যধিক ভার আমাদের কর্ম্মের উপযোগিতার অন্তরায় হইয়াছে। এক্ষণে যদি এই নূতন ব্যাটারিসজ্জিত বৈদ্যুতিক যানের প্রচলন হয় তাহা হইলে শুধু যে ভারক্লিষ্ট গো ও অশ্বগণের শ্রমের লাঘব হইবে তাহা নহে, ব্যয়ের শাশ্রয় হইবে এবং রাস্তা পরিষ্কার থাকিবে ও ক্ষয় কম হইবে, কারণ অশ্ব-খুর ও চাকার লৌহে উহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়; আর একটি কথা এরূপ দ্রুতগামী যান হইলে রাস্তায় জনতাও অনেক অংশে কমিবে। কেবল স্থলযানের কেন, জলযানেরও অনেক উন্নতি সাধনের বিশেষ সম্ভাবনা। অতঃপর আর জোয়ার ভাটা ও বাতাসের অথবা দাঁড়ি মাঝির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। এক্ষণে এই নূতন ব্যাটারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আশানুযায়ী ফল দিলে আমরা এডিসনের নিকট আরও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইব।

"স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু।"

সে দিন সমস্ত সন্ধ্যা ধরিয়া পশ্চিমাকাশে সূর্য্যাস্তের নিঃশব্দ আয়োজন অবলোকন করিতেছিলাম। দেখিলাম অন্তহীন অম্বরসাগরে তাম্ররুচি অরুণতরণী মৃদুমন্থরে ভাসিতে ভাসিতে দিগন্তোপকূলের জবনিকান্তরালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

হাতে কিছু কাজ ছিল না। যে পুস্তকখানি সারা মধ্যাহ্ন ধরিয়া পাঠ করিতেছিলাম, তাহার শেষের কয়েকখানি পাতা না থাকাতে অকস্মাৎ তাহাকে ৫॥০টা বাজিবার পূর্ব্বেই শেষ হইতে হইল। দুই

একবার এদিক ওদিক উল্টাইয়া দেখিলাম, যদি কোথাও বিচ্ছিন্ন অংশটি রক্ষিত থাকে তাহার সন্ধান মিলিল না। কাজেই নিরুৎসাহে পুস্তক বন্ধ করিতে হইল। পুস্তক বন্ধ করিলাম, কিন্তু ঐরূপ ইচ্ছানুযায়ী সফলতা ত আর সকল বিষয়ে মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাই অসমাপ্ত অধ্যায় অনায়াসেই সমাপ্তি লাভ করিল বটে, কিন্তু নূতন করিয়া চিন্তার অধ্যায় তাহার সঙ্কীর্ণ-অসঙ্কীর্ণ কত গোপন রহস্য উন্মুক্ত করিয়া দিল।

মুক্ত ছাদের উপর ইজি চেয়ারে শুইয়া, পশ্চিমাকাশে সূর্য্যাস্তের রক্তিমসৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলাম এইরূপ কত জীবন অধ্যায় অসম্পূর্ণ ভাবেই চিরসমাপ্তি লাভ করিতেছে! কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে জীবনের উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষার সীমা ইত্যাদি শত রহস্য তাহাদের বিস্ময়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল; জন্ম, মৃত্যু তাহাদের চিরকালের অন্ধ জটিল সমস্যা লইয়া উপস্থিত হইল।

ভাবিতে ভাবিতে ভাবিতে—কোথায় গিয়া পড়িলাম, শেষে আর কিছু বুঝিবার ক্ষমতা রহিল না। * * *

স্বপ্নের ন্যায় আমার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া কত শত চিত্র ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

* * কমল, তুমি হাসিলে কেন? তোমার হাসি সব সময় আমার ভাল লাগে না; তোমার পায়ে পড়ি, বল তুমি হাসিবে না। * * না; আমি সে গল্প আর বলিতে পারিব না! কিছুতেই না। একবার কেন, দুইবার ত তোমাকে তাহা শুনাইয়াছি; তোমাকে কিছু গোপন করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাই শুনাইয়াছি; নতুবা তোমাকেও তাহা বলিতাম না। তুমি শুনিয়া আমোদ পাও, কিন্তু আমার যে কি হয় তাহা তুমি জাননা।—কথা কহিতেছ না যে, রাগ করিলে?—তুমি কি নিষ্ঠুর!

আচ্ছা বলিব; কিন্তু তার আগে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আর দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহিবে না।

না,—আমি কোন কথাই গোপন করিব না, তুমি আর একটু সরে' এস। কৈ, দাও তোমার হাত আমার হাতে দাও, কথা কহিও না, শুন—

উপরি উপরি—দুইবার এণ্ট্রান্সে ফেল হওয়াতে, জেনারেল লাইনে আমার সাফল্য সম্বন্ধে আমার পিতা নিরাশ হইলেন। এক বিষয়ে অকৃতকার্য্যতা বিষয়ান্তরে নিষ্ফলতার কারণ নহে; তাই জেনারেল লাইন ছাড়িয়া, আর্টলাইনে নূতন করিয়া ভাগ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কি ভাবিয়া বাবা আমাকে চিত্র-বিদ্যা শিখিতে দিলেন জানিনা, তবে আমার হাতের লেখা নেহাৎ মন্দ ছিল না। বাবা হয় ত আমার হস্তাক্ষরে চিত্রকলার গুপ্তবীজ লুক্কায়িত দেখিয়াছিলেন, কিম্বা হয় ত আমার জ্যামিতির খাতায় প্রতিজ্ঞার পরিবর্ত্তে মল্লিখিত মনুষ্যমুণ্ড বা হস্তিশুণ্ড দেখিয়া তিনি সে প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন।

আমার তরফ হইতে আমি এই কথা মাত্র বলিতে পারি যে, আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত যে কোন পথ অবলম্বনই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলাম। আর কাগজ পেন্সিল লইয়া আঁচড় কাটাটা নিতান্ত মন্দও লাগিত না।

সৌভাগ্যক্রমে কি দুর্ভাগ্যক্রমে বলিতে পারি না * * র আর্ট গেলারির প্রধান শিক্ষকের সহিত বহুদিন হইতে বাবার একটু সৌহার্দ্দ ছিল। বোধ হয় আমাকে চিত্র শিখিতে অত শীঘ্র পাঠাইবার উহাও একটা গৌণ কারণ হইবে।

সেখানে কোন আত্মীয় বন্ধু না থাকাতে বাবা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়া তাঁহারই গৃহে আমাকে রাখার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমটা আমি যেন একটু দমিয়া গেলাম; কিন্তু বাবা যখন

বারবার বলিলেন Messer Bardo ইটালীয়ান হইলেও ইংরাজি অভিজ্ঞ এবং আচার ব্যবহারে অনেকটা এদেশী ধরণের,—অতি অমায়িক লোক ;—তোর সেখানে কোন প্রকার অসুবিধা হইতে দিবেন না। তখন অনেক কষ্টে মনকে কতক রাজি করিলাম। আর, না করিয়াই বা করি কি ? অন্যায় আবদারের বয়স ছিল না—আমি সেবার ১৯ বৎসরে পড়িয়াছি।

জিনিষপত্র গুছাইয়া যথাসময়ে বাবার সঙ্গে * যাত্রা করিলাম। বাবার সহিত M.Bardoর ব্যবহারে যেন কিছু বিস্মিত হইলাম। মনে একটু ভরসা জন্মিল। অবশেষে বাবা বিদায় গ্রহণ করিলে, আমার সহিত তাঁহার আলাপের পালা পড়িল। দেখিলাম, তিনি যেন অনেকটা ঘরের লোকেরই মত। কোন প্রকার বাহুল্য বাড়াবাড়ি নাই, অথচ অনুগ্রহ যত্নেরও কিছু ত্রুটি দেখিলাম না। ভাবিলাম নিতান্ত জঙ্গলে পড়ি নাই।

আমি যতক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলাম—দুইটি বালক দরজার পাশ হইতে সকৌতুকে আমাকে লক্ষ্য করিতেছিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম—তাহারা তাঁহারই সন্তান।

তিনি তাহাদের আমার নিকট বসিতে বলিয়া উঠিয়া গেলেন। বড়টি ধীরে ধীরে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ছোটটি ভয়ে প্রথমে ছুটিয়া পলাইয়া গেল, এবং একটু পরেই, তখনি, দেখি দৌড়িয়া আসিয়া বড়র হাত ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।

দুইটির বেশভূষা প্রায় একই রকম। ঢিলা সাদা পায়জামা পরনে ; গায়ে রেসমের ডোরা দেওয়া ঢোলা জ্যাকেট মত, হাত পা নগ্ন। বয়স তাহাদের যথাক্রমে ১৩ ও ১০ আন্দাজ হইবে। উভয়েই ইংরাজি পড়ে এবং ইতিমধ্যে ৪।৫ খানি বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। দেখিলাম ইংরাজি আমার চেয়ে ঢের ভাল বলিতে পারে। আমি তাহাদের বসিতে

বলিলে তাহারা বসিল না। আমি একটু ঘনিষ্ঠ হইবার মৎলবে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা তোমাদের নাম কি ?—তোমাদের ভা'য়ে ভা'য়ে কেমন ভাব ?

ছোটটি অমনি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—ও আমার ভাই নয়—দিদি ; ওর নাম Romola আমার নাম Nello ; বাড়ীতে আমাদের মলি ও নেলি বলিয়া ডাকে।

আমি ত একেবারে অবাক ! মলি বালিকা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তার মুখের ভাব যে ঠিক বালকের মত !

চুল বেশী লম্বা নহে। কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম স্তবকে স্তবকে আসিয়া, মুখ-চোখের উপর অবারিত ভাবে পড়িয়াছে ; বড় বড় নীলোজ্জ্বল তারা-বিশিষ্ট চক্ষু। মুখখানি যেন একটি পরিপুষ্ট আপেলের মত। অবয়ব সকল এরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত যে কোথাও একটুকু টোল খায় নাই। দেহের কমনীয়তা যেন কিছু অল্প—দেহ পাষাণ-প্রতিমার মত, রং অতি সুন্দর—প্রায় দুগ্ধশুভ্র বলিলেই হয়।

আমি জীবনে অমন বালিকা দেখি নাই।

* * * *

বড় যত্নে ছিলাম। ইতিমধ্যে আমি ভর্ত্তি হইলাম। M. Bardoর সঙ্গে আর্ট গেলারি দেখিয়া আসিলাম। দেখিবার জিনিষ বটে। না দেখিলে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী রমণীয় চিত্রগৃহ। প্রকৃষ্টপরিসর হলে বিচিত্রসজ্জিত চিত্রাবলী। কোনটি রাফেল্, কোনটি টারনার, কোনটি টিসিয়ান—জগতের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীদিগের অতুলনীয় রচনানিচয়। চিত্রে সজীব মনোভাব ও সহজ প্রকৃতি প্রতিভাত। চারিপার্শ্বে ও উদ্যানে খ্যাতনামা ভাস্কর-দিগের রচিত প্রস্তরমূর্ত্তি।

ক্রমে একবৎসর অতীত হইল। আমি মনোযোগসহকারে শিক্ষা

করিতে লাগিলাম। চিত্রে আমার আনন্দ জন্মিল। কালেজে রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোকে আমাদের কাজ করিতে হইত।

সেই সময়ে পিতা আমাকে একবার দেখিতে আসিয়াছিলেন—মনে আছে, M. Bardo আমার কত প্রশংসাই করিলেন। সেই দুটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমার বড় ভাব। তাহারা প্রায় আমার নিত্যসঙ্গী ছিল বলিলেই হয়। M. Bardo এবং তাঁহার পত্নী আমাদের ছেলে-খেলা দেখিয়া হাসিতেন। বাস্তবিকই তাহারা আমাকে বড় ভাল বাসিত এবং আমার একান্ত বশ হইয়াছিল,—উভয়েই আমার কাছে পড়িত।

মলি আমাকে দেখিলেই ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিত এবং আনন্দে একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। কখনও মার কাছ হইতে আঙুর ও পিচের সরবৎ, কখন পিঠে, কখন ফল, যখন তখন, সময়ে অসময়ে আনিয়া উপস্থিত করিত। কখন বাগান হইতে ফুল আনিয়া আমাকে উপহার দিত।

দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমার সেবার সেকেণ্ড ইয়ার;—মনে আছে—পূজার পরেই পরীক্ষা। এ দুই বৎসর ছুটীতে বাড়ী গিয়াছিলাম, কিন্তু সেবার যাওয়া হইল না। পূজার কয় দিন বড় কষ্টে গেল—সে কয়দিন বিমর্ষভাবে কাটাইলাম। মলি কিন্তু আমাকে কিছুতেই বিমর্ষ থাকিতে দিবেনা। সে আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিত;—আমি কেন গম্ভীর, আমার মন কেমন করিতেছে ইত্যাদি। বাস্তবিক বালিকাকে আমি ভাল বাসিতাম। বালিকা আবদার করিত, অভিমান করিত, আমি সহ্য করিতাম। রাগ হইলে—যখন তখন অকারণেই সে রাগ হইত,—আমার কাছে আসিত না, আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করিত; আমি চুপ করিয়া থাকিতাম, অবশেষে সে আপনি আসিয়া ক্ষমা চাহিত। আর আমি তাহাকে ছবি আঁকিয়া দিতাম—সে মহা খুসী হইত!

—মনে আছে, একদিন তাহারই একখানি ছবি আঁকিতেছিলাম। মলি তখন ধীরে ধীরে আমার পিছনে আসিয়া খপ্ করিয়া আমার চোখ দুটি তাহার ছোট দুইখানি হাতে ঝাঁপিয়া ধরিল। যদিও সেই মুহূর্ত্তেই আমার বুঝিতে বাকি রহিল না—এ কোন আবরণ, যাহা ঘনীভূত অমিয়কণারচিত স্নিগ্ধকোমল মেঘের মত ক্ষণিকের মধ্যে আমার তারা দুটি আঁধার করিয়া দিল, তবুও যেন জানিতে পারি নাই ভাণ করিয়া রহিলাম। সেই একমুহূর্ত্তে কত কথাই ভাবিয়া লইলাম! ভাবিলাম, এমন অন্ধতা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? ভাবিলাম, বিধাতা আমাকে অন্ধ করুন, কিন্তু এই কুসুমপেলব স্পর্শ হইতে বঞ্চিত না করুন। এ স্পর্শ ভাল করিয়া অনুভব করিতে হইলে, চক্ষু ত স্বভাবতই মুদিয়া আসিবে। কিছুক্ষণ পরে বলিলাম—না আমি চিনিতে পারিলাম না। আমার চোখ ঢাকা, চিনিব কি করিয়া?—বালিকাও কি তাহাই বুঝিল? কেমন করিয়া বলিব? হয়ত কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া সে চোখ ছাড়িয়া দিল। না, বোধ হয় তাহার চোখ আমার অর্দ্ধলিখিত চিত্রের দিকে পড়িয়াছিল, তাই চট্ করিয়া সেখানি তুলিয়া লইয়া বলিল, আমার ছবি কেন আঁকিতেছেন? আমার ছবি আমি আপনাকে আঁকিতে দিব না,—আমি এখুনি ইহা ছিঁড়িয়া ফেলিব। বলিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, আচ্ছা আগে শেষ করি, তার পর তুমি ছিঁড়িও। কিন্তু সে তাহা বুঝিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। আমি নির্ব্বুদ্ধি হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। বুঝিতে পারিলাম না বালিকা কাঁদিল কেন,—সে এমনি দুর্ব্বোধ! বলিলাম, আর একটু বাকী আছে; এখনি শেষ করিয়া দিতেছি। সে কিছুতেই শুনিল না তাহার অর্দ্ধাঙ্কিত চিত্র আমাকে শেষ করিতে দিল না; তাহাই লইয়া ছুটিয়া পলাইল। বুঝাইলে বুঝে না—সে এমনি নির্ব্বোধ!

পরীক্ষায় আমি তৃতীয় হইলাম। আর্ট কালেজের আমি একজন ভাল ছাত্র।

মলির বয়স যখন পনেরা উত্তীর্ণ হইয়া ষোলয় পড়িল, সে যেন হঠাৎ কিছু বদলাইয়া গেল। সে মুখে আর হাসির তেমন বিদ্যুৎ খেলিত না। কারণে অকারণে, সময়ে অসময়ে, যে মুখে 'হাস্য অমৃতের সিন্ধু' সদাই উছলিয়া পড়িত, সে মুখে এখন গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িতে লাগিল; সে সদা প্রফুল্ল বদনে ব্রীড়ার সঞ্চার দেখা গেল; পূর্ব্বের সে চপলতা—সে চাঞ্চল্য সহসা লয় পাইতে আরম্ভ হইল; গতি ত্বরিত হইতে মন্থর হইল; দৃষ্টি সরল হইতে অবনত হইল; কথা কহিতে হইলে আর মুখের দিকে চাহিতে পারে না—মাটীর দিকে চাহিয়া বলে। বুঝা গেল তাহার জীবন নদীতে যৌবনের বাণ ডাকিয়াছে। ধীরে ধীরে, দিনের পর দিন, অল্পে অল্পে Romola কুসুম আমার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভিন্ন হইতে লাগিল। বিমুগ্ধ চিত্রকর যেমন স্বকৃত চিত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, আমিও সেইরূপ সেই যৌবনচিত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতাম না। আমিই যেন তাহার যৌবনকে প্রথম আবিষ্কার করিলাম!

কিন্তু সহসা একি শুনিলাম,—জনৈক ইউরোপীয় অধ্যাপকের সহিত মলির বিবাহের কথা চলিতেছে! শুনিয়া আমার বুকের মধ্যে যেন ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল। তাহার বয়স হইয়াছে—বিবাহ হইবে; সে ইটালীয়, আমি বাঙ্গালী—তাহার সহিত আমার—যাক্—ভাবিয়া দেখিতে গেলে ইহাতে আঘাত পাইবার কিছুই ছিল না, কিন্তু সব বিষয়ে কিছু আর যুক্তিশাস্ত্রের প্রমাণ দেখান যায় না। আমার আঘাতেরও আমি কিছু কারণ দেখাইতে পারিব না। আমি যে আঘাত পাইলাম, জগতে একজন ছাড়া আর কেহ তাহা বুঝিবে না।

মলি যেন তাহার পর একটু গম্ভীর, একটু বিমর্ষ হইয়া গেল।

সন্দেহ হইল, আমারই ভুল হইতেছে। আমার নিজের মনের ভাব তাহাতে আরোপিত করিতেছি। কালিদাসের শকুন্তলার সেই "চেষ্টা-প্রতিরূপিকা কামিজনমনোবৃত্তি"র কথা মনে পড়িল।

যখন বিবাহ হয়, তখন আমি পরীক্ষার পর ছুটীতে বাড়ীতে ছিলাম। মনে আছে চিঠি পাইলাম, M. Bardo নিমন্ত্রণের পত্র দিয়াছেন। আবার খবর পাইলাম, বিবাহ নিরাপদে সমাধা হইয়া গেল। Prof. Rumoর সহিত Romola de' Bardiর Pink Satin ও Orange silk পরিয়া অমুক চার্চ্চে অমুক Priestএর সার্ভিসে—ceremony সুসম্পন্ন হইয়া গেল, কাগজে তাহার full রিপোর্ট পড়িলাম।

সে বিবাহে কি উপহার দিব?—আমার হাতের সেই অঙ্গুরীয়টি, যাহা মলি কতদিন আমার হাত হইতে খুলিয়া নিজের অঙ্গুলিতে পরিত, আবার হাসিতে হাসিতে আমার হাতে পরাইয়া দিত, সেই অঙ্গুরীয়-টিকে নূতন করিয়া ঝালাইয়া পাঠাইয়া দিলাম—লিখিয়া দিলাম—দরিদ্র বন্ধুর স্নেহ-উপহার!

যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া উপহারটি পাঠাইয়া দিলাম, তাহাতে যে কেবল প্রিয়জনের প্রতি আন্তরিক সহৃদয়তা এবং স্নেহ-গৌরব ছিল, তাহা নহে,—তাহাতে মর্ম্মান্তিক অভিমানের একটি গোপন জ্বালাও ছিল। বাড়ীতে আঙ্গুটির কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম,—হারাইয়া ফেলি-য়াছি; কিন্তু কোথায় হারাইয়াছি, তাহা আর কেহ জানিতে পারিল না।

দুই মাস পরে ফিরিয়া গিয়া শুনিলাম—Honeymoon কাটাইয়া মলি ফিরিয়া আসিয়াছে। কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে Prof. Rumoকে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছে।

এ গিয়া মলি অসুখ লইয়া আসিয়াছে। প্রায় মাস খানেক হইতে ভুগিতেছে। কিছুতেই কিছু ফল হইতেছে না—রোগ ক্রমশই বাড়িতেছে।

সেদিন দেখা হইল না। পরদিন কালেজ হইতে আসিয়া শুনিলাম —অসুখ বাড়িয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ উপরে গেলাম। দেখিলাম মলি তাহার মার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে একটু যেন চকিত হইয়া উঠিল এবং ইঙ্গিতে পাশে বসিতে বলিল। Mme. Bardo আমাকে বসিতে বলিয়া কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন। আমি আর্দ্র হৃদয়ে রোগীর শয্যাপ্রান্তে বসিলাম। হঠাৎ তাহার রোগশীর্ণ তপ্ত হাতখানি আমার হাতের মধ্যে, ত্রস্ত-পক্ষিশাবক যেমন করিয়া তাহার নিরাপদ নীড়টির মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি করিয়া আশ্রয় লাভ করিল—তেমনি কোমল, তেমনি তপ্ত, তেমনি কম্পিতকাতর। সহসা তাহার অঙ্গুরীয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শীর্ণ-শুষ্ক-অঙ্গুলিতে স্বর্ণ অঙ্গুরীয়কটি তাহার শুষ্ক-পাণ্ডু-ওষ্ঠাধরের ম্লান হাসিটির মত বোধ হইল! রোগক্লিষ্ট রিক্তাভরণ তনুদেহটিতে আমারই উপহৃত সেই অঙ্গুরীয়কটি আমারই বিজয় ঘোষণা করিয়া উঠিল। আরো কাছে গেলাম, দেখিলাম বালিকার চক্ষু রক্তবর্ণ; ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। গায়ে হাত দিলাম—বেশ উত্তপ্ত বোধ হইল। কি শুধাইব স্থির করিতে না পারিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, মলি এমন হইলে কেন?

বালিকা একটু হাসিল। শুভ্র-কোমল-গণ্ড দুইটিতে মুহূর্ত্তের জন্য স্বচ্ছবারিরাশিতে সূর্য্যাস্তপ্রতিবিম্বের ন্যায় একটি রক্তিমকান্তি না ফুটিতেই মিলাইয়া গেল। তাহার ছল ছল চক্ষুর নীরব আকুলতা আমার অশ্রুবাষ্পে অস্পষ্ট হইয়া গেল।

চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। ব্যারাম কিছুতেই বাগ মানিল না। ক্রমাগত ডাক্তার পরিবর্ত্তন চলিতে লাগিল;—রোগ ক্রমশই শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। চিকিৎসকগণ আশা ছাড়িয়া দিলেন।

একদিন কালেজ হইতে আসিয়া শুনিলাম অবস্থা ভাল নহে। একবার দেখিয়া আসিলাম—আসিয়া আমার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া

আছি, এমন সময়ে দেখি মলির ভাইটি বড় ব্যাকুলভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, দিদি আপনাকে ডাকিতেছেন।

* * *

মলি আমায় ইঙ্গিত করিয়া কাছে বসিতে বলিল; তার পর আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—দেখিতে দেখিতে সব ফুরাইল।

* এ মলির সমাধি হইয়া গেল। কার্য্যশেষে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা বিষাদভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরিয়া গেল। শুধু আমি তাহার সর্ব্বাপেক্ষা পর অথচ সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখাতুর সেইখানে বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম জানি না। ক্রমে রাত্রি হইল। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল—আমি নির্জ্জন নিস্তব্ধ সমাধিক্ষেত্রে উন্মত্তের মত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

জ্যোৎস্নারাত্রি চন্দ্র-তারকা লইয়া পৃথিবীবিচ্যুত দুইটি প্রাণীর মৃত্যুর পরপারেও মিলনাভিলাষ দেখিয়া হাসিতে লাগিল। আমি নিজের ছায়াটি লইয়া উদ্দেশ্যহীন প্রেতাত্মার মত ফিরিতে লাগিলাম।

চারিদিকে সমাধিস্তম্ভ সকল মস্তক ঊর্দ্ধে তুলিয়া মৃত্যুর চির অনাবিষ্কৃত গোপন রহস্যবারতার সাক্ষ্য দিতে লাগিল। কোনটি ধনীর, কোনটি দরিদ্রের; বাহ্যিক বৈষম্যের নিমিত্ত জানা যায় মাত্র। সকলেই যেন বলিতে লাগিল, দেখ মরিয়া সকলেই সমান। একসঙ্গে পাশাপাশি অনন্তের রাজ্যে আমরা বাস করিতেছি। তোমরা ক্ষুদ্র, তোমরা ক্ষণস্থায়ী, জগতের তুচ্ছ দিন কাটাইয়া আমাদের রাজ্যে আইস—আমরা তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছি।

অনেকগুলিরই খোদিত লেখা অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কতকগুলির একেবারেই পড়া যায় না; কোনটি বা কষ্টে পড়া যায়। কতকগুলির পাশ দিয়া আইভি লতা উঠিয়া অনেকটা পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া আছে। একটি সামান্য স্তম্ভের লেখা পড়িলাম। লেখা আছে:—

"সখা হে আমার লাগি কেঁদোনা বৃথায়।
মরি নাই আমি বন্ধু, নিদ্রিত হেথায়॥"

পড়িবামাত্র আমার বুকে ধক্ করিয়া আর একটা ঘা লাগিল। বিমুগ্ধের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায়, ঘূর্ণার ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম ;—দেখিলাম উদ্যানের একধারে কতকগুলি বড় বড় গাছ—উইলো, মার্টল, সাইপ্রেস। সেইখানে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার রক্ত হিম হইয়া গেল। বক্ষস্পন্দন বন্দ হইবার যো হইল। বুক ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। যাহা দেখিলাম, তাহার মত বিস্ময়জনক ব্যাপার জীবনে আর কিছু দেখি নাই,—দেখিব না।

রাত্রি তখন কত জানি না। চন্দ্রালোকে দেখিলাম—একটি জীর্ণ প্রস্তরবেদিকা ঘিরিয়া চারিদিকে বড় বড় ঘাস জন্মিয়াছে। একটি ঘন আইভি প্রায় সমস্ত বেদীটিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। আর তাহার পার্শ্বে ও কি!

পার্শ্বে, অতি নিকটে, একটি শ্বেতপ্রস্তররচিত রমণীমূর্ত্তি ঘাসের মধ্যে শয়ান রহিয়াছে! পরিপূর্ণ চন্দ্র-কিরণ তাহার দেহের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কি ভয়ানক, দেখিলাম—রমণীর অবয়ব এবং আকৃতি মলির মত!

আমি পাগল হইলাম নাকি? আমার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি হইল! মোহের ঘোরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম রমলা, মলি তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া গিয়াছিলে। আবার তোমাকে পাইয়াছি—এবার তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। সংসার হইতে পালাইয়াছ—ভালই করিয়াছ। এখানে আর কেহ আমাদের দেখিতে পাইবে না। সংসারের বাহিরে, এই মৃত্যুর রাজ্যে তুমি আমার চিরসঙ্গিনী। এখানে আমাকে আর বঞ্চিত করিও না। আমাকে ধরা দাও—বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে চুম্বন করিলাম। তেমন আশ্চর্য্য আনন্দ আর জীবনে অনুভব করি নাই।

পুলকে আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল। সেই কঠিন পাষাণমূর্ত্তিকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া রহিলাম। হায়, এ কি হইল! মৃত্যুর পরে আমি মলির প্রেমে পাগল হইলাম! জানি না পাষাণ আমার কাছে কেমন করিয়া কোমল হইল! পাষাণ কেমন করিয়া সজীব হইল জানি না। তোমাকে তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব? কিন্তু বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। সেই গভীর রাত্রে, সেই আকাশের চন্দ্রকে সাক্ষী রাখিয়া আমি তাহাকে ভাল বাসিলাম। তাহাকে আমার সুখ-দুঃখের একমাত্র সঙ্গিনী করিয়া তাহাকে আমার জীবন উৎসর্গ করিলাম। হায়, কেন সে রাত্রি আমার অনন্ত বাসর হইল না? কেন প্রভাতসূর্য্য আমার অন্ধ মোহকে জাগাইয়া তুলিল?—বিধাতার বিড়ম্বনা! কিন্তু সেই চুম্বনস্পর্শসুখমদিরা নেশার মত আমার অধরে লাগিয়া আছে। ভাবিতে মাথা ঘুরিয়া উঠিতেছে। আমার দম বন্দ হইতেছে—আমাকে একটু জল দাও।

জল কেন, খাবার দিয়াছি—খাইবে চল। আর, অমন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে কেন,—স্বপ্ন দেখিতেছ নাকি?

ধস্ মস্ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। কমল আবার সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, অমন করিলে কেন—বল না?

ব্যস্তসমস্তে কহিলাম, কৈ, কিছু নয় ত—একটু জল দাও। ভাবিলাম, এ কি, স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, তাই তো!

* * * * *

তাড়াতাড়ি জামাটা খুলিয়া ফেলিলাম—সেটা ঘামে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। পায়ের কাছে দেখি, Heine খানি পড়িয়া রহিয়াছে—সেখানিকে উঠাইয়া লইলাম। ভাবিলাম,—যত নষ্টের গোড়া!

দেখিলাম—"ঝিল্লিরবে তন্দ্রামগ্ন নিশীথিনী"।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

(উপন্যাস।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে বাড়ী আসিলাম। এতদিন পরে বাড়ী আসিয়া মনের বাসনা পরিপূর্ণ করিয়া আমাদের গৃহে গৃহলক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করিলাম। এবং দুই চারি দিনেই বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, হেমকুমারী দেবী—সাক্ষাৎ গৃহের গৃহলক্ষ্মী। এইরূপে আশাতীত সুখে দিনের পর দিন কাটিতে ছিল। অন্যদিকে রাজকুমারী সময়ে অসময়ে—সকল সময়ে আমার সহিত হাসি তামাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কখন হয় ত পান দিবার সময় সুপারীর পরিবর্ত্তে শুষ্ক পেয়ারা কাটিয়া পান দিতেন, আবার কখন জল খাইবার সময় মিছরির পানার পরিবর্ত্তে লবণের অপূর্ব্ব সরবত দিয়া আমাকে তামাসা করিতেন—তামাসার চাল নিত্য নূতন! আমি প্রত্যহই প্রায় সে সব তামাসায় ঠকিতাম, আর ঠকিয়া 'হেরে গিয়ে হেসে চাওয়া' ভাবে বালিকার সেই পবিত্র-সরল-স্নিগ্ধ মুখের পানে চাহিতাম—রাজকুমারীর আহার্য্যে কৃত্রিমতার পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়িলে, বধূঠাকুরাণী আর তাকে খাবারে হাত দিতে দিতেন না—নিজে আমায় খাবারাদি দিতেন। একদিন আমি হাট হইতে বড় পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছি—বধূঠাকুরাণী তখন রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত—আমার আগমন জানিতে পারিয়া—রাজকুমারীকে ডাকিয়া বলিলেন,

ছোট ঠাকুরকে সরবৎ, কেশুর আর সন্দেশ দে; দেখিস্ দুষ্টামি করবি তো মার খাবি! বালিকা গম্ভীর মুখে, রোজ রোজ তামাসা করার বড় গরজ—বলিয়া একটু পরেই আমার জন্য একটা গ্লাসে করিয়া খানিকটা মিছরির পানা—একটা পাথরের বাটীতে বেলের সরবত এবং ক্ষুদ্র একখানি রেকাবে কতকগুলি কেশুর, চিনি ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া আমার নিকট স্থাপন করিয়া হাসিমুখে কহিলেন, বেহাই "জল সেবা স্থান।" আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বালিকার কথায় হাসিয়া জল খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে মিছরির পানা মুখে দিলাম। আজিকার সরবত খাঁটি,—কোন কৃত্রিমতা নাই। একটু সাহস হইল। তার পর সরবতটুকু খেয়ে কেশুরগুলিতে বেশ করিয়া চিনি মাখাইয়া, যেই একখানি মুখে দিয়ে চর্ব্বণ করিলাম, অমনি আমার মুখ চুলকাইয়া উঠিল। মুখের চুলকানিতে আমাকে একটু অস্থির হইতে দেখিয়া রাজকুমারী আপনার স্ফুটনোন্মুখ-বদন-কমল বসনাবৃত করিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। গৃহের নিকটবর্ত্তী কচুবন হইতে একটী ক্ষুদ্র কচুমূল আনিয়া অতীব যত্নের সহিত কেশুরের ন্যায় বিনাইয়া আমার জলখাবার জন্য রাখিয়া ছিলেন। সেদিন বধূঠাকুরাণী রাজকুমারীকে বিশেষরূপে ভর্ৎসনা করিলেন।

আজ দিদির তীব্র তিরস্কারে বালিকা—বালিকাই বল আর কিশোরীই বল, রাজকুমারী অপ্রতিভের মলিন হাসি হাসিয়া ছলছল নেত্রে আমায় কহিলেন "না নরেন বাবু, আজ হ'তে আর আপনার সঙ্গে হাসি তামাসা বিদ্রূপ কিছুই করিব না—আজ দিদির নিকট ত গালি খাইয়াছি—আপনিও খুব বিরক্ত হইয়াছেন! যা হোক এবারের মত আমাকে ক্ষমা করুন বলিয়া বালিকা সেখান হইতে চলিয়া গেল। এইরূপে দিনে দিনে আমাদের উভয়ের ঘনিষ্ঠতা দৃঢ় হইতে চলিল—হাসি তামাসায়

দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু ইহার পরিণাম কি, কে জানে?—কবি বলিয়াছেন,

চন্দ্র অন্তরালে মেঘ, হাসি অন্তরালে অশ্রু,
নিয়ন্তার কি সূক্ষ্ম বিচার!

জানিনা আমার নিয়তিতে কি আছে!

ক্রমশ

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়।

আবাহন।

সে ছিল আরেক দিন এমনি সময়ে;
চিত্ত তার পূর্ণ ছিল সর্ব্ব মহিমায়,
নিখিল সুষমারাশি তাহার হৃদয়ে
লভিত মিলন আসি' সুন্দর শোভায়।
সে দিন বসন্ত ছিল পত্রে পুষ্পে ফলে,
আজিও বসন্ত হাসে ধরার অঞ্চলে;
শুধু নাই সেই শক্তি, যার মন্ত্রবলে
প্রকৃতি-বসন্ত আসি' ফুটে মর্ম্মতলে।
—তাই আজি ডাকি তোমা আকুল অন্তরে,
হে মোর বসন্ত-লক্ষ্মি, প্রিয়চিত্তবনে
ফুটাও কুসুমরাশি; কলকণ্ঠস্বরে
ডাকাও পাপিয়া পিক হৃদয়-নন্দনে।
বিশ্বের বসন্ত আজি তোমারে ডাকিছে
—তুমি না আসিলে যদি, বসন্ত ত মিছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ১৩১০। { ৫ম সংখ্যা।

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

(উপন্যাস।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমোদে আহ্লাদে, হাসি তামাসায়, আমার দিন বড় সুখে কাটিতে লাগিল। রাজকুমারীর সেই সরল হাস্য পরিহাসে আমার দৈনিক জীবন সরস করিয়া তুলিল। রাজকুমারী বড় অদ্ভুত ধরণের মেয়ে, সে আমায় বিবিধ উপায়ে ঠকাইত। কোন দিন হাস্য পরিহাস করিতে করিতে আমায় ঠকাইত—কোনদিন বা এমন গম্ভীরভাব ধারণ করিত যে, সে অবস্থায় কোন প্রকার তামাসা অসম্ভব মনে হইত; কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতাম যে, বড় ঠকানই ঠকাইল! একটি বালিকার নিকট প্রায়ই ঠকিতে হইত ইহা বড় লজ্জার কথা বটে, এবং এ কথা পাঠকসমাজে, বিশেষতঃ পাঠিকামহলে প্রকাশ করা আরও লজ্জার বিষয় তাও জানি; কিন্তু কি করিব কথাটা ঠিক। আর রাজকুমারী যে সব দিনই তার বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে আমায় ঠকাইত তাহাও নহে—আমিও ইচ্ছা করিয়া

অনেকদিন ঠকিতাম। ঠকিতাম তাহার সেই মধুর অধরে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য—ঠকিতাম তাহার সেই বিকচ মুখ-কমলে প্রফুল্ল শোভা দেখিবার জন্য; রাজকুমারীর হাতে ঠকিলে তাহার বড় আনন্দ হইত—সে উচ্চ হাসি হাসিয়া হাততালি দিয়া পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিত! তাহার সেই পুলক-চঞ্চল-দেহে সৌন্দর্য্যের বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত, আমি মুগ্ধ হইতাম—তখন বুঝি নাই যেখানে বিদ্যুৎ বজ্রও সেখানে!

এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। বধূঠাকুরাণী একদিন "রাজকুমারীকে বলিলেন,—"তুই কেবল দুষ্টামি করিয়া দিন কাটাইবি, ছোট ঠাকুরের নিকট একটু আধটু পড় না কেন? বিদ্যা ত পদ্যপাঠের বেশী নাই—এর পরে হয় ত লেখাপড়ার জন্য কত কষ্ট পেতে হবে।" বধূঠাকুরাণীর প্রস্তাব বালিকা প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিল; কিন্তু দিন দুই পরে দেখি, বালিকা সত্য সত্যই আমার ছাত্রী হইল—বালিকার অসাধারণ মেধা দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। দুই মাসেই বালিকা ৪।৫ খানি বই পড়িয়া ফেলিল—এইবার সীতার বনবাসের পালা!

বালিকা আজকাল আর আমায় তামাসা করে না, গুরুশিষ্যা সম্বন্ধ বলিয়া কি?

আরও প্রায় একমাস গেল, বালিকা আর তেমন করিয়া সদা সর্ব্বদা আমার কাছে আসে না—যখন কাছে আসে তখন যেন কত ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা; যে মুখে কথা ফুরাইত না, আমার কাছে আসিলে যে বালিকার মুখে কথার উৎস ছুটিত, সে মুখে এখন আর কথা ফুটে না, বুকের কথা মুখে আসে; কিন্তু এখন আর ফুটে ফুটে ফুটে না। যে হাস্য-লহরীতে গৃহ ঝঙ্কৃত করিত, হাস্যের সে লহরী আর উঠে না—সে হাসি "এখন কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না,"—দেহে আর সে চাপল্য নাই, সব চাপল্য এখন যেন কি জানি কাহার ভয়ে তাহার

চক্ষে আশ্রয় লইয়াছে। তিন মাসে এত পরিবর্ত্তন! আর আমার? আমার কথা আর কি বলিব, দেখিতে দেখিতে আমার এ কি সর্ব্বনাশ হইল, সেই ক্ষুদ্র বালিকার হাতে আমার এত সাধের জীবন তাহার এবং আমার অজ্ঞাতে উৎসর্গ করিলাম! ছি, ছি এ লজ্জার কথা আর কাহাকে বলিব?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তবে কি রাজকুমারীও আমায় ভাল বাসিয়াছে, বুঝি বাসিয়াছে, নহিলে বালিকার সহসা আমার নিকট এ সঙ্কোচ কেন? কেন সে আমায় লুকাইয়া লুকাইয়া দেখে, আবার চারি চক্ষে এক হইবা মাত্র জড় সড় হইয়া সেখান হইতে পলাইয়া যায়! কেন তবে সে "লুকাতে গিয়ে হাসি হাসিয়ে পালায়?" তাহার সে তামাসা বিদ্রূপ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল কেন? আর আমার কাছে তেমন সহজভাবে আসিতে, বসিতে, কথা কহিতে, পড়িতে পারে না কেন? আমার ও রাজকুমারীর মনের ভাব বুঝিতে বধূঠাকুরাণীর বড় বিলম্ব রহিল না—বধূঠাকুরাণী একদিন একসঙ্গে তাঁহার পিতা-মাতা ও ভ্রাতৃবধূকে পত্র লিখিলেন, সে পত্র আমারই হাতে ডাকে দিতে দিয়া বলিলেন—ছোট ঠাকুর ঘটকালি বিদায়ের ব্যবস্থা করিবেন!

সপ্তাহের মধ্যে সে পত্রগুলির উত্তর আসিল, পত্র আসার পর হইতে বধূঠাকুরাণীকে যেন বড় বিষণ্ণ দেখিলাম—আবার তিনি একযোগে তিনখানি চিঠি লিখিলেন—এবার আর পত্রের উত্তর ডাকে আসিল না, বধূঠাকুরাণীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত!

রাজকুমারীর বিবাহ হইবে! এই মাসের শেষেই কোন এক সম্পন্ন ব্যক্তির পুত্রের সহিত না কি রাজকুমারীর সম্বন্ধ পাকাপাকি

হইয়া গিয়াছে, পাত্র পক্ষ হইতে কন্যা আশীর্ব্বাদী করিতে আসিবেন, তাই রাজকুমারীকে এখন পিত্রালয় যাইতে হইতেছে!

রাজকুমারীর বিদায়ের দিন নিকটবর্ত্তী হইল—৪ দিনে এ কি পরিবর্ত্তন—সে বিকচ কমল যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে—সে কার্ত্তিকী রাকা যেন মেঘে ঢাকিয়াছে—সে সদাপ্রফুল্ল মুখে যেন বিষম চিন্তার ছায় পড়িয়াছে!

বালিকা বিদায়ের সময় আমার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল—হাত কি কাঁপিতেছে—ও কি ও আমার পায়ে দু ফোঁটা জল! কোথা হইতে এ জল পড়িল! বালিকার কোমল স্পর্শ যেমন শীতল বোধ হইয়াছিল, এ জল ত তেমন শীতল নহে, এ যে উষ্ণ!"*

নিরাশ প্রণয়ের চিত্র।†

(সমালোচনা)

সমাজতত্ত্ববিদেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে আদিম মানব সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। তখনও মানব-সমাজ

* "পূর্ব্ব-স্মৃতি"র লেখক শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র মৈত্রেয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনীতে এ ভাবে ক্রমশ প্রকাশিত হইলে দুই বৎসরেও শেষ হইবে না। পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইবে। আবার গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিলেও লেখকের প্রতি অন্যায় করা হয়। সেজন্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে অন্য লেখক কর্ত্তৃক ভিন্নভাবে 'পূর্ব্ব-স্মৃতি' লিখিত হইতেছে। প্রথম অংশের সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য পূর্ব্ব-স্মৃতির প্লটের পূর্ব্ব-স্মৃতি, ইহাতে অবশ্য থাকিবে।

† সুকবি ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "যোগেশ"কাব্য। এ প্রবন্ধটী 'প্রদীপে'র

এমন সংহত সমষ্টি আকার ধারণ করে নাই যে উহা গৌরবান্বিত 'সমাজ' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টির সেই তরুণ উষায়, সেই অগঠিত সমাজ-বন্ধনে মানব যথেষ্ট ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে রত থাকিত। স্পেন্সার, ডারউইন্, মুলর্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের এ কথা আমাদের মহাভারতে শ্বেতকেতু ও উদ্দালক প্রভৃতির উপাখ্যানে বিশেষ সমর্থিত হয়। এ বিষয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মতান্তর নাই।

ক্রমে যখন সমাজ বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া উঠিল, সংযম যখন মনুষ্যের অভ্যস্ত হইয়া আসিল, তখন এরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রথা মানুষের সভ্যতর সংযম শাসিত চক্ষে নিতান্ত হেয় বোধ হইতে লাগিল। ফলে, মানব সমাজে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইল। তখন মানুষের প্রেম-বৃত্তি অতি উচ্চ সিংহাসনে স্থাপিত হইল ও সকল দেশের কবিসম্প্রদায় উচ্চকণ্ঠে ইহার অনন্ত বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন; প্রণয় তখন আপনার ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু দেখা গেল যে মানব সমাজ অত্যাচারী অখণ্ড প্রতাপ সম্রাটের মত আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে লাগিল। সকল দম্পতীর বিবাহ-বন্ধন কিছু সুখের ঘটেনা—অনেক স্থলে এরূপ অনীপ্সিত মিলনে অনেক জীবন বিষময় হইয়া উঠিল। অনেকে হয় ত বাল্যপ্রণয়ী, উভয়ে উভয়ের হইবে বহুদিন ধরিয়া হয় ত এই আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিল—নিয়তির প্রতিকূলতায় ও নিষ্ঠুর সমাজ-শাসনে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কে কোথায় গিয়া পড়িল তাহার স্থিরতা রহিল না। যে যাহাকে চাহিল, সে তাহাকে পাইল না। এরূপ অসমবিবাহবন্ধন চিরদুঃখের মূলীভূত কারণ হইয়া দাঁড়াইল। অথচ সমাজের নিকট এই

তদানীন্তন মাননীয় সম্পাদক রামানন্দ বাবুর সম্পাদন কালীন উক্ত পত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়, কিন্তু 'প্রদীপে'র হস্তান্তর হওয়াতে প্রবন্ধটী ফিরাইয়া লওয়া হয়।

হতভাগ্য হতভাগিনীরা কোন প্রতিবিধান পাইল না। সমাজ নিজের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তীব্র ভ্রূকুটীতে এই নিরাশ প্রণয়ীদিগকে নিজভাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে বলিল। সহস্রের মঙ্গলের মন্দিরে একের বলি হইতে লাগিল; কারণ, বহুশতাব্দীর অভিজ্ঞতায় সমাজ জানিয়াছিল যে এরূপ স্থলে প্রতিবিধান করিতে যাওয়া আর ব্যভিচার সমর্থন করা একই। নিরাশ প্রণয়ের সমাজে এরূপ বিচার দেখিয়া অনেক বিরুদ্ধবাদীর আবির্ভাব হইল। ইঁহারা সমাজের এরূপ অবস্থাউত্থিত বিবাহপ্রথা অজ্ঞানতামূলক ও বর্ব্বরোচিত; প্রণয় পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনে যে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা থাকা উচিত ইত্যাদি তত্ত্বপ্রতিপাদনে সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন। ফরাসীবিপ্লবে এই সর্ব্বনাশমূলক সাম্যবাদে ফরাসী সমাজ উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতেছিল—রুশো, ভল্‌তের প্রভৃতি যাহার প্রতিপাদক ও দার্শনিক হইয়াছিলেন, বর্ক প্রভৃতি দূরদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ মনীষিদের অগ্নিময়ী বক্তৃতার বিরুদ্ধবাদে সে স্রোত অনেকটা প্রশমিত হইলেও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। এমন কি সুসভ্য ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আজকালও এ ধুয়ার জের চলিয়াছে ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে তত্তৎ দেশের অনেক শিক্ষিতা মহিলাও এই সর্ব্বনাশিনী রীতির পক্ষপাতিনী হইয়াছেন।

যেথানে এরূপ শোকাবহ বিবাহ-বন্ধন ঘটিয়াছে, সেথানে দুই অবস্থা সম্ভব;—১ম, দম্পতীর মধ্যে উভয়ের ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকা বা তদ্বিপরীত আচরণে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীর বিনাশ। ২য়, সমাজের প্রতিকূলে আবহমানকাল প্রচলিত সমাজনীতির বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হওয়া। সাহিত্যে এজন্যও এরূপ দুই শ্রেণীর লেখক আবির্ভূত হইয়াছেন;—১ম, রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কবি, নাট্যকার বা উপন্যাস লেখকেরা এরূপ অবস্থাগত নায়ক বা নায়িকাকে স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট রাখেন বা অন্যথাচরণে ধ্বংশ পথে প্রেরিত করেন। দ্বিতীয়, উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের

লেখকেরা সমাজের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেন, সমাজনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। প্রথম শ্রেণীর লেখকেরা,—স্কট্, টেনিসন্, জর্জ ইলিয়ট্ ও এদেশে বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকেরা,—বায়রন্, গ্রাণ্ট, আলেন্, ব্যালফুর প্রভৃতি মহামতিগণ প্রথম সম্প্রদায়ের গ্রন্থ, কেম্বিলর্থ, আইভান্ হো, সাইলাস্ মার্ণার, মিল্ অফ্ দি ফ্লস্, ডোরা, লন্সিলট্ ও গুইনিভিয়ার ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতি। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের, ডন্ জুয়ান্ উওম্যান্ হু ডিড Foundation of Belief প্রভৃতি গ্রন্থ এ কথার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজ আমরা প্রথম সম্প্রদায়ের এরূপ একজন উৎকৃষ্ট কবির লিখিত একখানি কাব্য সমালোচনা করিব।

ঈশানবাবুর "যোগেশ" কাব্য এরূপ প্রথমোক্ত রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কবির রচিত। ইহার গল্পাংশ অতি সামান্য কাব্যখানিও আয়তনে বেশী বড় নহে। গ্রন্থে ঘটনার সমাবেশ নাই। কবি যে ঘটনা বৈচিত্র সংযোজনে অপটু একথা আমরা বলিতেছিনা, তবে বর্ণনীয় কাব্যে এরূপ বিবিধ ঘটনার অবতারণার কোন প্রয়োজন হয় নাই। কবি রঙ্গভূমিতে অনেকগুলি চরিত্র আনিয়া একত্রিত করেন নাই। যে গুলিকে কাব্য প্রসঙ্গে আনিয়াছেন ও যে গুলি প্রধান অভিনেতা কেবল তাহাদিগকে ব্যতীত বাকীগুলিকে নেপথ্যের অন্তরালে রাখিয়াছেন। বর্ণনার বা ভাষার সর্ব্বত্র এমন মনোহারী নূতনত্ব বা ঔজ্জ্বল্য নাই যাহাতে সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করে। ইহা ছাড়া, তরল চটুল ভাববিলাসের অভিব্যক্তির জন্য ঈশানবাবুর লেখনী নিয়োজিত নয়। ঈশানবাবুর লঘু, তরল ভাবযুক্ত কবিতা বই পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকের নিকট এত অভাবসত্ত্বেও যে "যোগেশ" কাব্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে—উহার পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও, উহার সাহিত্যশিল্পের কম সুখ্যাতি নহে; কারণ, গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত যে এক গভীর আবেগসঙ্কুক্ষণ অথচ অলস উচ্ছ্বাসরহিত শোকের অভিব্যক্তির

সুর শুনা যায় তাহা সাধারণতঃ অন্য কোন কবির কাব্যে পাওয়া দুর্লভ—উহা ঈশানবাবুর নিজস্ব সম্পত্তি।

"যোগেশ" কাব্যে নিরাশ প্রণয়ের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সমাজে এরূপ শোক ঘটনার ইতিহাস দুইপ্রকার। হয় ত, ১মতঃ প্রণয়ীপ্রণয়িণী উভয়ে বাল্য প্রণয়ী—পরে নিয়তির বিড়ম্বনায় কেহ কাহাকে পাইল না—উভয়ের ভাগ্যই অন্যের অদৃষ্টের শৃঙ্খলে সংযোজিত হইল। উভয়ের চিরজীবন নৈরাশ্য অন্ধকারময় হইয়া গেল। এস্থলে বলা বাহুল্য পরস্পর পরস্পরের প্রণয়ের প্রতিদান পাইয়াছে। ২ য়তঃ, একপক্ষে প্রগাঢ় প্রণয়, অপর পক্ষে আদৌ প্রতিদান নাই অর্থাৎ যেরূপ প্রতিদান বাঞ্ছিত সেরূপ প্রতিদান নাই, ইহাতে একপক্ষে একটী জীবন নৈরাশ্য-সাগরে ঝাঁপ দিয়া, হয় ত আত্মহত্যা করিয়া দগ্ধ বিড়ম্বিত জীবনের অবসান করে। যদি নিঃস্বার্থ অর্থাৎ প্রতিদান সম্পর্কশূন্য প্রেমে বলীয়ান্ হয়, তবে বিয়াত্রিস্ প্রণয়ী দান্তের মত প্রণয়ের উপাস্য দেবতাকে স্বপ্নে স্বহৃদয়ের অর্ঘ্যোপহার প্রদানে নিরাশ প্রণয়ের নিরন্তর বৃশ্চিক দংশন কথঞ্চিৎ প্রশমিত করে। আর যদি হৃদয়ের বল না থাকে, তবে যোগেশের মত, দেবীপ্রতিমা পত্নীর অতুল্যপ্রেম অবহেলা করিয়া মন্দাকিনীরূপ আকাশকুসুমের উদ্দেশে অকালে আত্মবিসর্জ্জন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রণয় অর্থাৎ প্রতিপাদনহীন প্রণয়ই আমাদের সমালোচ্য বিষয়। এই শ্রেণীর সাহিত্যের উদাহরণ টেনিসনের ডোরা, জর্জ ইলিয়টের ফিলিপ্‌ওয়েকেম্, স্কটের রেবেকা বা ট্রেসিয়ান্, বঙ্কিমের শৈবলিনী ও প্রতাপ এবং আমাদের বক্ষ্যমান কাব্যের যোগেশ চরিত্র।

যোগেশ কাব্যের মূল ঘটনার বিবরণ অনেকের অজ্ঞাত নহে। তথাপি বঙ্গীয় সাহিত্যের দুর্ভাগ্যে এমন পাঠকও আছেন, যাঁহারা আদৌ এ কাব্য পাঠ করেন নাই; তাঁহাদের জন্য বর্ণনীয় উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হইল। কাব্যের প্রথম সর্গে শৈলপাদমূলে নদীতটে

যোগেশের উদ্‌ভ্রান্তমূর্ত্তি পাঠককে বিচলিত করে। কিন্তু তখনকার পূর্ব্ব ইতিহাস এ স্থলে নহে। উহা পরের বৃত্তান্তে প্রকাশ। সর্ব্বগুণ-রূপবান্ যোগেশ বিবাহ-বাসরে তাহার পত্নীর সখী মন্দাকিনীকে দেখিয়া, সেই কালমুহূর্ত্ত হইতেই মন্দাকিনীর প্রণয়ে উন্মত্ত হয়। অবশেষে অনেক আত্মদমন চেষ্টার পর, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনার প্রণয়-কামনা পত্রে ব্যক্ত করে। মন্দাকিনী হিন্দু বিবাহিতা স্ত্রী—মন্দাকিনী পরের রমণী—সে এরূপ পত্র পাইয়া অনেক কটুক্তি করিয়া যোগেশের প্রণয় দারুণ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে। যোগেশ ইহাতে শিশু সন্তান ও পতিপ্রাণা পত্নীকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া, স্বদেশ ও স্বজনের মমতা বিসর্জ্জন করিয়া, বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে অনাহারে অনিদ্রায় বন্য পশুবৎ বিচরণ করিতে থাকে। এ দিকে যোগেশ নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে, মন্দাকিনী যোগেশের পত্নী নর্ম্মদাকে নিজের বাটীতে আনিয়া সোদরা-স্নেহে পালন করিতে থাকে। একে উভয়ে বাল্যসখী, তাহাতে নর্ম্মদা পিতৃমাতৃহীনা; মরিবার সময় নর্ম্মদার পিতা উহাকে মন্দাকিনীর হাতে সঁপিয়া গিয়াছিলেন, তাহার উপর অভাগিনী সরলা বালিকার এ অনাথ অবস্থার মন্দাকিনীই গৌণ কারণ ও মন্দাকিনীর দেবীতুল্য হৃদয় বলিয়া প্রাণ ঢালিয়া নর্ম্মদাকে সেবা করিতে থাকে। এ দিকে যোগেশের পিতার প্রেতাত্মা যোগেশের সম্মুখে এক দিন আবির্ভূত হইয়া, তাহার অনাথা পত্নীর, শিশুপুত্রের, মাতার, অগ্রজের শোচনীয় অবস্থার শোক-চিত্র তাহার নেত্র সমক্ষে অন্তরীক্ষে উদ্‌ঘাটন করিয়া, তীব্র তিরস্কারবাক্যে যোগেশকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার আদেশ পালিত হয় নাই। ইহার পর এরূপ অনিয়মে অত্যাচারে যোগেশের অন্তিমকাল আসন্ন দেখিয়া, তাহার পিতৃ প্রেতাত্মা একদিন আবির্ভূত হইয়া যোগেশের কাতরোক্তিতে যোগেশকে তৎপর-দিন অপরাহ্নে তাহার সকল জ্বালার অবসান করিতে স্বীকৃত হন।

এ দিকে সমীপস্থ শৈলচারিণী কোনও নিরাশপ্রণয়-কাতরা ভৈরবী বহু অন্বেষণের পর মন্দাকিনীর গৃহে গিয়া এ সংবাদ দেয়—মন্দাকিনী পতি সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ যোগেশের নিকট গিয়া অনেক স্নেহবাক্যে যোগেশকে বুঝাইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। তখন মৃত্যুর কাল-ছায়া তাহার মুখে ঘনাইয়া আসিতেছিল—সে ঈষৎ হাস্যঈঙ্গিতে জানাইল যে মন্দার প্রার্থনা অনেক বিলম্বে পৌছিয়াছে; কিন্তু সে যে যোগেশকে ক্ষমা করিয়াছে এ চিন্তায়ও যোগেশ সুখে মরিতে পারিবে। যোগেশের মৃত্যুর পর মন্দাকিনী যোগেশের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া নর্ম্মদার নিকটে আসিয়া দেখিল, সতীর প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। জনৈক দেবদূতী তাহাকে তাহার পতির আসন্নমৃত্যু জ্ঞাপন করিয়া বিমানে তাহার আত্মাকে "সতীকুঞ্জ" নামক স্বর্গের সতীশিরোমণিগণের জন্য ইন্দ্রানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দেববাঞ্ছিত স্থানে লইয়া যায়। হতভাগা যোগেশের চিরবিড়ম্বিত আত্মা নরক হইতে এই সুখের স্থানে নর্ম্মদাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত! শেষ সর্গে এইসব দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে।

যোগেশ হতভাগ্য, ভ্রান্তমতি, উন্মাদ;—আমরা এমন বিশেষণ খুঁজিয়া পাইতেছিনা যাহাতে যোগেশকে সম্পূর্ণরূপে বিশেষিত করিতে পারি—সে আজীবন বিড়ম্বিত। কবি মন্দার বর্ণনায় আমাদের জানাইয়াছেন যে যোগেশ—

সততার চিত্রপঠ—নীতির দর্পণ,
মহত্বের লীলাভূমি—পুণ্যের আশ্রম,
গাম্ভীর্য্যের প্রতিকৃতি—করুণার খনি
বরদার প্রিয়সুত—কমলার আশা।

এত রূপ-গুণ থাকিতেও যোগেশ চিরদুঃখী। দীনতম পথের ভিক্ষুকের ভাগ্যও যোগেশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বিধাতা তাহাকে সমস্ত গুণের আধার করিয়া সৃজন করিয়া ছিলেন; কিন্তু

কি অশুভক্ষণে তাহার জীবনাকাশে মন্দাকিনীরূপ ধূমকেতু উদিত হইয়া তাহার সমস্ত জীবন শোক দগ্ধ করিয়া দিয়াছিল! গৃহে যুবতী রূপসী প্রণয়িনী, তাহার উপাস্য দেবতা মন্দাকিনীর অপেক্ষা বিশেষ সুন্দরী; কবি একথা ঈঙ্গিতে মন্দার বর্ণনায় ব্যক্ত করিয়াছেন—যেমন তাহার অতুল্যরূপ ততোধিক সহস্রগুণে অমূল্য তাহার প্রণয়—এরূপ সুন্দরী নবীনা পতিপ্রাণা প্রণয়িনীকে অবহেলা করিয়া কিনা বিদ্বান যোগেশ—জ্ঞানী যোগেশ—সদসদ্বিচারক্ষম যোগেশ অন্যএকটি বিবাহিতা রমণী, যে তাহার উপর স্বপ্নেও কখন প্রেমদৃষ্টিপাত করে নাই, এরূপ সাধ্বী মন্দাকিনীর অপ্রাপ্য প্রণয়াশায় আত্ম বিসর্জ্জন করিল! এরূপ অবস্থায় সতী স্ত্রীর পক্ষে যাহা সঙ্গত উত্তর হইতে পারে তাহাই পাইল। মন্দাকিনী,সতীনারীকে সৎপথ্যচুত করিতে প্রতারকের কৌশল জাল বলিয়া অতীব ঘৃণায় যোগেশের প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিল। যোগেশ নৈরাশ্যে বন্যপশুবৎ বনে বনে ফিরিতে লাগিল। এস্থলে মন্দাকিনীর চরিত্রে কিছু কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে বোধহয় ও সেই সামান্য ত্রুটির ভিত্তির উপর এই শোকাত্মক কার্য্য স্থাপিত। মন্দাকিনী সতী-শিরোমণি,—তাহার কঠোরতায় যোগেশের প্রাণপর্য্যন্ত গেল, তথাপি তাহার উপর ক্রোধ বা ঘৃণা করিবার ন্যায্য অধিকার আমাদের নাই; কারণ হিন্দু-সতী-স্ত্রীর প্রণয়াশায় নিরাশ হইয়া যে পরপুরুষ প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, তাহারজন্য সেই সতীকে ধর্ম্মচ্যুত বর্ণনা করা প্রকৃত হিন্দুস্ত্রীর চিত্র নহে। মন্দা তাহার নিষ্ঠুরতার কথা অনেক ভাবিয়াছে:—

যোগেশের এ দুর্দ্দশা কার অপরাধে?
এ সন্তাপে নর্ম্মদার কে হবে নারকী?
যোগেশের ধর্ম্মশীলা প্রাচীনা জননী
পাইলা যে এত ক্লেশ ত্যজিলা যে প্রাণ,
তার তরে কোন্ জন হইবে পাতকী?

আমি ?—কিন্তু অপরাধ !—আমি যে পাষাণী
তাহে সন্দেহ কি আর ! কিন্তু নারীমন—
অবলার অরক্ষিত দুর্ব্বল অন্তর
এমনি পাষাণে বাঁধা নহে কি উচিত ?
সতীত্ব নারীর যদি শুধুই ধরম
রমণীর সে অমূল্য সতীত্ব ধরম
রক্ষিতে পাষাণে যদি বেঁধে থাকি মন
আছে কি অধর্ম্ম তায় ?—

মন্দাকিনীর হৃদয় আমরা দেখিলাম—তাহার মনের ভাবও এ কথায় বুঝিলাম। পাছে যোগেশকে সোদর ব্যতীত বন্ধু ভাবেও মনে স্থান দিলে সতীধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়, এজন্য সে যোগেশের শেষ লিপির পর শয়তানের মত তাহার ছায়া মাড়াইত না। কারণ মন্দাকিনীর কাছে :—

কি ছার যোগেশ !—ছার রাজরাজেশ্বর !
মন্দার হৃদয় নহে এতই ঘৃণিত।
যায় যাবে নর্ম্মদার সুখের সংসার,
ভাঙ্গে নর্ম্মদার ভাগ্য যাক্‌না ভাঙ্গিয়া,
হারায় হারাক্ প্রাণ অবোধ যোগেশ,
তা'বলে কি অপবিত্র করি চিত্তমম
অমূল্য নারীর ধর্ম্ম দিব বিসর্জ্জন ?
প্রতারক !—ভেবেছিলে অবোধ রমণী ;

* * * *

অসহায় রমণীর সতীত্ব রতন
রক্ষিতে জীবনে তার নাই কি আয়ুধ ?

মন্দাকিনীর এ কথায় আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাহার হৃদয়ের একটু সামান্য দুর্ব্বলতা, তাহার একটু সামান্য ত্রুটী

দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়—বিশেষ যখন ভাবি যে এই ত্রুটীর জন্য যোগেশের কি না হইল ! সে তাহার হৃদয় বজ্রায়সে বাঁধুক আমাদের কোন আপত্তি নাই—সতীর কঠোর ধর্ম্ম তাহাই ; কিন্তু যোগেশের শেষ লিপি পাইয়া, তাহাকে পিশাচ প্রকৃতি কামুক বলিয়া কঠোর তিরস্কারে তাহার হৃদয়ে নৈরাশ্যের তীব্র বহ্নি জ্বালাইয়া না দিয়া, তাহাকে প্রাণ বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প না করাইয়া—ভগ্নীর মত কোমল বচনে তাহার ভ্রম বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাইত, তাহা হইলে দেবীচরিত্রা বলিয়া তাহাকে পূজা করিতে পারিতাম। এই সামান্য ত্রুটীতে তাহার চরিত্রে কিছু কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে বোধ করি। পরে ভৈরবীর কথায় নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণসমা সখী নর্ম্মদার ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিয়া যোগেশের প্রাণ রক্ষায় গিয়াছিল, তখন তাহার উচ্চ হৃদয় যে নারী সুলভ স্নেহে ও কোমলতায় মণ্ডিত দেখিতে পাই, তাহাতে তাহার চরিত্রমাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু হায়, এই অসীম সোদরাস্নেহের করুণাউৎস যদি পূর্ব্বে উন্মুক্ত হইত, তাহা হইলে উদ্‌ভ্রান্তমতি যোগেশের আর এরূপ শোচনীয় অকাল পরিণাম ঘটিত না। —মানব নিয়তিই বুঝি এরূপ ভ্রমসঙ্কুল ও মানব-জীবন এমনই বিড়ম্বনাময় ! এই প্রকার সামান্য ত্রুটীতে জগতে প্রত্যহ কত শোকাবহ অভিনয়ের উপর কালের অনন্ত যবনিকা পতিত হইতেছে !

যোগেশের এরূপ অবোধ যাতনা, যাঁহারা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত না পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ ও অসঙ্গত বোধ হইবে। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থখানি যিনি অবহিত চিত্তে পাঠ করিবেন, তাঁহার সে ধারণা স্থায়ী হইবে না ; কারণ কবির বর্ণনা স্বভাবতই-নিতান্ত আন্তরিক। যোগেশের জন্য সহানুভূতি পাঠকের মনে সহজেই উদ্রিক্ত হয়। যিনি যোগেশকে কাল্পনিক খাম খেয়ালিতে মত্ত বলিয়া স্থির করিবেন, তাঁহাকে আমরা কাব্যের দশম সর্গের সাগর সৈকতে

পিতৃ প্রেতাত্মার নিকট যোগেশের অগ্নি উদ্গীরণ পাঠ করিতে বলি যোগেশকে গৃহে ফিরিতে বলাতে তাহার তৎকালীন উক্তিঃ—

"কি—সাধে কি—সুখে আর ফিরিব ভবনে ?
জীবন !—তাহাত মম গিয়াছে ফুরায়ে

* * * *

কি যত্ন না করিয়াছি—বুঝাতে হৃদয়
কি ব্যথা না সহিয়াছি, দিবস যামিনী
পাপ পুণ্য দুই স্রোত উন্মত্ত তরঙ্গে
আছাড়িয়া বক্ষে মম গিয়াছে বহিয়া,
ঘাত প্রতিঘাতে চিত্ত হয়েছে বিক্ষত
রক্তে রক্তে অন্তস্থল হয়েছে প্লাবিত,
কিন্তু কৈ পারিলাম মুছিতে সে ছায়া !
আর যে পারিনা পিতঃ ! আর যে সহেনা,
এ প্রাণ বহিতে আর পারিনা যে আমি,
দিবানিশি বুক যেন উঠিছে ফাটিয়া,
তবু যে জীবন নাহি হয় বহির্গত,
বহ্নিমুখী ভুজঙ্গিনী জলন্ত দংশনে
নিরন্তর দংশিতেছে অন্তর আমার।
লহ পিতঃ ! পদপ্রান্তে তাপিত সন্তানে।"

এ বর্ণনা উৎকৃষ্ট—ইহা পাঠ করিয়া কোন্ হৃদয়বান্ পাঠকের চক্ষে অভাগা যোগেশের জন্য না অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হয় ? সাহিত্যে এরূপ আর একটী চিত্র আছে—উহা বায়রণের ম্যান্‌ফ্রেডের। অভাগা ম্যান্‌ফ্রডও এরূপ নিরাময় প্রণয়ে পশুর মত শৈলে শৈলে ফিরিয়াছিল। বস্তুতঃ উক্তকাব্যের ছায়া যোগেশে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শেষোক্ত চরিত্রে

আমাদের অধিকতর সহানুভূতি হয় ; কারণ ঈশান বাবুর বর্ণনার যে আন্তরিকতা বায়রণের উক্ত কাব্যে তাহা নাই।

আর অভাগিনী নর্ম্মদা !—এমন সুন্দর, স্নিগ্ধ, এমন কোমল, এমন নির্ম্মল, এমন অনুপম চিত্র অত্যল্পই দেখিয়াছি। এমন সুন্দর সৃষ্টিরও এরূপ দারুণ পরিণতি বা অমন কোমল কোরক ধূলি-মলিন, পদদলিত হওয়াই বুঝি বিধিনিয়ম ! হায় অভাগিনি, তোমার ভাগ্যে এত দুর্দ্দশা ছিল ! দূরাগত অপ্সরা সঙ্গীতের ন্যায়, বিরহীর আয়াসলব্ধ স্মৃতির ন্যায়, পবন-সঞ্চালিত গোলাপের মৃদু সৌরভের মত তোমার কমনীয় কান্তি, তোমার সৌরভ আমাদিগকে মুগ্ধ করে—তোমার শোক-চিত্র আমাদের কল্পনাকে ব্যথিত করে ! কেন তোমাকে বিধাতা এরূপ সারল্য, এরূপ অনুপম কমনীয়তা, এরূপ অতুলনীয় পতি-প্রেম দিয়াছিলেন, তবে কেন তোমাকে সুখী করিলেন না ? কি দোষে তোমার এ শোকাবহ পরিণাম হইল ? নিদাঘ-দগ্ধ যুথিকা-কোরকের ন্যায় তুমি ফুটিতে না ফুটিতেই শুকাইয়া গেলে !—

'Oh, fairest flower, no sooner blown than blasted !'

বিধাতা তোমাকে আজন্ম দুঃখিনী করিয়াছিলেন,—বাল্যে পর-লালিতা। যদি ভাগ্যে সর্ব্বগুণশালী পতি যুটিয়াছিল, তথাপি নিয়তির বিড়ম্বনায় সে পতিও তোমার অতুল্য হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, আকাশ কুসুমের আশায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিল ! তোমার পতিভক্তি অতুলনীয়া বোধ হয় মন্দাকিনীর অপেক্ষাও উচ্চদরের ; কারণ মন্দাকিনী পতিসোহাগিনী আর তুমি চিরকাল পতি-প্রেম বঞ্চিতা। মন্দাকিনী যখন তোমার কষ্টে দুঃখিত হইয়া তোমার পতির নিন্দা করিয়াছিল, তুমি তাহাতেও ব্যথিত হইয়া নিরস্ত হইতে বলিয়াছিলে। বড় দুঃখ যে এরূপ লোক-দুর্লভ-প্রেম ও তোমার স্বর্গীয় অন্তঃকরণের মাধুর্য্য বিড়ম্বিত যোগেশের হৃদয়ে শান্তি ঢালিয়া দিতে পারে নাই। সে তোমার

হৃদয়ের উচ্চতা বুঝিতে পারিল না। যোগেশকে না দেখিয়া মরিলে পাছে ফিরিয়া যোগেশের মনে আঘাত লাগে, এজন্য তুমি এত ক্লেশে মিলনাশায় প্রাণধারণ করিয়াছিলে। তোমার তৎকালীন উক্তি এখনও আমাদের কানে লাগিয়া রহিয়াছে :—

কিন্তু প্রাণনাথ যদি থাকেন জীবিত,
ফিরিয়া আসেন যদি আলয়ে আবার।
তখন শুনিলে মম মরণ সংবাদ
ব্যথিবে যে সখি তাঁর কোমল অন্তর!
শুধু সেই আশালোক চাহিয়া চাহিয়া
ধরিয়া ছিলাম প্রাণ * *
ভবেশের মুখ পানে আবার যখন
চেয়ে দেখি—মধুমাখা হাসি টুকু তার
ঢল ঢল চক্ষু দুটী—আধ আধ কথা
ক্ষুদ্র হস্ত পদগুলি করি সঞ্চালিত
বাছার সে উল্লসিত মধুর ক্রীড়ন
এত যে সুন্দর বাছা হইল আমার
না দেখি প্রাণেশ তায় ত্যজিবে কিপ্রাণ?

কে তোমার এসব কথায় না অশ্রু মোচন করিবে? তুমি সতীর অগ্রগণ্যা—বঙ্গীয় নারীগণের নিকট তোমার চরিত্র, তোমার পাতিব্রত্য অটুট হইয়া থাকুক।

আমাদের সমালোচনা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। উপসংহারে কতকগুলি কথা বলিতে চাহি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কবি ঘটনার পর ঘটনার স্রোতে পাঠককে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ না দেওয়াটা, বর্ত্তমান কাব্যের পক্ষে উচিত বিবেচনা করেন নাই। সদ্বিবেচক মাত্রই তাঁহার এ কার্য্য অনুমোদন করিবেন। তিনি কাব্যে যে চরিত্রগুলির অবতারণা করিয়াছেন

তাহার কতকগুলিকে অন্তরালে রাখিয়াছেন। ইহাতে বাকী চরিত্রগুলি বেশ উজ্জ্বল ভাস্বরবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। প্রধান চরিত্রগুলির (যোগেশ, মন্দাকিনী ও নর্ম্মদার) সমালোচনা আমরা করিয়াছি। বাকী মন্দাকিনীর স্বামী, ব্যাধ ও ভৈরবীর সম্বন্ধে দু'কথা বলা প্রয়োজন। মন্দার স্বামীকে কবি এক প্রকার অন্তরালে রাখিয়াছেন; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা সঙ্গত নহে। ভৈরবীও একজন নিরাশ প্রণয়িনী।

যোগেশের মত আত্মহত্যায় প্রণয়ের ঔষধ না খুঁজিয়া, এরূপ মহারোগের সে যথার্থ ভেষজ পাইয়াছে—সে পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে; সুতরাং এ চরিত্র যোগেশের একপ্রকার antithetic বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যাধ ধার্ম্মিক, সরলহৃদয়, প্রেমিক অশিক্ষিত মনুষ্য। সে পরোপকার মন্ত্রে ভৈরবীর শিষ্য। অসহায় অবস্থায় সে যোগেশকে যে মমতার সহিত শুশ্রূষা করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহার সহৃদয়তা প্রশংসনীয় এবং শিক্ষিতেরও অনুকরণযোগ্য।

কাব্যে প্রেতাত্মা, নিয়তি ও দেবদূতীদের আবির্ভাবে গ্রন্থে অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করা হইয়াছে। উহা কাব্যে অবতারণা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত এ ক্ষুদ্র সমালোচনায় উহার বিচার করা অসম্ভব। তবে স্থূলতঃ বলিতে গেলে বর্ত্তমান কাব্য-সৌন্দর্য্যের ইহাতে কোন হানি হয় নাই। গ্রীক্ নাট্যকারেরা যেমন তাঁহাদের অতুল্য নাট্যমধ্যে সর্ব্বোপরিনিয়তির ছায়া সর্ব্বকার্য্যে পশ্চাতে রাখিতেন, যোগেশকেও কবি সেইরূপ প্রত্যেক পদে নিয়তি-করচালিত বর্ণনা করিয়াছেন। কবি এস্থলে তাঁহার অগ্রজের ও আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কবি হেমচন্দ্রের পদানুসরণ করিয়াছেন। উভয় কবি-বর্ণিত নিয়তির চিত্রের তুলনা করিলে আমাদের একথা পরিলক্ষিত হইবে। নিয়তির বর্ণনা ও কাব্যের অন্যান্য বর্ণনা স্থানে স্থানে অতি মনোরম। এ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমাদের

নির্দ্দেশমাত্র করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। গ্রন্থারম্ভে উন্মাদ যোগেশের চিত্র মনোরম। ২য় সর্গে প্রেতাত্মার আবির্ভাব ও তৎকর্ত্তৃক যোগেশের সমক্ষে তাহার মাতা ও প্রণয়িনীর চিত্র উদ্ঘাটন দৃশ্য সুন্দর। একাদশ সর্গে মন্দাকিনীর সমক্ষে যোগেশের মৃত্যু বর্ণনা যেমন শোকাবহ তেমনই স্বাভাবিক। শেষ সর্গে সতীকুঞ্জ বিবিধ সংস্থানে কবি এরূপ শোকের উজ্জ্বলচিত্র আঁকিয়াছেন। সে সব বর্ণনায় যথেষ্ট সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা আছে। কবির ছন্দ, যতি স্থাপনার দোষে সর্ব্বত্র তত প্রীতিপ্রদ নহে। পাঠকেরা মিলাইয়া দেখিবেন যে, সমালোচ্য কাব্যের অনেক স্থলে চৌদ্দ অক্ষরের অন্তে যতি স্থাপনা করায় ছন্দ কর্কশ-শ্রুতিকটু হইয়াছে। অমিত্রাক্ষরের সম্রাট্ মাইকেল মধুসূদন (বিশেষতঃ তাঁহার 'মেঘনাদবধে') যে এরূপ প্রত্যেক পংক্তির শেষ অক্ষরে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর যতি রাখিলে উক্ত ছন্দ মিষ্ট শুনায় না কিরূপ halting বোধহয়—স্পষ্টই দেখাইয়াছেন; সুতরাং এরূপ যতিস্থাপনা উক্ত ছন্দের পক্ষে সাংঘাতিক। যাহাহউক এ সব সামান্য ত্রুটী—এ ত্রুটী সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। যেখানে ভাবের আবেগ আছে সেখানে এরূপ ছন্দের দোষ হয় নাই। বর্ণনাও স্থানে স্থানে অতি সুন্দর—পূর্ব্বে কতক নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখানে কেবল ৫ম সর্গ হইতে মন্দাকিনী ও নর্ম্মদার বর্ণনার একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকেরা ইহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিবেন :—

দুইটী রমণীমূর্ত্তি—দুইটী যুবতী
যৌবন উদ্যানে দুই বিকচ কুসুম,
দু'জনাই রূপবতী ; কিন্তু মন্দাকিনী
উষার নীহার ধৌত প্রফুল্ল নলিনী
দলে দলে স্নিগ্ধ কান্তি পড়েছে বিকাশি
অনুরাগে স্ফীতবক্ষঃ গরবে উন্মুখ।

সায়াহ্নের সূর্য্যমুখী নিষ্প্রভ নর্ম্মদা
সঙ্কুচিত দলগুলি অবনত মুখ
হৃদয় পল্লবে ঢাকা সুষমা অস্ফুট।
মন্দাকিনী বসন্তের ফুল্ল সরোরুহ
নিদাঘের দগ্ধ কান্তি কুমুদ নর্ম্মদা।
মন্দাকিনী শরতের পূর্ণিমার শশী
হেমন্তের অস্তগামী শশাঙ্ক নর্ম্মদা।
মন্দাকিনী প্রেমিকের প্রণয় স্বপন,
নর্ম্মদা আয়াস লব্ধ বিরহীর স্মৃতি।
মন্দাকিনী তেজস্বিনী জলজ লতিকা
নর্ম্মদা অবনীপৃষ্ঠে শঙ্কিতা ব্রততী।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

তালের তত্ত্ব।

আষাঢ়ে রথের তত্ত্ব বাজার লুটিয়া।
শ্রাবণে ইলিশমাছ কাশুন্দি কুটিয়া॥
ভাবিনী ভাদ্দরে ভরে ভারি ভাবনায়।
তর্পণের তত্ত্ব নাই 'আব্রহ্মস্তম্বায়'॥
হেনকালে কচিছেলে চেঁচাইল চিল।
বউমা বসায় পিঠে গুম্ করে' কিল॥
কিল শুনে তিলেকেতে তাল পড়ে মনে।
চালাবে তালের তত্ত্ব জামাইভবনে॥
চলিল চাল্‌শে সতী পতির সকাশে।
নথ-ফাঁদে হাঁসি-চাঁদ ছবি-ছাঁদে ভাসে॥

পাশেতে বসিয়া গিন্নি বিনাইয়ে কয়।
"ব্যথাটা কেমন, কি গো খেতে ইচ্ছা হয়॥
ছেলেপুলে সংসারেতে দেহ গেল জ্বলে'।
কাছে বসি দু'দণ্ড যে পারি না তা ম'লে॥"
শুনিয়া ব্যথার কথা কর্ত্তা মনে ভাবে।
আঁচিয়া এসেছে গিন্নি বুঝি কিছু চাবে॥
আম্‌তা আম্‌তা করে' কর্ত্তা কথা কন।
"ব্যথাটা ততটা—তা—তা—নাহি টন্‌টন্॥
এ মাসে তেমন তবে হয় নাই আয়।
সাম্‌নে আসিছে পূজো কি হবে উপায়॥"
"আমি এলে ও কথা তো আছে চিরকাল।
তাই তো আসিনে হেথা বাড়াতে জঞ্জাল॥
আমি চেলে সব বুঝি উড়ে'-পুড়ে' যায়।
মনে কর মাগী বুঝি নিজে পেটে খায়॥"
গর্জ্জিয়া উঠিল গিন্নি এই কথা বলে'।
হুকুমে ভিজিল নথ নয়নের জলে॥
আহাম্মুক হ'ল কর্ত্তা নাই বলে' অর্থ।
গৃহিণী সুবিধা পেলে বাধাতে অনর্থ॥
হ'ল না বলিতে আর করি ভয় ভয়।
মানে আর রোদনেতে গৃহিণীর জয়॥
তালফুলুরির তত্ত্বে করিয়া জমক।
ধার্য্য হ'ল লোকমাঝে লাগাবে চমক॥
দেড়শত লোক যাবে হ'য়ে গেল স্থির।
তা ছাড়া গোয়ালা-ভারী নেবে দইক্ষীর॥
বিয়ে হ'তে কত লোক রাখিয়াছে বলে'।

কবে আর যাবে তারা এবার না হ'লে॥
মকরের চাকরের ভাইপোর মাসী।
জেলেনী মালিনী জয়া সইমার দাসী॥
ও বাড়ীর হাড়িদের পাড়ার সেই উড়ে।
কাপুড়ে কানাই আর লখাই সাপুড়ে॥
এমন আত্মীয় ঢের আলাপী সেকেলে।
কথা দিয়ে কতদিন রেখেছেন টেলে॥
পূজাতে নিজের লোক যাবেই সবাই।
এবার এদের গিন্নি পাঠাবেন তাই॥
বিদায় প্রথম বর্ষে টাকা টাকা থালা।
কবে আর যাবে গেলে পাওনার পালা॥
কত আছে প্রতিবেশী কুটুমের লোক।
সকলেই পেতে চায় কিছু কিছু থোক॥
চাকরদাসীর যদি নাহি থাকে মান।
মিছে তবে কুটুম্বিতা মিছে কন্যাদান॥
পথ জুড়ে' ভিড় করে' যাবে থালা ভারী।
তবে বলি তত্ত্ব তারে তারিপ তো তারি॥
কাঁধি-তাল নিয়ে যাবে আটজন বাকী।
আল্‌গা তালের ঝুড়ি কুড়ি ধরে' রাখি॥
গুঁড়ি-তরে চাল যাবে কুটিবার ঢেঁকি।
চাঁদিগড়া তালমাড়া নেবে ফুলি নেকী॥
গাম্‌লা গড়াতে হবে রাখিবারে মাড়।
রূপো কিনে দিলে হবে স্যাক্‌রার চাড়॥
কড়া বেড়ি চাটু হাতা ঘড়া ঘটী হবে।
একেবারে দু-হাজার ভরি এনো তবে॥

পিতল-কাঁসার পুরো দিতে হবে স্থট্।
না হলে কুটুমে বড় ধরে' বসে খুঁট্॥
চ্যাঙারি ধুচুনী কুলো ডালা ডোম-সজ্জা।
গরুর গাড়িতে গেলে তবে রবে লজ্জা॥
তাল খেয়ে বেহানের খালি তৃষ্ণা পাবে।
তিনটে না দিলে জালা দেখো খোঁটা খাবে॥
রাঁধুনী কাপড় পাবে বড়া ভাজিবার।
গামছা তোয়ালে তার হাত মুছিবার॥
'হগ্গীর খুরসী-পীঁড়ে পায়া দুই মুখে।
পাতিয়ে বসিবে মাগী চুলোর সুমুখে॥
এত হ'ল দেওয়া ভাল কাপড় সবার।
বরাবর নয় কিছু জোর খেপ্ চার॥
এখন মেয়েরা পরে সবাই শেমিজ্।
সেনেরা দিয়েছে শুনি রেশমী কামিজ্॥
গুড়ের দুকুড়ি চাই ডাগর নাগরী।
ঢালিয়া রাখিতে লাগে যথান সাগরী॥
'নাচ'-গাড়ি নারিকেল দিলে রবে মান।
কুরিতে কুরুণী তাহা দু'খানি-দোকান॥
চন্দ্রপুলি ক্ষীরছাঁচ মেওয়ার রকম।
ছ-মন হ'লেও তবু হবে কম-কম॥
গড়িয়ে ক্ষীরের তাল দিলে হবে বেশ।
জানে বটে তত্ত্ব দিতে মেনে নেবে শেষ॥
পালকের পাখা কিনো আপিসের পথে।
বাতাসে জুড়াবে বড়া ভাল তরিবতে॥
সময়ের ফল যাহা বাজারেতে মেলে।

গুছায়ে আনিবে বুঝে তুমি নিজে গেলে॥
ঝাঁটা পাঠাইব ঝাড়ু দিতে রান্নাঘর।
ঘর করে' রাখিয়াছি তোমারি সুসর॥
ঘি-ময়দা চিনি তেল নুন কলাপাতা।
পাথরের থোরা চাকী শিল-নোড়া জাঁতা॥
থোবানি বাদাম পেস্তা পোস্তদানা তিল।
ঝি-জামাই বসে' খাবে কেদারা-টেবিল॥
ফুলুরী খাইলে যদি পেটে ধরে ব্যথা।
পেপের্মেণ্টো দিতে হবে নাহিক অন্যথা॥
হোমোপাথী বাক্স সঙ্গে কোলেরোডাইন্।
জ্বর যদি আসে পাছে কিছু কুইনিন্॥
এতেও যদ্যপি ব্যান কন কথা ফড়্কে।
আঁচাতে সাবান দেব সোনা চিরে থড়্কে॥
কত-কি-যে দেয় লোক মনে নাহি আসে।
খোঁটা যদি ওঠে ফের দেব শেষা-মাসে॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

ভারতের রমণী।

বিখ্যাত নাইন্‌টিন্থ ছেন্‌চুরি পত্রে ডাফরিন এবং আভার মারসিয়নেস্ "The Women of India" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতের সহিত আমরা সম্পূর্ণ ঐক্যমত হইতে না পারিলেও, তাঁহার উক্তি অভ্রান্ত সত্য না হইলেও, তাঁহার সদাশয়তার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। ভারতবর্ষের রমণীগণ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিরূপ, তাহাই জানাইবার জন্য আমরা

প্রবন্ধটির সারাংশ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। তিনি বলেন যে, ভারতের ন্যায় একটী প্রকাণ্ড প্রদেশের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, পূর্ব্বে সে দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় সমূহ অবগত হওয়া আবশ্যক। আমি ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর ভারতে অবস্থান করিয়া, উহার অসংখ্য জ্ঞাতব্যের কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিয়াছি।

তাঁহার বিশ্বাস ভারতের এক প্রান্তে বসিয়া নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তথাকার স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিলে, অপরপ্রান্ত হইতে নিশ্চয়ই তাহার তীব্র প্রতিবাদ হইবে; কারণ সকল দেশের আচার-ব্যবহার একরূপ নহে। যেরূপ উত্তরাংশের আচার পদ্ধতি দক্ষিণাংশ হইতে পৃথক্, তদ্রূপ পূর্ব্বাংশের আচার-ব্যবহার পশ্চিমাংশের হইতে বিভিন্ন। এমন কি একই দেশে জাতি ও ধর্ম্ম পার্থক্যের দরুণ প্রচুর পরিমাণে আচার-ব্যবহারের বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই কেহ যদি ভারতের কোন একটি জাতির আচার পদ্ধতির কথা লিপিবদ্ধ করেন, তবে তাহা বহুলাংশে অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

অন্য কোন ইয়ুরোপিয়নের, জেনানা মিশনারিগণ অপেক্ষা ভারতীয় রমণীদিগের সহিত অধিক জানা শুনা থাকিতে পারে না; কিন্তু তাঁহারাও দেশের প্রথা মত বাড়ীর কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত দেশের আচার-ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিতে পারেন না এবং অন্য দেশের স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধেও কিছু অবগত হইতে পারেন না। যদিও মিশনারিগণ এই বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়া দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন, ফলে কিন্তু তাহার অধিকাংশ অবান্তর কথায় পরিপূর্ণ থাকে।

এই হেতু আমি কোন নিশ্চয়াত্মক মত স্থাপন বা উপদেশ বিতরণের ভাণ করিয়া লেখনী সঞ্চালন করিতেছি না। আমার উদ্দেশ্য—ভারতের ভগিনীগণের প্রতি আমার যে সহানুভূতি আছে, তাহা অপরকে জ্ঞাপন

ও তাহাদের অবস্থার উন্নতি এবং দুঃখের অবসান করা। আমি বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদানের জন্য অন্য কোন মহাত্মার উক্তি উদ্ধৃত করিব না। ভারতের নানাস্থানে এবং আমার সিমলার ও কলিকাতার আবাসে থাকিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি এবং সুস্থ ভারত ললনার নিমিত্ত দাতব্য ঔষধালয়ের অর্থ সংগ্রহ ব্যপদেশে যে সকল ধারণা হইয়াছে, তাহাই পাঠকগণের সম্মুখে স্থাপন করিতেছি।

বিলাতে ভারতীয় রমণীগণের সম্বন্ধ একপ্রকার নির্দ্ধারিত ধারণা আছে, তাহা কতকাংশে সত্য হইলেও বহুলাংশে অসত্য—কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা পরীক্ষা করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইতে পারে। ভারতের নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ স্ত্রীলোকই নির্ব্বিবাদে গৃহের বাহিরে যাইয়া প্রাত্যহিক কার্য্য সম্পন্ন করে। প্রতিবেশীর ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করিতে যায়, উৎসবাদিতে যোগ দিয়া হাসিয়া খেলিয়া ভ্রমণ করে, পবিত্র সলিলা গঙ্গা হইতে স্নান করিয়া আইসে, অধঃপতিত এবং উপায়হীনা হইলেও তাহারা যে কেবল একটী পরিবার শাসন করে তাহা নহে; তাহারা একরূপ একটী রাজ্য শাসন করে ও গৃহ-কারার নিভৃত অন্তরাল হইতে তাহাদের প্রভাব সূক্ষ্মরূপে বোধগম্য হয়। বস্তুত স্ত্রী কর্ত্তৃত্ব ভারতেও যেমন সুফলদায়ক, বিলাতেও তদ্রূপ; কিন্তু ভারতে শ্বশ্রূ কিম্বা ঠাকুর মা যেরূপ কর্ত্তৃত্ব সঞ্চালন করে, ইংলণ্ডে সেরূপ পারে না।

ভারতের রমণীগণের সম্বন্ধে আমার ধারণা অতি উচ্চ এবং তৃপ্তিকর। কোন সহরে একটী তামাসায় আমি স্ত্রীলোকদিগকে যোগদান দিতে দেখিয়াছিলাম কেহ বা ঘরের ছাদে, কেহ বা জানালার নিকট দল বাঁধিয়া প্রতিবেশী ও বয়স্যার সহিত হাস্য-পরিহাসে রত ছিল। তাহাদের যৌবনসুলভ অনাবৃত হাস্যলহরী কাপট্যবিহীন—মলিন জগতের কোন ছায়া নাই। আমি স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের পারিপাট্য-

শূন্য রংচঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র নদী-তীরে কিম্বা দেওয়ালের গায়ে রৌদ্রে শুষ্ক করিতে, সুন্দর অশ্বযানে পরিভ্রমণ করিতে, কোথাও বা পিতলের লোটা মস্তকে করিয়া যাইতে দেখিয়াছি। শিমলা শৈলে স্ত্রীলোকদিগকে আমি সৌধনির্ম্মাণের রাজমিস্ত্রির সাহায্যকল্পে নিযুক্তা এবং 'সেপি' মেলায় প্রত্যেক কৌতুকাগারে আমোদ-আহ্লাদে ব্যাপৃতা দেখিয়াছি। দারজিলিংএ তাহাদের আর এক স্বভাব দেখিলেও, তাহাও কম আনন্দজনক নহে। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে মূল্যবান্ এবং ভারি অলঙ্কার কণ্ঠে রৌপ্য-মুদ্রা বিলম্বিত। তাহারা রেলষ্টেশনে দ্রব্য বিক্রয় করে, বিপণীতে শ্রমকর কার্য্য নিষ্পন্ন করে।

ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর রমণীগণের সম্বন্ধে আমার প্রথম ধারণা এই যে, তাহারা পরদার অন্তরালে অবস্থান করে না—ইচ্ছামত সহর কিম্বা পল্লীর পথে বিচরণ করে ও বিলাতের নিম্নশ্রেণীর রমণীদিগের ন্যায় সুখী এবং সদা প্রফুল্লময়ী।

জেনানার দৃশ্য দেখিয়াও আমি নিরাশ হই নাই। যদিও আমাদের নিকট পর্দ্দার অন্তরালে জীবন অতিবাহিত করা অসহ্যকর—তাহারা কিন্তু জন্মাবধি ঐ অবস্থায় অবস্থান করিয়া অভ্যস্থ হইয়াছে এবং এই পার্থক্যের জন্য তাহারা গৌরবান্বিতা মনে করে। তাহারা স্বাধীনতা কামনা করে না, তাহাদের কোন অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহারা শৃঙ্খলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না, তাহারা বহির্জগতের কোন ধারই ধারে না এবং উহার শত প্রলোভনে ও অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয় না।

পর্দ্দানিশানা রমণীগণকে আমি সমধিক শ্রদ্ধা করি। ভারতের বহির্ভাগে অন্য কোথায়ও আমি পর্দ্দানিশানা ভারত-রমণী-অপেক্ষা অধিক দয়াবতী, মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্না, সদালাপী এবং অপরিচিতের প্রতি সদাশয়া ললনা দেখি নাই। যদিও তাহাদের ভাষায় আমার অধিকার

ছিল না এবং সঙ্গে অনুবাদকেরও অভাব ছিল, তত্রাচ আমি তাহাদের ধীরতায়, সত্যতায় এবং ব্যবহারে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

পাশ্চাত্য নীতিবিজ্ঞানে রমণীদিগের প্রতি পর্দ্দার অন্তরালে নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকিলেও, আমি উহা অতি প্রয়োজনীয় মনে করি এবং এ পর্য্যন্ত প্রাচ্য কোন পুরুষ বা রমণী উহার বিরুদ্ধমত উত্থাপন করে নাই। যখন আমি তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধনকল্পে পরিশ্রম করি, শ্রমকর ক্রীড়া ও নির্দ্দোষ আমোদ প্রদানের ব্যবস্থা করি, তখন আমি তাহাদের গোপনীয় বিষয় সমূহ অবগত হইবার জন্য কিছুমাত্র উৎসুক হই নাই এবং যখন আমি ও আমার সহকারিগণ তাহাদের জন্য ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইয়াছিলাম, তখন আমরা সকলেই পর্দ্দার সকল নিয়ম ও প্রথা সুসঙ্গতরূপে রক্ষা করিয়াছিলাম।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আমি যে সকল বালিকাবিদ্যালয় দেখিয়াছি, তাহারো একটা সুখ-স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে। যখন এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকৃতি-সন্তান ভারতীয় বালারা তাহাদের দেশীয় পারিপাট্য-বিহীন-বস্ত্রে সুশোভিতা ও বিপুল অলঙ্কার-ভারে প্রপীড়িতা হইয়া স্কুলে গমন করে, সে দৃশ্যই প্রকৃত মনোজ্ঞ। তাহাদের বাল্য-বিবাহ এবং পরে পর্দ্দার অন্তরালে নির্ব্বাসন প্রভৃতি যে সকল রহস্যকর বিষয় তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহা কল্পনা-পথে আনয়ন করাও বিস্ময়াবহ।

একটী সাধারণ কথা বলিলে বোধ হয় তাহা অভ্রান্ত সত্য হইবে যে, ভারতীয় বালিকাগণ শীঘ্র শীঘ্র পাঠাভ্যাস করিতে পারে;—আমি যে কয়েকটি বালিকা দেখিয়াছি, তাহারা অনেক ইংরাজ বালিকা হইতে শীঘ্র লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী অনেক কার্য্যে অভ্যস্থ হইয়াছিল। স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে আমার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল—পুরস্কার বিতরণ। পুরস্কার গ্রহণকালে

গৃহীতার চঞ্চল চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যথেষ্ট আমোদ অনুভব করা যায়। একদা একটী লজ্জাশীলা ছোট বালিকা আমাকে তাহার পুরস্কার ফিরাইয়া দিয়াছিল; কারণ তাহার এক প্রতিবেশিনীর পুরস্কার হইতে তাহা কম চাকচিক্যশালী ও নয়নমুগ্ধকর হইয়াছিল এবং প্রকৃতই আমি তাহাকে এরূপ একটী অপছন্দকর দ্রব্য দানের জন্য লজ্জিত হইয়াছিলাম।

শিমলা এবং বারাকপুরের জেনানা স্কুলের মেয়েরা সময় সময় আমার উদ্যানে আসিত। ছোট ছোট বালিকারা তাহাদের বালা এবং অনন্ত হাত হইতে বাহির করিয়া রুমালে বাঁধিয়া, তাহাদের বিশ্বাসী লোকের নিকট রাখিয়া, ইংরেজ বালক বালিকাদিগের ন্যায় যখন লম্ফঝম্ফ দিয়া ক্রীড়া করিত, তাহা দেখিয়াও আমার যথেষ্ট আমোদ হইত।

এই সকল বিদ্যালয় মিশনারী স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধানে আছে এবং ভারতীয় নারীদিগের বর্ত্তমান ও ভাবী বংশধরের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। যে সকল জননী তাঁহার কন্যার পাঠের প্রতি প্রত্যহ দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারা তাঁহাদের কন্যাকে সুশিক্ষিতা দেখিতে ইচ্ছুক এবং এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে আদেশ করিয়া থাকেন। আশা করা যায় যে, পরে অনেকেই এই সুবিধা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

আমি যে সকল দেশীয় প্রধান বালিকাবিদ্যালয় দর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে মহিশূরের মহারাণীর হাই কাষ্ট স্কুল (High cast School) একতম। ইহা সম্পূর্ণরূপে দেশীয়দিগের তত্ত্বাবধানে আছে এবং ইহার কার্য্য সৌকার্য্যের প্রত্যেক বিবরণ বিবেচনার যোগ্য। এখানে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সকল পুস্তকে অধীত হয়, পিতামাতাদিগের কুসংস্কার, জাতিভেদের প্রাধান্য—এ সমস্তই আলোচনার যোগ্য। প্রাইমারি স্কুলে যে সকল পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ত এখানে অধীত হয়ই;

উপরন্তু সঙ্গীত, পাকপ্রণালী ও হাইজিন্‌ও শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যাহাতে বালিকারা সৎস্বভাবা হয়, উপযুক্ত স্ত্রী এবং পরে বুদ্ধিমতী মাতা হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। এই স্কুলের অপর একটী বিভাগ পরিদর্শন করিয়া আমি আরো অধিক সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। এখানে জননীগণ তাঁহাদের শিশুসন্তানকে হস্তে করিয়া তাঁহাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

যে সকল ভারত রমণী হাইস্কুলে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীতে পাঠ করিয়াছে—মোটের উপর যাহারা শিক্ষিতা, তাহাদিগকে আমি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করি। পূর্ব্বদেশে সাধারণত পর্দ্দার সুকঠিন নিয়মভঙ্গ করা এবং স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা বলিলে—লাম্পট্য ও ফরাসী উপন্যাসের ন্যায় কিছু বুঝায়। ভারতে এরূপ নহে, আমি তথায় যে সকল শিক্ষিতা রমণী দেখিয়াছি, স্ত্রীজনোচিত সমস্তগুণে তাহারা বিমণ্ডিতা। তাহাদের চরিত্রের কোন অঙ্গই হীন নহে, তাহাদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে স্বল্পমাত্র অভিযোগও আমি শ্রবণ করি নাই।

পারসী রমণীদিগকেও ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে। তাহারা স্বভাবত চতুরা সুশিক্ষিতা। তাহারা দেশীয় আড়ম্বরহীন পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া অবাধে সমাজে যাতায়াত করে, সেখানে তাহারা অতি সম্মানিতা সভ্য। তাহাদের কথা উল্লেখ না করিয়া ভারত-ললনার জীবনের কোন উজ্জ্বলতর অংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বারমিজ্ স্ত্রীলোকদিগের কথাও উল্লেখ না করিয়া আমি নিরস্ত হইতে পারিলাম না। তাহারা ভারতীয় রমণীগণ হইতে আকৃতিতে, আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহারা এত বলিষ্ঠা ও কর্ম্মঠা, এত উৎসাহিনী এবং ধীশক্তিসম্পন্না, তাহারা এত দুরূহ কার্য্য সম্পন্নক্ষমা এবং এত অসঙ্কোচে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে যে,

কোন অপরিচিত ব্যক্তি বর্ম্মায় গমন করিলে তাহার হৃদয় এক অব্যক্ত আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়।

এখন আমি তিনটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করিব,—বাল্যবিবাহ, বৈধব্য এবং চিকিৎসা। বাল্যবিবাহকে বিশদরূপে বর্ণন করিতে হইলে উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। প্রথম—বিবাহসম্বন্ধ স্থির, দ্বিতীয়—বিবাহ। বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলেই একরূপ বিবাহ হইয়া যায়। সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর যদি পাত্র কাল-কবলে পতিত হয়, তবে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন না হইয়া থাকিলেও বালিকাকে বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হইতে হয়। বিবাহ সম্বন্ধ পূর্ব্বে স্থির করার কারণ, সুপাত্রের অসদ্ভাব এবং বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্নার্থ অধিক ব্যয়;—ইহা বালিকার পিতামাতার স্কন্ধেই পতিত হয়। ইহার ফলে অসংখ্য কুমারী দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। পাশ্চাত্যগণ এই প্রথার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারে না;—কিন্তু ইহার সহিত ধর্ম্মভাব বিজড়িত আছে এবং ভারতবাসীরা তাহাদের শাস্ত্রের অনুজ্ঞা অনুসারে ইহা পালন করে, কাজেই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব।

ভারতবর্ষে সাধারণত কন্যার দশবৎসর বয়ক্রম কালে বিবাহ হইয়া থাকে। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যে দিক ধরা যায়, সেই দিক দিয়া ধরিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া গর্হিত। একটী বালিকা কখনো স্ত্রী বা জননী হইতে পারে না,—তাহার স্বাস্থ্য শান্তিপ্রদান করে এবং তাহাদের বংশধরগণ শারীরিক এবং মানসিক তেজশূন্য হয়। ইয়ুরোপীয় দেশসমূহে যে বয়সে কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে, তদপেক্ষা অল্প বয়সে ভারতে বিবাহ হইয়া থাকে এবং একটী অনুরাগী সংস্কারক এই পর্য্যন্ত আশা করিতে পারে যে, ইহা হইতে ২।৩ বৎসর পর বিবাহ হইলে কতকটা উপযোগী হয়। দেখা গিয়াছে ভারতে পাঁচজনের মধ্যে একটী বিধবা, তন্মধ্যে বিবাহের

পূর্ব্বে কেবল সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর দশবৎসর বয়সের মধ্যে বিধবা হইয়াছে এইরূপ বিধবার সংখ্যাও কম নহে। তাহাদের দুঃখের কারণ এই যে, স্বামীই তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য এবং অবলম্বন। সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিতা হইলে সর্ব্বসাধারণের চক্ষে অলক্ষণা প্রাণী বলিয়া বিবেচিত হয়। মুণ্ডিতশীর্ষ, শ্বেতপরিচ্ছদ, অলঙ্কারশূন্যতা, বিলাসবর্জ্জন এ সমস্ত অপ্রমাণিত নিষ্ঠুরতা নহে,—ইহা অকূল শোকসন্তাপের নিদর্শন। স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া তাহারা এই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে। বিধবাদিগের এই সংস্কার কিরূপে মন্দীভূত করা যাইতে পারে তাহা আমার বিবেচনায় আইসে না। আমার বিশ্বাস, কেবল স্ত্রী-শিক্ষা এবং স্ত্রীজাতির মানসিক উন্নতিতে, পুরুষগণ এই নিয়মের কিছু পরিবর্ত্তন করিতে ব্যগ্র হইবে ও যখন তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে, স্ত্রীজাতি কেবল অস্থাবর সম্পত্তি স্বরূপ নহে; তাহাদের সহযাত্রী ও সাহায্যকারিণী, তখন এই মন্দ-ভাগিনীদের অবস্থা, স্ত্রীস্বরূপেই হউক বা বিধবাস্বরূপেই হউক—তাহাদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখবর্ত্তী হইবে।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, ভারতীয় রীতিনীতি সঠিক বলা অসম্ভব বলা সহজ বলিয়া মনে হইতে পারে, বস্তুতঃ তাহা নহে। আর একটী কথা, ভারত-ললনা পুরুষ চিকিৎসক পছন্দ করে কি না? এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে।

বহুতর বিপরীত উক্তি সমূহ আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে—পুরুষচিকিৎসক কোনক্রমেই অন্দরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। তাহারা কেবল অতি শঙ্কটাবস্থায় অভ্যর্থিত হয়, কিন্তু সামান্য পীড়ায় কিম্বা কঠিন পীড়ার প্রথমাবস্থায় তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। চিকিৎসকগণ ভারতীয়দিগের পবিত্র অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে পারিলেও, রোগীর দৈহিক অবস্থা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা

করিতে পারে না। মসারি একটু উঠাইয়া তাহাকে রোগীর শরীরের তাপ, নাড়ির গতি পরীক্ষা করিতে হয়, বড়জোর রোগীর জিহ্বাটা দেখিতে পায়। প্রসূতির কোন পীড়ায় পুরুষচিকিৎসককে ডাকা হয় না এবং সমস্ত স্ত্রীব্যাধি ও দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ায় ভারতীয় ললনাগণ কোনপ্রকার চিকিৎসা পায় না।

যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন না, কিম্বা যাঁহারা এ বিষয় চিন্তা করেন না, তাঁহাদের নিকট কোন উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। মিশনারীদিগের কথা নাই বা বলিলাম, আমার মতে ভারতীয় ভগিনীদিগের প্রভূত উপকার সাধন করিতে হইলে যাহাতে তাহাদের পীড়ার রীতিমত চিকিৎসা হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

লেখিকা পরিশেষে বলিয়াছেন যে, আমার কথার বিস্তর প্রতিবাদ হইতে পারে তাহা আমি বিবেচনা করি। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের জীবনের পরীক্ষা অতি আশ্চর্য্যকর ও কঠিন। কেবল একটীমাত্র জাতি বা সম্প্রদায়কে যে এইরূপ পরীক্ষা করা হয় তাহা নহে, একটী গ্রামের কোন গৃহস্থকেই বাদ দেয় না; এই নিমিত্ত তাহারা আমাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করে। ভারতীয় রমণীগণের দুঃখে আমি যতই কেন বিগলিত না হই, তাহাদের আনন্দের কারণটিও বিস্মৃত হইতে পারিব না। নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে স্নেহ-চক্ষে দেখিতে পারিব ও তাহাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা চিরকাল উচ্চ থাকিবে, কেন না আমি ভারতে সুখী স্ত্রী ও সুখী জননী দেখিয়াছি এবং সুখী ভারতীয় পরিবারের প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ১৩১০। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হেমচন্দ্র।

একপ্রকার শোক আছে যাহাতে শোকের বেদনা আছে, কিন্তু চাঞ্চল্য নাই; যাহাতে আমরা নিজ নিজ ধর্ম্ম করিয়া যাই, কিন্তু একটা অভাব অনুভব করি। সে দিন হেমচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদে বঙ্গদেশ এইরূপ শোক অনুভব করিয়াছে। ইহা ব্যক্তি বিশেষের শোক নহে, জাতীয় শোক।

জাতীয় শোক সর্ব্বত্র সম্ভব নহে;—কলহপ্রিয় অসভ্য সমাজে ইহা হইতে পারে না। সভ্য সমাজে আমরা ব্যক্তিগত জীবন ভিন্ন একটা সামাজিক জীবন অনুভব করি। যেমন আত্ম জীবনে ঘা লাগিলে ব্যথা পাওয়া যায়, সেইরূপ সামাজিক জীবনের আঘাত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। হেমচন্দ্রের মৃত্যু বঙ্গের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে, কারণ তিনি আমাদের সামাজিক জীবনের অবলম্বন ছিলেন।

আমাদের জাতীয় অভাব তিনি ভিন্ন কে আর অমন করিয়া প্রকাশ

করিবে? ভারতের অতীতের উজ্জ্বল চিত্র সম্মুখে ধরিয়া কে আর বর্ত্তমানের দাম্ভিক সভ্যতার সম্মুখে নৈরাশ্যকে সান্ত্বনা দিবে? কে বুঝাইবে

এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইলে ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে জলধির জলে
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নখর দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ সন্তানে
সমর হুঙ্কারে কাঁপিত অচল
নক্ষত্র অর্ণব আকাশ মণ্ডল,
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে।

কে আর তাঁহার মত দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব বাঙালীর প্রাণে উদ্যম ও আশা জাগাইয়া দিবে!

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলাসাহিত্য এক উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছে। আমাদের জাতীয় গৌরবের কিছু ছিল না—সংস্কৃতসাহিত্য শুধু আমাদের নহে; কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য এক গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজি শিক্ষার ফলে ইহার শুষ্ক নদীগুলিতে স্রোত বহিয়াছে—বঙ্গভাষা আজ জীবন্ত; বঙ্গভাষায় আজ কবিতা, ইতিহাস, উপন্যাস ও নাটকের অভাব নাই। বঙ্গকবিতা আর যমুনা পুলিনে বদ্ধ নাই—হেমচন্দ্র তাহাকে সমাজে টানিয়া আনিয়াছেন। সেখানে সে যে গান গাহিয়াছে, তাহাতে বঙ্গসমাজ জাগিয়া উঠিবে আশা করা যায়। হেমবাবুর মৃত্যু কে না বঙ্গের মহা ক্ষতি বলিয়া অনুভব করিবে? যে জলন্ত প্রাণ "বাজরে সিঙা বাজ এইরবে" লিখিয়াছিল, যে উদ্যম কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চে উঠিয়াছিল, তাহার দুঃখময় পরিণামে কে না ব্যথিত হইবে? হেমচন্দ্রকে আমরা তাঁহার অসীম স্বদেশপ্রেমের কি প্রতিদান দিয়াছি? বিলাতি কবির সমাধি দেখিতে দেশ দেশান্তর হইতে শত সহস্র লোক আসিয়া থাকে, বারাণসীধামে বাঙালার অন্ধ কবিকে দেখিতে কয়জন বাঙ্গালী গিয়াছিল?

হেমচন্দ্রের জীবনী লিখিত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাঁহার কবিতার অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

কবিতার প্রাণ কি তাহা আমরা এখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই। কি গুণে ইহা সমগ্র মানবজাতির এত প্রিয় ও কি গুণে ইহা এত বিশ্বব্যাপী? এমন জাতি নাই যে জাতির মধ্যে একজন কবি জন্মগ্রহণ করে নাই, এমন মনুষ্য নাই যাহাকে কবিতা অভিভূত করিতে পারে না। কবিতার ন্যায় চিত্র ও সঙ্গীতের আমাদের মনের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। তাহাতে মনে হয় সঙ্গীত, চিত্র ও কবিতার মধ্যে কোন একই স্রোত বহিয়া গিয়াছে।

শুনিয়াছি সৌন্দর্য্য-সৃজন কবিতার জীবন। সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে? কোনও জিনিষ সুন্দর, কোনও জিনিষ কুৎসিৎ কেন? অভ্রভেদী শুভ্র হিমালয়, রজতরেখাসম স্রোতস্বতী, নীল অকূল জলরাশি, তারকাবিরাজিত আকাশ, নির্ম্মল আকাশে চন্দ্র, একখানি মুখ, যুদ্ধে বীরের

আত্মত্যাগ এ সকলের মধ্যে কি আছে যাহাতে ইহাদের আমাদের চক্ষে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে? আবার যাহা আমাদের কাছে সুন্দর, তাহা অন্যের কাছে কুৎসিৎ। প্রাচীন ঋষিদিগের সুন্দর সরল জীবন, ইংরাজের চক্ষে আলস্য; ইংরাজের বর্ত্তমান সভ্যতা অনেকের চক্ষে বর্ব্বরতা। এই সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের কি মূল তাহার তথ্য বাহির করা সুকঠিন।

বাহ্যসৌন্দর্য্যের মূল অন্তরে। বস্তু অবলম্বন করিয়া মানসিক ভাবের যে বিকাশ, তাহাই সৌন্দর্য্য। যাহা সুন্দর তাহা তাহার সৌন্দর্য্যের জন্য আমাদের মনের উপর নির্ভর করে। যে হিমালয় দেখিয়া অনেকে পাগল হইয়া গিয়াছে, অনেকে তাহার দু'এক খানা ফটো তুলিয়া নিরস্ত হয়। তাজের সৌন্দর্য্য অনেকটা সাম্রাজ্ঞী মোমতাজের কাহিনী ও শিল্পজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। নদীর কুলু কুলু ধ্বনিতে যে উন্মাদকর সঙ্গীত আছে, তাহা ভাবুকেরাই শুনিতে পায়,—নৌকাবিহারি-মাঝির কর্ণে পৌছায় না। সান্ধ্য কাননবক্ষে নীরবতার যে সৌন্দর্য্য, সন্তানাগমন প্রতীক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মানা মাতৃহৃদয়ের যে সৌন্দর্য্য, বিরহে "আশা পথ চাহি" রমণী-হৃদয়ের যে সৌন্দর্য্য তাহা বাহ্যিক নহে।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক হিমালয় অত সুন্দর ও কয়লার খনি অত কুৎসিৎ কেন? আমার মনে হয় হিমালয়ের সহিত মানব হৃদয়ের আদর্শের একটা সাদৃশ্য আছে, কয়লার খনির সহিত নাই। বাহ্য-জগতের যাহাতে আমাদের আদর্শের কোনও অংশ বিকাশ হইয়াছে, তাহাই সুন্দর। সমস্ত মানবজীবনে একটা আদর্শ আছে, যাহা আমরা আদর্শের খাতিরে ভালবাসি। অনেক জিনিষ আছে, যাহার আদর অন্যের উপর নির্ভর করে। অর্থপ্রিয়তা অর্থজনিত যে সচ্ছন্দ তাহার জন্য। মাতা আপন সন্তানকে "আমার" বলিয়া যে ভালবাসেন তাহা সৌন্দর্য্যপ্রীতি নহে।

সৌন্দর্য্যপ্রীতির এই নিস্বার্থভাব হইতে আমার বোধ হয় ইহা

আমাদের আদর্শপ্রীতির উপর নির্ভর করে। বলিয়াছি সমস্ত মানবের একটা না একটা আদর্শ আছে, যাহা আমার হওয়া উচিৎ ও যাহা আমি নহি। উচ্চে যতই উঠি, আদর্শ তত সরিয়া যায়; তাই মানবসমাজ স্থির নহে, তাই ব্যক্তি বিশেষের দোষ থাকিলেও মানবসমাজে একটা উন্নতির স্রোত দেখা যাইতেছে। কেন এই উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শ মানব-হৃদয়ের উপর প্রভুত্ব করে, তাহার কারণ নির্দ্দেশের সময় ইহা নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যাহা আমাদের আদর্শ তাহা আমরা কাল্পনিক মনে করি না; উহা কাল্পনিক হইলে এত বিশ্বব্যাপী ও ক্ষমতাশালী হইতে পারিত না।

এই আদর্শপ্রীতি সৌন্দর্য্যপ্রীতির মূল। যাহাকে আমরা আদর্শের মধ্যে আনিতে পারি তাহা সুন্দর, যাহা পারি না তাহা কুৎসিৎ। মানব সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে, তাই আদর্শও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং তাই সৌন্দর্য্য-প্রীতির প্রভেদ দেখা যায়।

যাহা সুন্দর নহে তাহাতে ভাবের সঞ্চার কর,—সুন্দর হইয়া উঠিবে। বঙ্কিমের ভ্রমর কালো, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য অপরিসীম। যাঁহারা রবীন্দ্রের কুরূপার খেদ পড়িয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে সেই মলিনমুখী অতি সুন্দরী। সন্ধ্যা ও প্রভাতে ভাব সঞ্চার কর তাহারা রমণীয় হইয়া উঠিবে। মনে হইবে সন্ধ্যা শান্ত মলিন, উষা প্রকাশ ও উজ্জ্বল। সন্ধ্যা ভাবিতে জানে, কাঁদিতে জানে, বেদনা লুকাইতে জানে, সহ্য করিতে জানে। উষা প্রফুল্ল, মধুর, অধীর, কোলাহলময়। বসন্ত যেন কিছু উজ্জ্বল, কিছু প্রকাশ, কিছু অধীর; শরৎ যেন বিষাদ-মাখা, নীরব। রজনীর তারকা বিরাজিত আকাশ ও অভ্রভেদী নগেন্দ্র সুন্দর; কারণ আমাদের আদর্শের মহত্বের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে। ক্ষুদ্রতা হইতে এড়াইতে চাহি, তাই মহান্ দৃশ্য আমাদের চক্ষে সুন্দর। নদী সুন্দর, কেননা ইহা অতীতের মহাশোক গাহে

ও রমণীর ন্যায় আমাদের জীবন রক্ষা করে; ইহার দুই পার্শ্বের শ্যামল শস্যক্ষেত্রের ইহাই জীবন। কাননের নীরবতা মধুর; কারণ ইহা আমাদের আদর্শ শান্ত জীবনের সমতুল,—এই কোলাহলময় জীবন হইতে ক্ষণেক শান্তি প্রদান করে। পল্লীর ক্ষুদ্র পদ্ম, সচ্ছল গৃহস্থ কুটীর সুন্দর; কারণ তাহা সচ্ছল পল্লীজীবনের পরিচয় দেয়। প্রভাতে পাখীর গান, শিশুর আধ আধ ভাষা, বসন্তের উৎফুল্লতা, শরতের রৌদ্র ইহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য আছে,—তাহা সকলের চক্ষে পড়ে না; কারণ তাহা বাহ্যইন্দ্রিয়ের অতীত। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভিন্ন মানব-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য কোন্ কবি না দেখাইয়াছেন? মাতার স্নেহ, জায়ার প্রেম, ভগিনীর যত্ন, বীরের স্বার্থত্যাগ সকলের কাছেই সুন্দর; কারণ তাহারা আমাদের আদর্শের অন্তর্গত।

সঙ্গীতের সৌন্দর্য্যও ভাবের উপর নির্ভর করে। চিত্রের শোভাও বর্ণে ভাববিকাশের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। চিত্র ও কবিতার প্রভেদ কি? প্রস্তরে ভাববিকাশ কঠিন, কারণ উপাদান অতি কঠিন ও ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশে বাধা দেয়। চিত্রে ভাব প্রকাশ অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তথাপি ভাব সম্পূর্ণ হইয়া পরিস্ফুট হয় না। সীতার ও শকুন্তলার যে চিত্র আমাদের হৃদয়ে আছে, তাহা কোনও চিত্রকর আঁকিতে পারে নাই। তাহাতে শকুন্তলার সারল্য নাই, শান্ত তপোবন বাসিনীর স্নিগ্ধতা নাই। ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল সমীরে যমুনাতটে রাধার সে ব্যাকুলতা কোন্ চিত্রকর আঁকিতে পারে? অশোক কাননে সীতা, কৈলাস ধূর্জ্জটী পাদমূলে পুষ্পোপহারসমন্বিতা গৌরী, স্বয়ম্বরক্ষেত্রে অজসম্মুখে ইন্দুমতী কোন্ চিত্রকর দেখাইতে পারে?

এই স্থূল সৌন্দর্য্য ভিন্ন, জ্ঞান ও নীতির আর কতকগুলি বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে। আমরা বিক্ষিপ্ত দ্রব্যের মধ্যে একতা ভালবাসি, তাই system অতি সুন্দর। সত্য আমাদের অতি প্রিয়, তাই কবিতা-মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত সত্য কবিতার শোভা বাড়াইয়া দেয়।

যদি সৌন্দর্য্যের মূল বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে কবিতা কি বুঝিতে পারিব ও হেমচন্দ্রের স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিব। কবিতা, চিত্র ও সঙ্গীতের ন্যায় সৌন্দর্য্য বাহ্যজগৎ হইতে আহরণ অথবা কাল্পনিক জগতে সৃজন করে। ইহার মূল সহানুভূতি ও আত্মত্যাগ। যে আত্মব্যূহ হইতে বাহিরে আসিতে পারে না, সে কবি নহে। কবিকে বাহিরে আসিতে হইবে ও জগতের বিশাল জীবনের সহিত মিশিতে হইবে। এই আত্মত্যাগ ও সহানুভূতি শুধু কবিতা নহে, সকল ধর্ম্মের মূল। যে ধার্ম্মিক, সে সামাজিক জীবন হইতে বাহির হইতে পারে না,—অন্যের দুঃখ তাঁহার দুঃখ, অন্যের সুখ তাঁহার সুখ। যে গৃহী, সে নিজ পরিবারের মধ্যে নিজকে বিস্তৃত করিয়াছে। আমরা অনেকে নিজ গ্রামকে, নিজ পল্লীকে, নিজ দেশকে আপন অপেক্ষা ভালবাসি; নিজ নিন্দা অপেক্ষা আমাদের গ্রামের বা দেশের নিন্দায় বিরক্ত হই;—এই বাহ্যজীবন-স্পৃহাই কবিতার প্রাণ। পূর্ব্বকালে আত্মজীবন অপেক্ষা বাহ্যজীবনের প্রভাব ছিল, তাই বর্ত্তমান কালে কবির সংখ্যা অত কম। এই কথার প্রমাণ দিবার আবশ্যক। মেকলে বলিয়াছেন যে, পুরাকালে কবিতা সহজ, কারণ অন্ধকারে আলোকের ন্যায় তখন অজ্ঞানতার কল্পনা অতি তীক্ষ্ণ ছিল। কিন্তু এই হেতুবাদ আমাদের সন্তোষজনক মনে হয় না। কল্পনা মানবের একটা মানসিকবৃত্তি, চিরকাল থাকিবে; কেবল জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বস্তু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কল্পনা এক্ষণে ভূত-প্রেত ছাড়িয়া বিজ্ঞানে গিয়াছে। বিজ্ঞানে যে সর্ব্বত্র কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বাহির হইতেছে, তাহা প্রবল কল্পনার ফল। সুতরাং আমার মনে হয় বর্ত্তমান কবিতা হ্রাসের কারণ কল্পনার হীনতা নহে। ইহা সহানুভূতি ও সামাজিক জীবনের অভাব। পূর্ব্বে

ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা সামাজিক জীবন প্রবল ছিল। যে ব্যক্তি যে জাতির অন্তর্গত, সেই জাতীয় উন্নতি সে নিজ উন্নতি মনে করিত। যাহা জাতীয় জীবনের প্রবর্দ্ধক তাহাই ভাল, যাহা ক্ষতিজনক তাহাই মন্দ। নীতি তখন সামাজিক মত, বিবেক সামাজিক মতের প্রতিবিম্ব। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, পাড়ায় দুর্গাপূজা হয় নাই বলিয়া, সেই পাড়ার লোক লজ্জায় মরিয়া গেছে। এই যে আত্ম-জীবন ছাড়িয়া বাহিরের জীবনে মিশিবার প্রবৃত্তি তাহা হইতে আমরা পরিবারপ্রীতি, প্রতিবাসিপ্রেম, দেশহিতৈষিতা, বিশ্বজনীনপ্রেম পাইয়াছি। কবিতা, সঙ্গীত ও চিত্রের ইহাই হেতু।

পুরাকালে সামাজিক জীবন ভিন্ন উপায় ছিল না। সকলে সমাজের অঙ্গ ছিলেন এবং সমাজ শাসনও দৃঢ় ছিল। আগে সমাজ তাহার পর ব্যক্তি। তাই সমাজের চক্ষে ব্যক্তির মূল্য ছিল না। ভারতে ব্রাহ্মণ সন্তানকে বেদ পাঠ করিতে হইবে—তাহার রুচি কি দেখিবার প্রয়োজন নাই। Greek সমাজে প্রত্যেক কর্ম্মঠ ব্যক্তিকে যুদ্ধে যাইতে হইবে। বিভিন্ন ধর্ম্মমতও সমাজ সহ্য করিত না;—সক্রেতিসের মৃত্যু, ইউরোপে ধর্ম্ম-বিপ্লব ইহার প্রমাণ। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন ক্রমে সমাজের উপর জয়লাভ করিল। ফরাসিবিপ্লব ও ইউরোপের ধর্ম্মসংস্কার দেখাইল, ব্যক্তিগত অধিকার সমাজ চিরকালের জন্য দমন করিতে পারে না। সমাজ ব্যক্তির জন্য, ব্যক্তি সমাজের জন্য নহে; church ব্যক্তির জন্য, ব্যক্তি churchএর জন্য নহে। ধর্ম্ম জ্ঞানের নিকট অন্ধ বিশ্বাস আদায় করিতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে এখন স্বতন্ত্র জীবন সম্ভব। একজন সামাজিক জীবনে যোগ দিলেও দিতে পারে, বিবাহ না করিলেও করিতে পারে, যুদ্ধে না যাইলেও যাইতে পারে। সমাজে এই স্বতন্ত্র জীবনের স্রোত দেখা দিয়াছে। সমাজের শাসন শিথিল, একান্নবর্ত্তী

প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে; পাড়ায় পূজা হইলে এখন সকলে যোগ দেয় না। বারোয়ারী প্রায় উঠিয়া গেল।

এই স্বতন্ত্র জীবনের মূল স্বার্থপরতা। সামাজিক জীবনের অর্থ স্বার্থত্যাগ। ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ সমাজের মূল। আমি যদি কোনও দলে যোগ দিই, দলের নিয়ম আমায় মানিতে হইবে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে সকলকেই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সমাজে সমাজের আইন মানিতে হইবে। একসঙ্গে থাকিলে প্রত্যেকের যে একটু স্বার্থত্যাগ করিতে হয়, আইন তাহা আদায় করে।

বর্ত্তমান সমাজে স্বতন্ত্র জীবনের যে লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্বার্থপরতা ভিন্ন আমি কিছুই দেখিতে পাই না। ইহা হইতে আর এক প্রকার সামাজিক জীবন উঠিতেছে যাহার মূল স্বার্থপরতা। যেমন ইংলণ্ডের Imperialism। এই স্বার্থপরতা জীবন-সংগ্রামে যতই সাহায্য করুক না কেন, ইহা কবিতার ও নীতির চিরবিরোধী। কবিতা সৌন্দর্য্য সৃজন করিবে? ইহাকে সৌন্দর্য্যের সহিত মিশিতে হইবে,—স্বার্থ ভুলিতে হইবে। যে জগতের সৌন্দর্য্য দেখাইতে চাহে, মানব-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দেখাইতে চাহে, দেশহিতৈষিতার সৌন্দর্য্য দেখাইতে চাহে তাহার আত্মবিসর্জ্জন আবশ্যক। যে কেবলমাত্র টাকার জন্য ছবি আঁকে, তাহার চিত্রে প্রাণ রহিবে না।

এইজন্য বর্ত্তমান সমাজে কবিতার হ্রাস দেখা যায়। জীবন এখন আর সহজ নহে, স্বার্থত্যাগ কঠিন। যখন জীবন সহজ ছিল, গঙ্গার নির্ম্মল বারি, বৃক্ষের সুপক্ক ফল, স্নিগ্ধ গাভীদুগ্ধ আমাদের জীবন রক্ষা করিত, তখন আমাদের অবসর অনেক, চিন্তা অনেক, স্বাধীনতা স্বাভাবিক; তাই প্রাচীন ভারতে কবিতার ছড়াছড়ি। রামায়ণ, মহাভারতের তুল্য কোন্ কাব্য? তাই আমাদের সামাজিক নিয়ম এবং আচার-ব্যবহারেও কবিতা মিশিয়া গেছে। তাই হিন্দুবিবাহ অত

মধুর, অতিথিসৎকার অত উচ্চ, ব্রহ্মচর্য্যপ্রথা অত মহান্। দুর্গাপূজা আজও বাঙালী জীবনে কবিত্ব। তখন সারা বরষের আশা মিটিয়াছে। আমাদের কোন প্রথা কবিত্বময় নহে?

ইহার সহিত বর্ত্তমানের তুলনা কর। জীবন-সংগ্রামে ক্লিষ্ট ইংরাজ কারখানার কল ও আগুনের মধ্যে তাহার জীবনটা কাটাইয়া দিল। তাহার কঠিন শুষ্ক কর্ম্মের মধ্যে চিন্তার অবসর নাই। কিছু টাকা তাহার জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে জানিলনা পত্নীপ্রেম, অপত্যস্নেহ ও পরিবারের কোলাহলমধ্যে যে প্রচুর আনন্দ আছে। শান্তিপূর্ণ-গৃহে সন্ধ্যার প্রদীপে শিশুর হাসি ও কোলাহল মাতার আদর সে দেখিতে পাইল না। একথা শুধু ইংরাজের পক্ষে খাটে না। সমস্ত সমাজেই কঠিন পরিশ্রম কবিতা বিলুপ্ত করিতেছে। কলমনিষ্পেষিত বাঙালীর মধ্যে কয়জন কবি?

অতএব কবিত্বের মূল বিশ্রাম, চিন্তা ও স্বার্থত্যাগ। প্রাচীন বঙ্গে তাই কবিতার অত প্রাদুর্ভাব, বর্ত্তমানে কবি তিন চার জন মাত্র।

কবিতার প্রাণ যদি আমরা বুঝিয়া থাকি, দেখা যাউক ইহাকে কোনও রূপে ভাগ করা যাইতে পারে কি না, তাহা হইলে হেমচন্দ্রের স্থান আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারিব।

দেখাইয়াছি কবির ধর্ম্ম সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্র প্রকৃতি ও মানব-হৃদয়। মানব-হৃদয় দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—এক সামাজিক মানবহৃদয়, আর এক পৃথক মানব-হৃদয়। সামাজিক মানব-হৃদয় সমাজের উন্নতি, স্বাধীনতা ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে। ইহার নিকট বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ সমাজপ্রীতি অতি সুন্দর। ইহা সমর চাহে, দরিদ্র স্বাধীনতার দুঃখ চাহে, সম্পন্ন অধীনতার সুখ চাহে না। অধীনতা ইহার শেলসম, সমাজের মঙ্গলেচ্ছায় গৃহ, স্নেহ, পরিবার সব বিসর্জ্জন দিতে রাজি আছে। বিজেতাকে দেখাইতে চাহে এক সময় ইহারও স্বাধীনতা ছিল, এক সময় ইহারও নিশান নৈঋত ঈশানে উড়িয়াছিল।

পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত মানব-হৃদয় মানব-হৃদয়ের নিভৃত সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বাহির করে। এখানে সমরের কোলাহল নাই, সমাজের বাকবিতণ্ডা নাই। এখানে শুধু সমাজের আড়ালে হৃদয়ের ছবি। এখানে হাসি আছে, বাঁশি আছে, বেদনা আছে! মিলনের সুখ, বিরহের ব্যথা, জননীর স্নেহ, ভগিনীর যত্ন। নীরব মঙ্গল পল্লীগৃহ, গ্রামপথে কলসীকক্ষে কোলাহলময়ী রমণী। এখানে মর্ম্মব্যথা, প্রতীক্ষা, আশা ও নৈরাশ। নদীর কুলুধ্বনি, জ্যোৎস্না রজনী, নীরব কুঞ্জবন, মলয় পবন। এই সমাজের আড়ালে মানব-হৃদয়ের কবিত্ব প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে চিরগ্রথিত হইয়া গিয়াছে। সামাজিক মানব-হৃদয়ের একমাত্র কবি হেমচন্দ্র; নিভৃত মানব-হৃদয়ের বর্ত্তমান কবি রবীন্দ্রনাথ।

হেমচন্দ্র সামাজিক মানব-হৃদয়ের কবি। যে হৃদয় স্বদেশের দুঃখে কাঁদিয়া উঠে, স্বাধীনতা চাহে, অপমান যাহার শেলসম, তিনি সেই হৃদয়ের কবি। এই হৃদয় রোদন চাহে না, কার্য্য চাহে, সহিষ্ণুতা চাহে না, বীরত্ব চাহে। এই সামাজিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হেমচন্দ্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহার অধিক প্রমাণ দিবার আবশ্যক নাই। আমরা সকলেই জানি ভারত-ভিক্ষা, ভারত-বিলাপ, ভারত-সঙ্গীত প্রভৃতিতে যে স্বজাতি-প্রীতি ও স্বদেশ-প্রেম আছে তাহা অন্যত্র বিরল। বলিয়াছি সামাজিক জীবন প্রেম অপেক্ষা, বীরত্বে সমরক্ষেত্রের যে এক কঠোর আনন্দ আছে তাহা আস্বাদ করিতে চাহে। যে জাতি অধীন ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে, তাহাকে জাগাইতে হইলে হেমচন্দ্রের ন্যায় কবির আবশ্যক। ভারত-ভিক্ষা পড়িয়া কাহার না প্রাণ সজীবতর হয়? আমরা জাতীয় গৌরব ভুলিতে বসিয়াছি। বিলাতী সভ্যতা ও অস্ত্র আমাদের চক্ষে ধাঁধা

লাগাইয়া দিয়াছে। মনে হয় আমরা অতি দুর্ব্বল, অতি ক্ষুদ্র, ঐ সর্ব্ব-গ্রাসি-রক্তাক্ত সভ্যতার সম্মুখে পতঙ্গসম। কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না, পূর্ব্বে—

ভারত কিরণে জগতে কিরণ
ভারত জীবনে জগতে জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র আলোচন,
আছিল যখন ষড় দরশন,
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে, পূজিত সকলে,
ফিনিক সিরিয়া যুনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা।
ছিল যার পরা কিরীট কুণ্ডল
ছিল যবে দম্ভ অখণ্ড প্রবল
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়
জলন্ত অনল সদৃশ শিখায়,
জগতে না ছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া দেহ পরশি
ডাকিত যখন জননী বলিয়া
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি উঠিত ছুটিয়া
ছিলাম তখন জগৎ মাতা।

যদি আমাদের জাতীয় মঙ্গল চাহি, হেমচন্দ্রের এই অতীতকে আমাদের জীবনে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বর্ত্তমান আছে থাকুক, শুধু এই উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সম্মুখে জাগরুক থাকুক, তাহা হইলে আমরা জাতীয় বিশেষত্ব ও গৌরব বজায় রাখিতে পারিব। হেমচন্দ্র

এইটুকু অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ এই শ্রেণীর কবিতাতে হইয়াছে। দেবতার পাতালে দুর্গতির অধীন জাতির দুর্গতির ছায়া মাত্র। বৃত্র পরাক্রমশালী ও অব্যর্থ শূল দ্বারা রক্ষিত। কিন্তু নৈরাশ্যের কারণ নাই—যদি কেহ দধিচীর মত পরহিতব্রত ও স্বার্থ-শূন্য থাকে, যে আত্ম ভুলিয়া সমাজের জন্য প্রাণ দিবে, সে দেবতাদের স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করাইতে পারে। এই সমাজপ্রীতির কবিত্বে হেম-চন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। তাই বৃত্রসংহারে সমরক্ষেত্রের বর্ণনা যত তেজস্বিনী—কে না রুদ্রপীড়ের সমর বর্ণনা পাঠে রোমাঞ্চিত হই-য়াছে? কে না মহাকায় পুত্রশোকাতুর বীরশ্রেষ্ঠ বৃত্রের বীরত্বের ভীষণ সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়াছে? কিন্তু এই অস্ত্রঝঞ্জনাময় রক্তাক্ত সম-রের পশ্চাতে হেমচন্দ্র দুইটি শান্ত সুন্দর হৃদয় দেখাইয়াছিলেন। তাহা-দের কথা পরে বলিব।

ভারত-ভিক্ষা, ভারত-সঙ্গীত প্রভৃতি কবিতাগুলি বাঙ্গালাসাহি-ত্যের এক একটি রত্ন। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। প্রাচীন বাঙ্গলা কবিতা ব্যক্তিগত হৃদয় ও তাহার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ অঙ্কনে অতুল-নীয়। কিন্তু তাহার প্রাণ রোদন, কার্য্য নহে, শান্তনীরব উপভোগ, সমরক্ষেত্রের তীব্র উদ্যম নহে। ঈশ্বরচন্দ্রে ব্যঙ্গরস বেশীমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে—তাহাতে সঞ্জীবনী শক্তি নাই। হেমচন্দ্রই প্রথমে আলস্য অপেক্ষা কঠোর উদ্যমের সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন, স্বাধীনতার চিত্র সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহাতে আমরা আমাদের অভাব বুঝিয়াছি ও নিম্নজীবনের যে অলস আনন্দ তাহা ত্যাগ করিয়া একটা উন্নতির পথ দেখিতে পাই-তেছি।

হেমচন্দ্রের সামাজিকতা আর একটি বিষয়ে বিশেষভাবে প্রতীয়-মান হইবে। তাঁহার বর্ত্তমান সমাজের রমণীর অবস্থার সহিত সহানু-ভূতি। ভারতকামিনী কবিতায় তাঁহার নারীজাতীর প্রতি গভীর

শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার ও স্বাধীনতার পক্ষে তাঁহার যুক্তি বড় অকাট্য।

কেনই থাকিব কিসের তরে
তনু বাঁধা দিয়ে গৃহের ভিতরে,
কারাবন্দিসম চিরহতাশ্বাস
কেনই তেজিব এমন বাতাস,
এমন আকাশ, রবির কিরণ
বিশাল ধরণী, রসাল কানন
প্রাণি-কোলাহল, বিহঙ্গের গান,
সাধের প্রমাদ, স্বাধীন পরাণ
কেনই তেজিব কিসের তরে।

কামিনীকুসুম কবিতায় হেমচন্দ্র বঙ্গরমণীর সৌন্দর্য্যের আভাস দিয়াছেন। কে না অনুভব করিয়াছে বঙ্গরমণী অতুলনীয়? যে তাহার নিজের অধিকার জানে না, যাহার নিজের স্বাতন্ত্র ইচ্ছা নাই, যে অন্যের মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া আছে। তাহাদের অধীনতা ও অনাদর তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। হেমচন্দ্র আমাদের সমাজের কবি।

সামাজিক সৌন্দর্য্যে হেমচন্দ্রের সমকক্ষ বিরল। এখন তাঁহার চরিত্রাঙ্কণ ও নিভৃত মানব-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দেখাইবার শক্তির বিচার করিব। ইহা স্বীকার করিতে হইবে চরিত্রে হেমচন্দ্র তত সিদ্ধহস্ত নহেন। দু'একটি ভিন্ন তাঁহার চরিত্রগঠন পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। বৃত্রসংহারে ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি আমার নিকট ছায়ার মতন মনে হয়, যেন রক্ত মাংস নাই, শুধু কথা কহিবার জন্য কবি তাঁহাদের অবতার করিয়াছেন। বঙ্কিমের ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, কমলমণি, কুন্দ, সাগরবৌ, শান্তি, কপালকুণ্ডলা, রাধারাণী; দীনবন্ধুর তোরাব, আদুরি, রাজীব, মল্লিকা, নদের চাঁদ, নিমে দত্ত; বঙ্কিমের প্রতাপাদিত্য, সরমা, হাসি, রঘুপতি,

গোবিন্দমাণিক্য, কুমার; শ্রীশচন্দ্রের করালি সিং, হৈমবতী জীবন্ত ও আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে;—থিয়েটারের কুন্দকে দেখিলেই বুঝিতে পারি ইহা আমাদের সে কুন্দ নহে। হেমচন্দ্রের এক শচী ও ইন্দুবালা ভিন্ন কোনও চরিত্র ফুটিয়া উঠে নাই। নৈমিষারণ্যে একাকিনী শচীর সেই সুখময় স্বর্গস্মৃতিপূর্ণ মর্ম্মকাতরতা, তাঁহার অসীম মাতৃস্নেহ, নন্দনকাননে কারাগারে ঐন্দ্রিলা সম্মুখে তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অনুপম রূপরাশি আমরা ভুলিতে পারি না। স্নেহময়ী, কোমলা ইন্দুবালাও সজীব। সেই পরদুঃখকাতরা, বিরহবিধুরাকে আমরা দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু রুদ্রপীড় ভাল করিয়া ফুটে নাই,—বীরের নিঃসহায়া রমণীহরণ-প্রবৃত্তি ভাল খাপ খায় নাই। ঐন্দ্রিলা শুধু নীচ বাসনার সমষ্টি—তাহা বৃত্রের পার্শ্বে বসিতে পারে না। চপলা, রতি অতি অস্পষ্ট —শুধু সখীর দরকার হইয়াছে বলিয়া যেন আনা হইয়াছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অঙ্কনে হেমচন্দ্র উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। বৃত্রাসুর বধে তাহার নৈমিষারণ্য যেখানে—

"পলাশ বল্লরী পুষ্প তরুণ লতায়
সুশোভিত নন্দনের সদৃশ শোভায়!
লতায় লতায় ফুল, লতায় লতায়
শিখিনী নারীর পুচ্ছে চন্দ্রক মালায়
ঝাঁকে ঝাঁকে সরোবরে ব্রততী উপরে
মধুলিহ পড়ে ঢলি সুখে মধুভরে",

দধিচীর কানন, যেখানে—

"নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন পল্লবরাজিতে
দেখিল্য খদ্যোত দ্যুতি শোভিছে কোথাও
সাজাইয়া তরুরাজি অপরূপ রূপে
কোটি মণি খণ্ড যেন অটবি মস্তকে",

নন্দন কানন, যেখানে—

"সুগন্ধ-মোদিত নিকুঞ্জ কাননে,
সুমন্দ মরুৎ আহ্লাদিত মনে
চলিয়া চলিয়া মধুর নিস্বনে
ছুটিছে চৌদিকে পড়িছে সঘনে
কুসুম কোলে!
ঝরে সুধা কণা তরু স্নিগ্ধকরি
ঝরে হিম যথা নিশিগন্ধা'পরি,
ছোটে কুঞ্জময় মধুর লহরী
সঙ্গীত বাদন শ্রুতিমূল ভরি
অতুল সুখে!"

বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালা, যেখানে—

"ভীমশব্দতায়, উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ
প্রকাণ্ড মুদ্গর-ধ্বনি, কোটী কোটী যেন
পড়িছে আঘাতি শূর্ম্মী; নিনাদি বিকট—
সহস্র বাসুকী সর্হ ভয়ঙ্কর যথা—
দগ্ধ ধাতু-স্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।"

অদ্ভুত ও অসাধারণ কল্পনার সৃষ্টি। অনেক সময় আমাদের কল্পনাতীত তথাপি তাহাদের একটা বিশাল অপরিস্ফুট সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু কতকগুলি চিত্র আমাদের আদর্শের সহিত মিলে নাই। হেমচন্দ্রের কৈলাস বর্ণনা আমার দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়—মনে হয় সেই মহান্ উচ্চভাব ভাল করিয়া ফুটে নাই। দধিচীর আশ্রম কণ্ব বা বশিষ্ঠের আশ্রমের পাশে ম্লান হইয়া যায়। আর একটি কথা বলা আবশ্যক, আপনারা সকলেই জানেন যে চিত্র দুইরকমে আঁকা যাইতে পারে। একরূপে বর্ণনীয় দৃশ্যের সমস্ত খুঁটি নাটি দেওয়া যাইতে

পারে, অন্যরূপে দুই একটি এমন খুঁটি নাটি দেওয়া যায় যাহার দ্বারা সমস্ত দৃশ্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। একটা সহজ দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক;—

"মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা,
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।
বৃষ্টি পড়ে দিবসরাতি
ছিল না কেউ খেলার সাথি
একলা বসে পেতেছিলেম
সাধের খেলা।
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা"

এই ছোট কবিতাটি কত সুস্পষ্টভাবে আষাঢ়ের মেঘান্ধকারে শ্যামল-বৃক্ষরাজিবেষ্টিত গ্রামমাঝে সেই নালার দৃশ্যটি চোখের সম্মুখে আনিয়াছে! তাই বিশদ বর্ণনা অপেক্ষা সাঙ্কেতিক বর্ণনার প্রভাব অধিক। হেমচন্দ্রের অধিকাংশ বর্ণনাই বিশদ—তাহা দুর্ব্বল কল্পনাকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু ছবি জীবন্ত করিতে পারে না।

বলিয়াছি সমাজ হেমচন্দ্রের প্রাণ। তাঁহার আদর্শ সামাজিক স্বাধীনতা ও একতা। তাই তিনি সমাজের আড়ালে যে হৃদয় আছে, তাহার যে সুখ, দুঃখ, বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা আছে তাহার মধ্যে তত ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এমন অনেক ভাব আছে যাহা আমরা অনুভব করি, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারি না; উঠিয়া নীরবে মিলাইয়া যায়। পুরাতন বঙ্গসাহিত্য এই সৌন্দর্য্যের খনি। রবীন্দ্রনাথ এই নিভৃত মানব হৃদয়ের কবি। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

কবিতাগুলি এক একটি প্রদীপের মত কত অজানা হৃদয় প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এ সৌন্দর্য্য হেমবাবুর "প্রিয়তমার প্রতি", "হতাশের আক্ষেপ", "পরশমণি" প্রভৃতি কবিতাতে ফুটিয়া উঠে নাই। বলিয়াছি হেমচন্দ্রের প্রতিভা সামাজিক, সমাজেই ইহার স্ফূর্ত্তি।

পরিশেষে বক্তব্য এই বর্ত্তমান সমাজে হেমচন্দ্রের ন্যায় সামাজিক কবির বড় প্রয়োজন। আমাদের অলস-স্থির-সমাজে প্রাণের সঞ্চার প্রয়োজন হইয়াছে। বঙ্গসমাজ স্বার্থপর ও অলস হইয়া পড়িতেছে। হেমচন্দ্রের ন্যায় কবি আসিয়া জ্বালাময়ী কবিতায় আমাদিগকে উদ্দীপ্ত করুন—এই জাতীয় আলস্য দূর হইয়া যাক্।

বর্ত্তমানে হেমচন্দ্রের কবিতার বহুল প্রচার আবশ্যক হইলেও তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। হেমবাবু "সেকেলে" হইয়া পড়িতেছেন। বালকদিগের মধ্যে কয়জন হেমচন্দ্র পড়িয়াছে? এ বিষয়ে দোষ অভিভাবক ও শিক্ষকদের। হেমচন্দ্রের কবিতার প্রতি আস্বাদ জন্মাইবার তাঁহারা কি চেষ্টা করেন? ইংরাজের School ও Collegeএ Shakespeare Club, Milton Club প্রভৃতি আছে—সেখানে বাজে বক্তৃতা না হইয়া শিক্ষকেরা ছাত্রগণের সহিত সেক্সপিয়র ইত্যাদি পড়িয়া থাকেন। আমাদের স্কুলে এরূপ নাই কেন? তাহার কারণ আমরা লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িতেছি—আমাদের জীবনটা 'নিত্য আনি নিত্য খাই' গোছের হইয়া পড়িতেছে, কোনও সুদূরপরাহত ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য দ্বারা তাহা নিয়মিত নহে। কিন্তু অন্ততঃ শিক্ষকদের সাবধান হইতে হইবে,—তাঁহাদের উপর অনেকটা আমাদের জাতীয় চরিত্র নির্ভর করিতেছে। যদি আমরা আমাদের বালক-বালিকাদের সহিত হেমচন্দ্রের পরিচয় সাধনা করিয়া দিতে পারি, যদি আবৃত্তি ইংরাজি গ্রন্থ হইতে না হইয়া বাঙ্গলা গ্রন্থ হইতে হয়, যদি পারিতোষিকে হেমচন্দ্রের কবিতা প্রদত্ত হয়, যদি হেমবাবুর কবিতা theatre এর সঙ্গীতের স্থান অধিকার করে, তাহা হইলে

আমরা জাতীয় চরিত্র গঠন করিতে পারিব, আর হেমচন্দ্রের প্রস্তর অপেক্ষা স্থায়ী ও চিত্র অপেক্ষা উজ্জ্বল স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিতে পারিব।*

খেতাবওয়ালার এজাহার।

গণেশপুর জিলার অন্তর্গত ফটিকপুর মহকুমায় এবারে ভয়ানক প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, প্রায় তিনশত তিনকুড়ি লোক তথায় ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। সকলেই যে কেবল প্লেগে মরিয়াছে, তাহা বোধ হয় না; কারণ "চিড়িমার" নামক সুপ্রসিদ্ধ সমাচারপত্র-সম্পাদক লিখিয়াছেন,—কতক লোক ভয়ে মরিয়াছে, কতক লোক খালিপেটে মরিয়াছে, কতক লোক শ্বেতপ্রভুর পদাঘাতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, কতক লোক পুলিশ ও জমিদারের দৌরাত্ম্যে মারা পড়িয়াছে; কাহারও প্লীহা ফাটিয়া গিয়াছে এবং কেহবা নানাপ্রকারের জুলুমে জীর্ণশীর্ণ হইয়া শ্মশানাভিমুখে গমন করিয়াছে; যাহাই হউক্ মরণটা ঠিক, কারণটা ঠিক না হইলেও ক্ষতি নাই। এই সকল গতাসু জীবের মধ্যে যে সকল প্রধান ও প্রখ্যাত পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে, "চিড়িমার" সম্পাদক তাহার একটি সুন্দর তালিকা দিয়া সর্ব্বসাধারণকে বাধিত করিয়াছেন, যথা—১নং মহারাজ মদনকর্কটী গুঁই, ২নং রায় বাহাদুর গুয়েরাম সাঁতরা, ৩নং খান্ বোকাউল্লা বাহাদুর, ৪নং মহামহোপাধ্যায় কাক্‌ক্যাংড়া বিদ্যাচর্চ্চড়ী এবং ৫নং ভুতুড়িচাঁদ গন্ধিকালাল সিং, কৈশর-এ-হিন্দ্।

যাহা হউক্, পরলোকাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত শমনরাজ বাহাদুর পাত্র-

---

* দিল্লী সাহিত্যসভার বিশেষ অধিবেশনে প্রফেসর পান্নালাল বসু এম্, এ কর্ত্তৃক পঠিত।

মিত্রসহ দরবারে বসিয়া আছেন, শ্রীমান্ চিত্রগুপ্ত মহাশয় খাতা খুলিয়া আমদানী রপ্তানীর হিসাব শুনাইতেছেন, এমন সময়ে জনৈক অমাত্য কিঞ্চিৎ সাহসের সহিত যমের সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইয়া উপরি-উক্ত খেতাবওয়ালা মনুষ্যদিগের ইন্‌ট্রডক্‌শন্ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইঁহাদের মধ্যে প্রধান কে?" অমাত্য কহিলেন, "হজুর! ইঁহাদের মধ্যে মহারাজা মদনকর্কটী গুঁই এবং মহামহোপাধ্যায় কাক্‌ক্যাকড়া বিদ্যাচর্চ্চড়ীই সর্ব্বপ্রধান। শ্রীশ্রীমান্ গজগড্ডাম্বশ্বগুম্বম্ বাবাজাবন সকলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কিন্তু তাহার আগমনে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকাহেতু তাহার পরিচয় এক্ষণে দিতে আকাঙ্ক্ষা করি না।" অনন্তর নবাগত খেতাবওয়ালাগণ পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া যমের আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া চিত্রগুপ্ত কহিলেন, "হে সৌম্য! ঢাকা নগরীর রেলওয়ে ষ্টেশন দর্শন করিবামাত্র যেমন সেই নগরীর সুপ্রসিদ্ধ ক্ষীর খাইবার জন্য প্রবল কৌতুহল জন্মে; বর্দ্ধমানের রাঙ্গামাটি দেখিবামাত্র যেমন মতিচুর ভক্ষণে কৌতুহল জন্মিয়া থাকে; বাগবাজারের ময়রাপাড়ার খোলার ঘর নজরে আসিলেই যেমন রসপূর্ণ বর্ত্তুলাকার লাড্ডু বিশেষকে জিহ্বার সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্য কৌতুহলের উৎপত্তি হয় অথবা বি, এ, পাশওয়ালা বরের বাবা, ছেলের বিবাহে কি পর্য্যন্ত আদায় করিতে পারেন ইহা জানিবার জন্য যেমন কৌতুহলাক্রান্ত থাকেন, হে সৌম্য! এই সকল খেতাবওয়ালা নবাগন্তুকদিগের সুপরিচয় জানিবার জন্য আমার মনরূপ মীন কৌতুহলরূপ জালে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অতএব তুমি ইহাদের পরিচয় প্রকাশ করিয়া বল।"

অমাত্য কহিলেন, "হে সচিবশ্রেষ্ঠ! হে মহামহানুভব! আপনি অতি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের মুখ হইতেই ইঁহাদের

পরিচয় শ্রবণ করা বিহিত বলিয়া বিবেচনা করি।" "তথাস্তু" বলিয়া সম্মতি প্রদত্ত হইবার পরে, অমাত্য মহাশয় ইঁহাদের এজাহার লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। মমপুরের ল-রিপোর্ট হইতে খেতাবওয়ালাদিগের এজাহার এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। ল-রিপোর্ট হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ যে সম্পূর্ণ খাঁটি হইয়াছে তদ্বিষয়ে বহুল সার্টিফিকেট্ আছে; সুতরাং পাঠকমহাশয়ের মনোমধ্যে যেন সংশয় না থাকে, বিশেষতঃ ক্যাংকড়া কলেজের প্রধান পণ্ডিত লিখিয়া দিয়াছেন "True copy and faithful translation." অতএব আমি সাহসসহকারে এজাহারের অনুবাদ দিলাম।

এজাহার।

ওঁ

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

১নং। হজুর মালিক। গোলাম শ্রীবকাউল্লা ওরফে বোকা খানসামা ওরফে খাঁ বাহাদুর বোকা উল্লার এজাহার। আমি প্রথমে রেলওয়ে সাহেবদের খানশামা ছিলাম, কিছু টাকা উপার্জ্জন করিয়া কশাইয়ের দোকান খুলিয়াছিলাম, ইহাতে অনেক টাকা লাভ হওয়ায় পাঁচজন মন্দলোকে আমার সর্ব্বনাশসাধনজন্য মাজিষ্টর সাহেবদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দেয়। আমি জেলার বড়কর্ত্তার অনুগ্রহে ও অনুরোধে মুই-ছি-পাল্‌টীর কমিছনরী কাজে পরোয়ানা পাইয়াছিলাম; তাহার পরে সাহেব বাহাদুর কহিলেন, "আমি তোমাকে জুরী করিব"; আমি কাঁদিয়া উত্তর দিলাম, "হজুর মালিক! আমি ঘোড়া নহি, সুতরাং জুড়ী টানিতে পারিব না"। সাহেব সে কথা না শুনিয়া আমাকে জজের সঙ্গে জুড়ি করিয়া দিলেন। ক্রমে কিঞ্চিৎ বাধ্য বাধকতার পর সাহেবকৃপাবলে নানা চেষ্টায় আমাকে

খাঁ বাহাদুর করিলেন। পাড়ার মন্দলোকেরা বলিল, "খাঁ সাহেব! আর কশাইগিরি করা তোমার সাজেনা, কারণ তুমি এখন একটা মানুষের মত মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছ," কাজেই আমাকে কশাইয়ের দোকান বন্ধ করিতে হইল। এদিকে নিত্য নিত্য চাঁদার খাতায় দস্তখত জন্য তলব হইতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত এজাহার হইয়া গেলে, চিত্রগুপ্ত মহাশয় কহিলেন "কিসের চাঁদা?" বকাউল্লা কহিল "হজুর! ঘোড়দৌড়ের, রাস্তার, ঘাটের, সাহেবদিগের খেলিবার ঘর নির্ম্মাণের, নাচের, গানের, তামাসার, থিয়েটরের, লাটের অভ্যর্থনার, দুর্ভিক্ষের, স্কুলের, নূতন হাট নির্ম্মাণের, মেমসাহেবদিগের লাইব্রেরী নির্ম্মাণের, রাস্তার ধারে ফুলগাছ বসাইবার, সাহেবদের বাংলো ঘরের মেরামতের প্রভৃতি অসংখ্য চাঁদায় আমি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, দেওয়ানীজেলে বাস করিয়া, অনাহারে ও অপমানে প্রাণত্যাগ করিয়াছি। এখন প্রার্থনা এই যে, হজুর মেহের-বান্‌গী করিয়া আমার খাঁ বাহাদুর খেতাব ফিরাইয়া দিবার আদেশ করেন।" এই সময়ে অমাত্যের ভৃত্য একবোতল ফিনাইল (Phenyle) লইয়া বকাউল্লার মাথায় ঢালিবার উপক্রম করিতেছিল, বকা কহিল, "এ কি জিনিষ?" চিত্রগুপ্ত কহিলেন, "তোমার প্লেগ রোগে মৃত্যু হইয়াছে অতএব ফেনাইল দ্বারা তোমাকে ধৌত করিব তদন্তর গন্ধকের ধুঁয়া দ্বারা তোমার Fumigation হইবে।" বকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল, "হজুর! আমি প্লেগে মরি নাই, আমি খেতাব-বিকারে মরিয়াছি।"

আমার এ খেতাব ফিরাইয়া লইলে বোধ হয় আমি আবার বাঁচিতে পারি। হজুর! আমার বর্ত্তমান অবস্থা আমাদের গ্রামের ঠিক ক্ষুদীরাম তাঁতির মত, সে তাঁত বুনিয়া অতি সুখে ও শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু পরের কথা শুনিয়া তাঁত ছাড়িয়া চাষ করিবার জন্য গরু কিনিল।

এদিকে অনাবৃষ্টি বশতঃ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় চাষে কোনও লাভই হইল না, ওদিকে তাঁতের কাজও বন্ধ হইয়াছিল; সুতরাং তাঁতি বেচারির সর্ব্বনাশ সাধিত হইল।

থাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে।
নাশ হোলো তাঁতি গরু কিনে॥

ইত্যবসরে যমরাজ কহিলেন, "আচ্ছা, আর অধিক সময় নাই, আজ দরবার বন্ধ হউক। অপরাপর লোকের এজাহার আর একদিন শুনা যাইবে।" এদিকে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, যম, চিত্রগুপ্ত ও অমাত্যগণ খানা খাইবার জন্য ডিনার রুমে প্রবেশ করিলেন।

খেতাবওয়ালার কথা অমৃত সমান।
যে শুনিবে সেই হবে অতি পুণ্যবান॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বিবাহ।

মনুষ্যজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে সে এক মহাদিন—সে এক অমা-নিশার মেঘাবৃত ঘনকৃষ্ণরজনীর পরে সুনির্ম্মল স্বর্ণকরোদ্ভাসিত সুপ্রভাত,—যেদিন বাহুযুগের মহাতপস্যার অবসানে আর্য্যঋষি আপনার বিশাল মস্তিষ্কমধ্যে জগতের অপূর্ব্ব রহস্যরাজির গোপনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এই চিররহস্যময়ী নিত্যপরিবর্ত্তনশীলা সুখদুঃখজননী ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি কতই তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল—কখনো মনে হইতেছিল প্রকৃতি রাক্ষসী, দৈত্যের রচনা রাক্ষসের লীলাভূমি—কখনো মনে হইতেছিল জগতের কোন নিয়ন্তা নাই—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধ ছলনা, শুদ্ধ মরীচিকা,—শুদ্ধ দুর্ব্বল জীববৃন্দকে পেষণ করিবার নিষ্ঠুর যন্ত্রমাত্র—এই মহাশত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া জীবনধারণ

করাই পরমপুরুষার্থ; মানুষের অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, অন্য কোন সুখ নাই—প্রকৃতির রাক্ষসীশক্তি অতিক্রম করিয়া আপনার উদর ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনই একমাত্র কর্ত্তব্য—একমাত্র সাধনীয়।

কিন্তু সহসা বিপুল ঘনকৃষ্ণ ধূম্ররাশি শূন্যে মিলাইল—ভীষণদর্শন মায়াযবনিকা মুহূর্ত্তে অপসারিত হইল—এক অপূর্ব্ব অক্ষয় অনশ্বর মহাসত্য আপনার মধুরোজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া মহা ঋষির দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে বিভাসিত হইয়া উঠিল।

মহর্ষি দেখিলেন—কি অপূর্ব্ব কি সুন্দর দৃশ্য! এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া ফিরিয়া, ভাঙিয়া চুরিয়া, লঙ্ঘন করিয়া, দলন করিয়া—কখনো পুষ্পমালার মৃদুস্পর্শে কণ্টকিত হইয়া,—কখনো তীক্ষ্ণধার প্রস্তররাজির সংঘর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া,—কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায়—কখনো বিকশিত, কখনো বিশীর্ণ হইয়া,—এক সুনিত্য আলোকিত মঙ্গলপথে—এক পরম প্রেমময় প্রিয়তমের শান্তিময় আনন্দময় হৃদয়-তলে মিলিয়া আত্মহারা হইবার জন্য আকুল আগ্রহে ছুটিয়াছে।

তাঁহারই হৃদয়ের ধন তাঁহারই হৃদয়ে স্থানলাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে—"ঘরমুখো" বাঙালীর ন্যায় সে কোথাও থামিতেছে না, কোথাও দাঁড়াইতেছে না,—কিছুই লক্ষ্য করিতেছে না, সে অন্ধ আবেগভরে আকুলভাবে আপনার পথে ছুটিয়াছে। যে তাহার পথের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে, সে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহার শোণিতে ধরণী রঞ্জিত হইতেছে—সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বাধাদান-কারীর লোহিতরক্ত সে আপনার চরণের অলক্তক মনে করিতেছে—তাহার বিচূর্ণ অস্থিখণ্ডকে আপনার চূর্ণকুন্তলশোভী মুক্তামালা বিবেচনা করিতেছে—তার জন্য তাহার এতটুকু স্নেহ নাই, এতটুকু করুণা নাই!

এই অপূর্ব্ব আকর্ষণকারী—শ্রীকৃষ্ণ—ভগবান; এই মঙ্গলের পথ ধর্ম্মের পথ—ধর্ম্মপথপরিত্যাগী বিচূর্ণ্যমান জীবমণ্ডলী অধার্ম্মিক।

এই অপূর্ব্ব মহাসত্যের আলোকাঞ্জন চক্ষে ধরিয়া আর্য্যঋষি সংসা-রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সকলই জীবের মঙ্গলের জন্য—সকলই তাহাকে ভগবানের শ্রীচরণ সন্নিধানে লইয়া যাইবার জন্য। সেইদিন—সেই স্নিগ্ধ শুভ্র-অরুণালোকিত সুপ্রভাতে—আর্য্যঋষি সুস্পষ্ট অনুভব করিলেন,—স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের নরকের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য নহে—পরস্পরকে অতি ক্ষণিক আপাতমনোরম ইন্দ্রিয়সুখ প্রদান করিবার হেতুভূতও নহে,—অতি সহজে সানন্দে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া সকল জ্বালা, সকল যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সুন্দর উপায় মাত্র।

সেই দিন বিবাহের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল—জগতের ইতিহাসে সে এক সুমহান্ স্মরণীয় ঘটনা।

নরনারীর মধ্যে একটা চরিত্রগত বিভিন্নতা আছে—ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন আর্য্যমনীষী সেই বিভিন্নতার মধ্যে নরনারীর আধ্যাত্মিক উন্নতির গোপন বীজ অন্তর্নিহিত দেখিয়া পুলকিত হইলেন।

পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি যত প্রবল হৃদয়বৃত্তি তত প্রবল নহে, আবার স্ত্রীলোকের হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা যথেষ্ট বলবতী।

অথচ ভগবানকে জানিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে বুদ্ধি-বৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি উভয়েরই পূর্ণবিকাশ প্রয়োজন। তাই মহাপ্রভু প্রথমবয়সের তর্কপ্রিয় দার্শনিক, উত্তরকালে ভাবুক ভক্ত প্রেমিক।

বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে অজ্ঞেয় অচিন্তনীয় ভগবানের স্বরূপ অবগত হইতে হয়,—হৃদয়বৃত্তির সাহায্যও তাঁহাকে প্রাণ হইতে প্রিয়তর জানিয়া প্রেমভরে ভক্তিভরে তাঁহাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে হয়।

পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবল হওয়ায় প্রথম কার্য্য পুরুষের

দ্বারা সহজে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব,—হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্যে দ্বিতীয় কার্য্য স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিকতর সুকর।

আর্য্য ঋষি বিবেচনা করিলেন, উভয়ের সম্মিলনে উভয় কার্য্যই পরস্পরের সাহায্যে উভয়ের পক্ষেই সুসাধ্য হইয়া উঠিবে।

পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে করিতে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ও ভগবানে আত্মসমর্পণ করা এক বস্তু নহে। সেজন্য অতি কঠিন সাধনার প্রয়োজন।

তাই আর্য্য ঋষি সুকৌশলে এই ব্যাপার সহজে সম্পন্ন করিবার জন্য নরনারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, স্বভাবতঃ কঠোরহৃদয় পুরুষ-জাতির সমক্ষে আত্মবিসর্জ্জনের এক অপূর্ব্ব চিত্র অহরহ উদ্ঘাটিত রাখিয়া, তাহার শুষ্কহৃদয়ে কোমলতা সঞ্চারের সুযোগ করিয়া দিলেন।

ওই তোমার স্ত্রী, ও যেমন করিয়া তোমাতে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়াছে—নিজেই বলিবার কিছুই রাখে নাই—তোমার গৃহই যাহার গৃহ, তোমার ধনসম্পত্তিতেই যাহার ঐশ্বর্য্যবৈভব,—তোমার হস্তেই যাহার প্রাণ—তোমার জন্যই যাহার জীবন, উহার মত অমনি করিয়া ভগবানে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে হইবে, নিজের বলিবার কিছু রাখিতে পাইবে না, ভগবানের ঐশ্বর্য্য হইতে নিজের ঐশ্বর্য্য—তাঁহার অস্তিত্ব হইতে নিজের অস্তিত্ব পৃথক বলিয়া ভাবিতে পাইবে না।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বহুগুণে হৃদয়গ্রাহী। সুতরাং চক্ষের সমক্ষে পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের এই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত অহরহ উদ্ঘাটিত দেখিয়া, পুরুষের হৃদয়ে আত্মবিসর্জ্জন-লালসা বলবতী হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

অপর পক্ষে, স্ত্রীলোকের পক্ষে হৃদয় বৃত্তির প্রাবল্য বশতঃ আত্ম-বিসর্জ্জন করা সহজসাধ্য হইলেও, বুদ্ধি বৃত্তির মৃদুতাবশতঃ অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্তনীয়,অনির্দ্দেশ্য ব্যক্তির উপর প্রগাঢ় প্রণয় প্রতিষ্ঠিত করা সহজসাধ্য

নহে। তাই সুদূরদর্শী আর্য্য মনীষী তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ আয়ত্ত গম্য ঈশ্বরের বিধান করিয়া বলিলেন তোমার স্বামীই তোমার একমাত্র দেবতা, তুমি তাঁহাকেই ভগবান জানিয়া তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিও, তাহাতেই তোমার মুক্তিলাভ ঘটিবে।

স্ত্রী স্বামীতে আত্ম সমর্পণ করিলেন, স্বামী শাস্ত্রাধ্যয়ন, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতির দ্বারা বিকশিত বুদ্ধিবৃত্তি সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ অবগত হইয়া, সহধর্ম্মিণীর আদর্শে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেন। স্ত্রী স্বামীতে মিশাইলেন, স্বামী ব্রহ্মে মিলাইলেন। "এইরূপে পতঙ্গও লভে হিমালয়"। তাই পুরুষের জীবনব্যাপী শিক্ষা,—ব্রহ্মচর্য্য, স্ত্রীর পাতিব্রত্য।

বিবাহের দ্বারা এই সুমহান আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয় বলিয়াই বিবাহের নাম "উদ্বাহ",—যাহা উর্দ্ধে বহন করিয়া লইয়া যায়, যাহা আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রদান করে।

আর্য্য ঋষির হৃদয়গত বিবাহের এই নিগূঢ়ভাব উপলব্ধি করিতে পারিলে হিন্দু-সমাজ-শাসনের অনেক জটিল নিয়মাবলী সুবোধ্য হইয়া উঠে। এই কারণেই হিন্দুশাস্ত্রকার স্ত্রীপুরুষকে সমান অধিকার দিবার কল্পনাকেও মনোমধ্যে স্থান দান করিতে পারেন নাই।

স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ আত্মবিসর্জ্জন-লালসা পরিপূর্ণ করিবার জন্য, তাহার অপূর্ব্ব আত্মসমর্পণকে আদর্শস্থানীয় করিবার জন্য, তাহাকে পতি-ভিন্ন পুরুষান্তরের চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণেই স্ত্রীলোকের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশকারী শিক্ষার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য না করিয়া তাহাদের প্রেমবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তির বিকাশের জন্যই সমধিক চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণেই বিধবাবিবাহে তাঁহাদের আস্থা ছিল না। একজনে আত্মসমর্পণ করিয়া পুনরায় সেই আত্মা অপরে সমর্পণ করিলে আত্মসমর্পণের চিত্র নিতান্ত মলিন হইয়া পড়ে। সুতরাং বিবাহের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

অপর পক্ষে পুরুষকে স্ত্রী জাতিকে সম্মান করিতে আদেশ করা হইয়াছে। কাহারও প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা না থাকিলে তাহার প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণ করা অসম্ভব। স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে তাহার আত্মবিসর্জ্জনের চিত্র স্বামীর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব নহে। তাই স্ত্রী লক্ষ্মীস্বরূপা, গৃহদেবতার ন্যায় পূজনীয়া।

আরও একটা কথা আছে—মুক্তির পথ পূর্ণতার পথ। সকল বৃত্তি যথোচিত বিকশিত না হইলে মুক্তি লাভ অসম্ভব। এই কারণে জগতে সর্ব্বত্র প্রাণী-হৃদয়ে পূর্ণতা লাভের জন্য একটা অন্তর্নিহিত লালসা দেখা যায়। অনেক স্থলে প্রেম এই লালসার নামান্তর। দুইজন সমপ্রকৃতি ব্যক্তির মধ্যে প্রণয় হওয়ার যতদূর সম্ভাবনা দুইজন বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তির মধ্যে প্রণয় হওয়ার তদপেক্ষা অধিকতর সম্ভাবনা। একজনের যাহা আছে অপরের তাহা নাই—সেইজন্য উভয়ে পরস্পরের সাহায্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে—এই আকুলতা প্রগাঢ় প্রণয়রূপে প্রকাশ পায়। এ হিসাবেও বিবাহের দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ ঘটে।

ভগবানের এই সুমহান্ মঙ্গল উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই পরনারীর মধ্যে মিলন-লালসা এত প্রবল, এবং এই মিলন-লালসা প্রবল রাখিবার জন্যই বোধ হয় ইহার সঙ্গে তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ সংযুক্ত।

কিন্তু অনেক সময়ে ইহাতেই আবার সর্ব্বনাশ ঘটে—ইন্দ্রিয় সুখের অন্ধকার আবরণে বিবাহের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক চিত্র আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এ তত্ত্বও সুদূরদর্শী আর্য্যমনীষীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

বিবাহের আধ্যাত্মিক ভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে ইহাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

বাস্তবিক বর-কন্যা উভয়ের পূর্ব্বদিন হইতে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের পর সুপবিত্র বৈদিক মন্ত্রাবলী, সুগন্ধি অগুরুধূম ও প্রজ্জ্বলিত বহ্নির সমক্ষে

অনুষ্ঠিত বিবাহের মধ্যে বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয় লালসার চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। তার পরেও ক্রমাগত সংযম, ক্রমাগত ধর্ম্মানুশীলন।

হায়, এই সুপবিত্র আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বিবাহের বিমল ছবির পার্শ্বে আজিকার ইন্দ্রিয়লালসা উত্তেজক স্বার্থপর অর্থশোষী বিবাহের বীভৎস চিত্র দেখিলে কাহার না প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

আজকাল বিবাহের নামে কন্যাকর্ত্তার প্রাণ শুকাইয়া যায়, বরকর্ত্তার গুম্ফ মধ্যে স্নিগ্ধ হাস্যরেখা দেখা দেয়, বর হোটেলে খাইয়া সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে এবং কন্যাকে অধিবাসের ডালায় French cards উপহার পাঠাইয়া দিয়া তাহার মনে বিবাহের আধ্যাত্মিক ভাব সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেয়! তাই আজ ভারতের এই নিদারুণ অবনতি ভাবুকের চক্ষে অশ্রু সঞ্চার করে।

আজকাল জাতীয় উন্নতির জন্য কিছু আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে—শিবাজি ও প্রতাপাদিত্যের পূজা হইতেছে—শক্তি সংগঠিত হইতেছে—বীরাষ্টমী অনুষ্ঠিত হইতেছে—তাই আজ অশ্রুপূর্ণলোচনে সকল উন্নতির মূল, আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সাধন, আর্য্যবিবাহের সমুজ্জ্বল ছবির ক্ষীণ ছায়া অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

দুগ্ধের কথা।

দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, চিনি, সন্দেশ, পরমান্ন এই সকল খাদ্য সামগ্রীর জন্য প্রাচীন লোকেরা লালায়িত ছিলেন। এখনও যাঁহারা আছেন, বিদেশ হইতে আগত বন্ধুকে আহার্য্য সম্বন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন করেন "ওহে ঘি দুধ সস্তা ত?" আধুনিক যুবার কাছে দুগ্ধের প্রতি এই অনুরাগ অসভ্যতার লক্ষণ; মৎস্য মাংসই কেবলমাত্র প্রধান আহার, এইরূপই

তাঁহার সংস্কার। রাসায়নিক মতে দুগ্ধের বিচার করিবার ক্ষমতা আমার তেমন নাই, তাহার আবশ্যকও দেখা যায় না। উপস্থিত দেখা যায় যে, মাংসাশী সাহেবেরা এদেশে অনেকে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ সেবন করিয়া থাকেন এবং দুগ্ধের শৈত্যগুণ ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উহা পান করার আবশ্যকতা তাঁহারা স্বীকার করেন। দুগ্ধ খাইয়া বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ ন্যায়শাস্ত্রের ন্যায় জটিল বিষয়ের চর্চ্চা ও মস্তিষ্কের অন্যান্যরূপ চালনা করিয়া গিয়াছেন এবং শারীরিক পরিশ্রমেও তাঁহারা কাতর ছিলেন না। কারণ বিদায় গ্রহণোপলক্ষে তাঁহাদিগকে ১২।১৪ ক্রোশ পদব্রজে গমনাগমন করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের আয়ুষ্কালও ৮০।৯০ বৎসরের কম ছিল না। আর একটি কথা আয়ুষ্কাল যদিও অনধিকার চর্চ্চা হয়, বলিতে দোষ নাই যে ব্রাইট্‌স ডিজিজ্ বাত ইত্যাদি ব্যাধিতে ডাক্তারগণ মাংস বন্ধ করিয়া, দুগ্ধপথ্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দুগ্ধপোষ্য বালকদের কথা বলার দরকার নাই, কারণ তাহাদের পক্ষে দুগ্ধের আবশ্যকতা সর্ব্ববাদিসম্মত। আধুনিক যুবা ও প্রবীণদের স্বাস্থ্য যে সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে ভাল দুগ্ধপানের অভাব তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য দুগ্ধপোষ্য চিন্তাশীল ব্রাহ্মণদের কথা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি, চিরদিন তাঁহারা স্বাস্থ্যসুখে সুখী ছিলেন এবং তাঁহাদের দীর্ঘজীবন ও মানসিক শ্রমের বৃত্তান্ত এখনকার দিনে কাহিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই ভাল দুগ্ধের জন্য কি চেষ্টা হইতেছে? কঙ্কাল সার খর্ব্বাকৃতি গাভীসকল দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে, এখনও যাহা পাওয়া যায় ভবিষ্যতে তাহা মিলিবে। টিউবারকিউলসিস্ স্কার্লাটিনা (scarlatina), টাইফয়েডফিবার, ডিপ্‌থিরিয়া, কলেরা, কলেরা ইন্‌ফান্টাম্ (c. infantum) ইত্যাদি রোগ সকলের মূল বিকৃত দুগ্ধ ডাক্তারগণ অনেক সময় বলিয়া থাকেন।

গোয়ালার ধর্ম্ম ভয় কতটুকু? ব্যবসায়ের ভয়ও সে করে না; কারণ সকল গোপেরই বিকৃত-দুধ বেচার বদনাম আছে। কেহ কেহ বলে দুধে জল মিশাইলে তাহাদের পাপ হয় না; গোপশাস্ত্রে নাকি এরূপ ব্যবস্থা আছে! দুগ্ধ বিক্রয় করা ভদ্র সন্তানের অযোগ্য, একথা বঙ্গদেশে প্রচলিত। মহাভারতে বিরাট রাজার ষষ্টিলক্ষ গোধনের কথা শুনা যায়। এতগুলি গো রক্ষা করার কি আবশ্যক ছিল? হয় ত তজ্জাত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগৃহীত হইত। সেই গোধন গুলি যে রাজার সম্পত্তি বিশেষ, অতএব লোভজনক, তাহা কুরুগণের হরণেচ্ছায় ও হরণে সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে। গরু বিক্রয় করিতে নাই, এই যে সামাজিক প্রথা আছে, তাহার একটি মহৎ উদ্দেশ্য এই যে, গরু প্রতিপালন করিলে গরুও প্রতিপালককে প্রতিপালন করিবে। গাভীকে আমাদের দেশে ভগবতী কহে। শুধু ভগবতী বলিয়া পূজা করিলে এবং তারপর অকর্ম্মণ্য হইলে পিঞ্জরাপোলে পাঠাইলে চলিবে না। ভগবতীকে রীতিমত আহার দিতে হইবে। ভগবতীর বংশাবলীও যাহাতে উৎকৃষ্ট হয় সে চেষ্টাও করিতে হইবে, সেজন্য সবল সুন্দর বৃহদায়তন বৃষরক্ষারও নিতান্ত প্রয়োজন। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ এদেশে লুপ্তপ্রায়। যাঁহারা করেন তাঁহারাও বৎসতরী চতুষ্টয় কেবল নাম মাত্র দান করেন, রুগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ গোবৎস অথবা তদ্বিনিময়ে অর্থমাত্র এবং বৎসতরী গোপগৃহে ফিরিয়া যায়। যে ষাঁড়দাগা হয় তাহাও ঐরূপ এবং তাহাকে যে আজীবন উত্তমরূপে প্রতিপালন করিতে হয় তাহাই বা কয়জনে করেন। এই বৃষোৎসর্গে ও বৎসরতরীদানে না জানি কত অর্থই নিহিত,—ভারতবর্ষীয় অর্থশাস্ত্রের একটি অনধীত অধ্যায় বিশেষ।

সে যাহা হউক এখন কি প্রকারে দেশে অধিক ও খাঁটি দুগ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে ইহাই আমাদের দেখা অতীব আবশ্যক। বিলাতে জিনিষ-

পত্র এত মহার্ঘ, তথাপি দুগ্ধবিক্রেতারা ব্যবসায়িদের নিকট অতি অল্প মূল্যে ইহা খরিদ করিয়া থাকে। ইহা কেবল চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফল। তবে তথায় মজুরি খরচ অধিক, সেই জন্য রেল হইতে লোকের বাড়ি পৌছিতে অনেক খরচা পড়ে। কিন্তু চেষ্টা করিলে গ্রামের দুধ কলিকাতায় অল্পমূল্যে বিক্রয় করা যায়। দুগ্ধ বাঁট হইতে বাহির হইয়া হাওয়ার সহিত মিশ্রিত হইলে উহাতে যে শর্করার ভাগ আছে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, ও লেক্‌টিক এসিড্ (lactic acid) নামক একপ্রকার টকরস উৎপন্ন হয়, উহা দুগ্ধের কেজিন (casein) নামক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া দধি উৎপন্ন করে এবং দুগ্ধকে ঘন করিয়া দেয়। এইজন্য বাসি দুগ্ধ হাতে পুরু বোধ হয়। কিন্তু দুহিবার পর তৎক্ষণাৎ দুগ্ধকে ঠাণ্ডা করিলে (refriegerate) ও সেই ভাবে রাখিলে অধিককাল রাখা যায়। প্যারিশ নগরের লোক ২৪ ঘণ্টার বাসি দুধ খাইয়া থাকে। এজন্য নিজের গরু থাকা আবশ্যক। গোয়ালার কি এমন অর্থবল আছে যে সে অধিক গাই রাখে? এবং অধিক গাই না রাখিলে বৈজ্ঞানিক মতে যে সকল খরচ আবশ্যক তাহা পোষায় না। বঙ্গদেশের গোয়ালারা জাতিতে হিন্দু। হিন্দুর-নিয়ম কর্ম্ম সমস্তই তাহাদের করিতে হয়; অধিকন্তু বিবাহ করিতে তাহার তিন চারি শত টাকা পণ লাগে। এই সকল খরচ বজায় রাখিতে গিয়া তাহাকে কাজে কাজেই নানারূপ উপায় (যথা দুধে জল মিশান ইত্যাদি) উদ্ভাবন করিতে হয়। সে প্রত্যহ দুধ বেচিয়া যে পয়সা পায়, তাহাতে খুচরা দামে খোল বিচালি খরিদ করে। সে মণ দরে অথবা গাড়ি কিম্বা নৌকার দরে খরিদ করিতে অসমর্থ।

বিলাতে ১৫০ দেড়শত মাইল দূর হইতেও দুধ আসিয়া থাকে। ডেয়ারী সাপ্লাই কোর এজেণ্ট সাহেব বলেন, এক লণ্ডন সহরে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার মন দুধ বৎসরে বিক্রয় হয়। একটি একটি রেল কোম্পানিতে ৭০ হাজার ৮০ হাজার মন দুধ চালান হয়, ব্যবসায়িদের নিকট

হইতে রেলে পৌছিতে ২৫০০ শত গাড়ির আবশ্যক ও লণ্ডনে বিলি হইতে ৪০০০ গাড়ি চাই। দুধের উৎপাদন করিতে যে খরচ, বিলি করিতেও সেই খরচ। এক একটি কোম্পানির দুগ্ধ পরীক্ষার নিমিত্ত ইন্‌স্পেক্টার (পরিদর্শক) আছে,—পাছে তাহাদের দুগ্ধের বদনাম হয়। বিলাতে ব্যবসায়ে জুয়াচুরি অতীব অবমানের কথা।

বিলাতে দুগ্ধের ব্যবসায়িগণ গবাদির খাদ্যের জন্য কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে বিচালি প্রচুর পরিমাণে খরিদ করিলে বিশেষ সুবিধা দরে পাওয়া যায় এবং তেলের কল হওয়ায় কলিকাতায় খোলও খুব শস্তা দরে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ঘাস প্রচুর পাওয়া যায় না, সেজন্য কতক পরিমাণে সব্‌জি যথা সিম, বরবটি, বাকলা, গাজোর ইত্যাদি এবং মটরকলাই ওট্ (oat) সকলই উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রথমে আউস ধান, পরে রবি ও সব্‌জি এবং বাকি সময় খালি ঘাসের জমি রাখিলে অনেক খরচা কম হয়, কতক জমি বহুবৎসর স্থায়ী বিদেশী ঘাসের জন্য (যথা রিয়ানা সিনি রাই ইত্যাদি) রাখাও ভাল।

বিলাতে দুগ্ধব্যবসায়ীরা নিজ নিজ বৃষ রাখেন এবং সেই জন্যই এত উত্তম গো-পাল তৈয়ারী হয়—একটা ইংরাজিতে কথা আছে the bulls half the herd অর্থাৎ ষাঁড় পালের অর্দ্ধেক।

এই সকল গুরুভার গোয়ালার পক্ষে বহন করা অসম্ভব, অতএব ভদ্র সন্তানের উদ্যোগ আবশ্যক, তাহা হইলে গোয়ালারা তাঁহার অধীনে কাজ করিতে পারে।

একার্য্য কতদূর সম্ভবপর জানি না। হয়ত কোন দিন শুনিব কোন ইংরাজ অথবা বোম্বাই অঞ্চলের লোক কলিকাতার নিকট জমি লইয়া কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের কথা বলা গেল। এখন সমগ্র বাঙ্গা-

লার উপায় কি ? আমাদের দেশের জমিদার ও অর্থশালিগণ যদি কিছু মাত্র সাহয্য করেন ত কতক পরিমানে উপকার হয়। তাঁহাদের এ বিষয়ে একটু সখ হওয়া আবশ্যক। বিলাতের বড় বড় লর্ড ডিউক প্রভৃতি প্রায় সকলেরই গরুর ব্যবসা আছে। মিঃ এন্ জি মুখার্জ্জি বলেন, মথুরার, বাঁকিপুরের ও সীতামারির গাভী ও ষণ্ড বঙ্গ দেশের উপযোগী। যদি আমাদের ধনকুবেরগণ উপরোক্ত এক একটি ষাঁড় ও গাই রাখেন এবং ৪।৫ সের দুগ্ধ দেয় এমন দেশী গাইয়ের যদি সেই ষাঁড়ের ঔরসে বৎস হয় ত ১০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশীয় গো জাতির উন্নতি হইতে পারে। মফঃস্বলে তাঁহাদের জমীদারীতে ইহার ব্যবস্থা করা অতি সহজ, খরচ কিছুই নহে, কেবল এ দিকে একটু দৃক্‌পাতের দরকার। অন্ততঃ তাঁহারা যদি পিতা মাতার শ্রাদ্ধের সময় ঐরূপ বলীবর্দ্দ ও বৎসতরী দান করেন, তাহা হইলে শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্যও সাধন হয় এবং তাহার ফলও অধিক হয়, কারণ কোন স্বর্গীয় পিতা মাতা ঐরূপ দানে না প্রীত হইবেন ?

"পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।"

শ্রীকালীচরণ নন্দী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনা।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ১৩১০। { ৭ম সংখ্যা।

কাব্য কথা।

কবিতামাত্রই কবির স্বতঃউচ্ছ্বসিত ভাবধারা স্বীকার করি, কিন্তু কবি-হৃদয় সমস্ত কবিতাতেই অসঙ্কোচে ফুটিতে পায় বোধ হয় না।

একই সঙ্গীত গায়ক জনসমক্ষে যে সুরে গীত করেন, নিরালে সেই সঙ্গীতই ভিন্ন ভাব ধারণ করে ; কেননা সেখানে গায়ককে বুঝিয়া সুজিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া গাহিতে হয় না, গায়ক আপন মনে, প্রাণের সুরে, স্বরলহরী ঢালিয়া দেন।

ঠিক চিত্রকরকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার সুসজ্জিত চিত্রবিপণিতে সুরচিত চিত্রাবলী দিয়া বুঝা অপেক্ষা, তাঁহার অন্তঃপুরের দু'একখানি ছবির হীন আড়ম্বর ও ম্লান বর্ণাভার ভিতর দিয়া তাঁহাকে বুঝা সহজ বলিয়া মনে হয়। কেননা সেখানে চিত্রকরের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, কলা-নৈপুণ্য কাহারও অপেক্ষা করিয়া থাকে না।

তেমনি কবিদের সমস্ত কাব্যাবলীর মধ্যে হয় ত একখানি কাব্যে কবিহৃদয় সমস্ত সমাজ ও পৃথিবীর অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাতে যত্ন ও চেষ্টার লেশমাত্র চিহ্ন নাই, কবির যাহা বলিবার, যাহা গাহিবার, কবি আপনমনে গাহিয়া চলিয়াছেন। কোথায়ও কাহারও

মুখাপেক্ষা করেন নাই। কবির পক্ষে সেই কাব্যটীই তাঁহার প্রিয়তম।

কবি [illegible] বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নাই, কোনও বিশেষ সৌন্দর্য্য কি চিত্র হয়ত তাহাতে পরিস্ফুট হয় নাই, কিন্তু তথাপি সেই কাব্যখানিই কবির বড় আদরের,—বড় স্নেহের।

কবির ভিতরও দুইটী করিয়া অংশ আছে; একটীতে কবি তাঁহার নায়ক নায়িকা ও আর পাঁচজনের হইয়া বলেন, আর একটীতে কবি শুধু তাঁহার হৃদয়, তাহার আনন্দ, তাহার সম্ভোগ বিবৃত করিয়া যান। কবি যে সৌন্দর্য্য কিম্বা যে চিত্র দেখেন, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কাব্যে তাহা বিকশিত করিয়া তুলেন; কিন্তু কবি এই সৌন্দর্য্য বা চিত্র দেখিয়া যে আনন্দ লাভ করেন, সেই আত্মহারা হৃদয়ের আভাষ আমরা শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্যে পাই। একটীতে কবি দ্বৈতবাদী, আর একটীতে কবি অদ্বৈতবাদী। একটীতে কবি সৌন্দর্য্য দেখিয়া গান করেন, আর একটীতে কবি যেন সৌন্দর্য্যের মধ্যে ভুলিয়া তাঁহার স্বরলহরী ঢালিয়া দেন।

কথাটা উদাহরণের দ্বারা সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত এই তিনটীই মহাকবির অমর কাব্য।—কবির হৃদয়-নিঃসৃত ভাব-মন্দাকিনীর ত্রিধারা। পূর্ব্বোক্ত দুইটী গ্রন্থে কবির চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, তাঁহার স্বর্গীয় কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যের চির-উৎস, বিশ্বজনকে চিরমুগ্ধ ও চিরতৃপ্ত করিয়াছে, কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু কবির আনন্দ, কবি-হৃদয়ের সম্ভোগ, সে পরিচয় আমরা মেঘ হইতেই পাইয়াছি।

পত্র-শ্যাম লতাজটিলবনকুঞ্জে অবকাশ পথে সৌরকর যেমন মাঝে মাঝে মণিমুক্তাহীরকখণ্ডবর্ণাভা প্রতিফলিত করে, তেমকি শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবের নায়ক নায়িকার চিত্রের পার্শ্বে কবিহৃদয়ের পরিচয় ক্বচিত পাওয়া যায়। কবির সেখানে নিজের কথা বলিবার, নিজ আনন্দ

প্রকাশ করিবার অবসরমাত্র নাই, তাঁহাকে পদে পদে অতি যত্নে, অতি সতর্কে বর্ণ, আলোক ও মাধুর্য্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া চলিতে হইয়াছে। তাহার ভিতর দিয়া কবির আনন্দের প্রখরতা, তৃপ্তির প্রগাঢ়তা ও সম্ভোগের তীব্রতা, অধিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না!

কিন্তু "মেঘদূত" সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। মেঘদূতে নিতান্তই কবির আপনার কথা।

কবির কাব্যারম্ভও সেইরূপ। বসন্তের অসীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমাদের হৃদয় বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে—তখন বিবিধ সঙ্গীত ও ঝঙ্কারের মধ্যে আপনার স্বর ভুলিয়া যায়;—কিন্তু যখন বর্ষা ঘনাইয়া আসে, সমস্ত দিন রিন্ ঝিম্ বারিধার, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বিদ্যুচ্চকিত, ঘনগর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত, তখন সমস্ত চরাচর হইতে ভীত বলাকার মত মন আপন নীড়ে ফিরিয়া আসে। সে দিন শুধু আপনার কথা, আপনার গান; বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে কোনও সংস্রব নাই। তাই বসন্তের শেষে যখন সুভগসলিলবগাহা পাটলসংসর্গসুরভিবনবায়ু নবীন কিশলয় ও তরুণ লতিকা দুলাইয়া বহিতেছিল তখন শকুন্তলার আরম্ভ, আর সেই মেঘ-ঘনায়িত "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" মেঘদূতের আরম্ভ।

মেঘদূতে চরিত্রের তেমন বিকাশ নাই, ঘটনা পরম্পরায় তাহা কোথাও জটিল হইয়া উঠে নাই, শুধু নীরবে একটী কবি হৃদয়ের অসঙ্কোচে গীত সঙ্গীত বন্ধনহীন কল্লোলিনী নির্ঝরিণীর মত উচ্ছ্বসিত হইয়া চলিয়াছে। সে দিন নির্ব্বাসিত যক্ষের মত কবিকল্পনা জলদের মত সেই আর্দ্র উদাস সমীরণের সহিত কোন অলকার পথে ছুটিয়াছে।

সেই পথে কোথাও আবদ্ধমালা নয়নসুভগা বলাকাশ্রেণী মেঘকোলে উড়িয়া চলিয়াছে—কোথায় বিরহশিথিলহৃদয় সুকুমারী রমণী স্বামীর আশায় চাহিয়া আছে! কোথাও উন্নত শ্যামল কেকাধ্বনিত গিরিশ্রেণী, সানুদেশে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনাদের চকিতদৃষ্টি ভ্রূবিলাস-অনভিজ্ঞ জনপদ

বধূদের প্রীতিস্নিগ্ধ ফুল্লনয়ন; কোথাও তাম্রকুট পর্ব্বতের বনচর বধূ ভুক্তকুঞ্জশ্রেণী বনগজ মদসুরভিত; দূরে নর্ম্মদার খরধারা, তটভাগ নবকিশলয়হরিৎ, স্থলকদম্বে কপিশবর্ণ; কোথাও দশার্ণ জনপদের পরিণত ফলশ্যাম জম্বুবন, অর্দ্ধস্ফুট কেতকীসুরভিত উপবন; এবং তাহার পর বিদিশানগরীর উচ্ছ্বসিত বিলাসস্রোত; বননদীতীরজাত, নবজলকণাসিক্ত যুথিকাজাল, কুসুম-চরণ-শ্রান্ত সুন্দরী রমণী কিম্বা উজ্জয়িনীর সেই বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতা পুরাঙ্গনাগণের লীলাপাঙ্গ তটতরুগমনস্খলিত পত্রধূসর নদী, সারস মদকলকূজিত, কমলশোভিত সরসী; পুষ্পমাল্যশোভিত সৌধশ্রেণী, তাহাও আবার রমণীরঞ্জন অলক্তকরাগরঞ্জিত; অবন্তীনগরীর একদিকে যেমন মহাকালের মন্দির, আর দিকে তেমনি জলকেলিনিরত যুবতীগণের গাত্রগন্ধ সুরভিত অনিলবিকম্পিত উপবনশ্রেণী; নীরবরজনীর সূচিভেদ্য অন্ধকারে সৌদামিনীর কনকনিকষস্নিগ্ধালোকে অভিসারযাত্রী রমণীবৃন্দ!

সম্মুখে কোথাও উন্নত কৈলাশগিরির গগনবিদারী শৃঙ্গ ত্রিলোচনের রাশীকৃত অট্টহাস্যের মত শোভমান—মহাদেবের পদাঙ্ক অঙ্কিত, শৈলে শৈলে কিন্নরীসঙ্গীত, অনিলকৃত কীচকধ্বনি সানুদেশে সমীরচঞ্চল কল্পদ্রুমকিশলয় শ্রেণী!

এমনি আদ্যন্ত সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য—বন্ধনহীন আত্মহারা কবিহৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস!

এ পথেরও শেষ নাই, এ সৌন্দর্য্যসঙ্গীতেরও শেষ নাই। সমস্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য্য, কবির অলকাস্থিত প্রিয়ার মন্দিরের পথে শেষ হইয়া গিয়াছে।

ঠিক এইরূপ অসঙ্কোচে কবিহৃদয়ের সঙ্গীত আমরা মাইকেলের ব্রজাঙ্গনাকাব্যে, হেমবাবুর কবিতাবলীতে, রবীন্দ্রবাবুর "ক্ষণিকায়" শুনিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয়। সমস্ত প্রধান কবিদিগেরই সৌন্দর্য্য-

তন্ময় আনন্দাপ্লুত কবিহৃদয় তাঁহাদের এক একখানি কাব্যে এইরূপে সমস্ত সংসার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নীরবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়।

(সময় নিরূপণ)

মহম্মদ বখতিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক নবদ্বীপাধিকারের অব্দ লইয়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে পূর্ব্বাপর একটা ছোটখাট রকমের রণকাণ্ডের অভিনয় হইতেছে। প্রকৃত মীমাংসা এখনো অতীতের কুক্ষিতলগত হইলেও অনুমান এবং ঐতিহাসিক অবস্থায় দ্বারা যতদূর মীমাংসিত হওয়া সম্ভব তাহার মধ্যেও বিশেষ গণ্ডগোল। হিন্দুজাতি কখনও পূর্ব্বে ইতিহাসের আদর করেন নাই, শাস্ত্রালোচনার কূটঘূর্ণিপাকে পড়িয়া ইতিহাসকে নিরন্তর অবহেলা করিয়াছেন সুতরাং এ সম্বন্ধে মীমাংসাপক্ষে মুসলমান ইতিহাসবেত্তাদিগের মতানুসরণই শ্রেয়ঃ, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যেইবা সদ্ভাব কৈ? ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ আপনাদের অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইয়া সম্মুখে সুবিধামত যে মুসলমান ইতিহাসখানি পাইয়াছেন তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের প্রকৃত কথা জানিবার সুবিধা কৈ?

বখতিয়ার খিলিজি বেহারে উপস্থিত হইয়া যে সময়ে গোপনে গৌড় আক্রমণের উদ্যোগে ও চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে যে নরপতি বঙ্গের সিংহাসন সমালঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল এই বিষয় লইয়া গোল বাধিয়া উঠিয়াছে। মিনহাজ লিখিত "লছমণিয়া" শব্দ হইতে কেহ "লক্ষ্মণ" কেহবা "লাক্ষ্মণেয়" এই নাম

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পশ্চিম প্রদেশে "লক্ষ্মণকে" সাধারণতঃ 'লছমন' বা "লছমণিয়া" বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বঙ্গের সুসন্তান ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় রাজা লক্ষ্মণসেনের পুত্রকে লাক্ষ্মণেয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার মিত্র মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত ভ্রমবিবর্জিত বলা যাইতে পারে না। যেহেতু আমরা দেখিতেছি যে উক্ত নৃপতির সমসাময়িক স্বদেশীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বপ্রণেতা হলায়ুধ এবং কর্ণামৃত প্রণেতা শ্রীধর দাস তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরেই "লক্ষ্মণসেনদেব" লিখিয়াছেন, এমত অবস্থায় অন্য সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া এই মত গ্রহণই প্রশস্ত।

মহম্মদ বখতিয়ার কর্ত্তৃক নিরুপদ্রবে বঙ্গবিজয় ও লক্ষ্মণসেনদেবের পলায়ন সম্বন্ধে মিনহাজে একটী গল্প লিখিত আছে, "বখতিয়ারের বিহারবিজয়বার্ত্তা গৌড়েশ্বরের কর্ণে পৌঁছিল। অবিশ্রান্ত মুসলমান বিজয়কাহিনী তৎকালে বঙ্গবাসিহিন্দুগণকে ভীত ও চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। বহুসংখ্যক জ্ঞানী, জ্যোতির্ব্বিদ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও অমাত্য রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাদের শাস্ত্রে আছে এই দেশ তুরকীদিগের অধিকৃত হইবে। এক্ষণে সেই ভবিষ্য বাণী সফল হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুরকীরা বিহার অধিকার করিয়াছে, পর বৎসর নিশ্চয়ই এদেশে উপস্থিত হইবে। মহারাজ পলায়ন করুন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "যে ব্যক্তি এদেশ অধিকার করিবে সেই গ্রন্থে তাঁহার কোন বর্ণনা আছে কিনা?" তাঁহারা বলিলেন "সে ব্যক্তি অজানুলম্বিতবাহু।" রাজা বলিলেন "তবে প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানের জন্য চর প্রেরিত হউক।" তদনন্তর বখতিয়ারকে দর্শনার্থ গুপ্তচর প্রেরিত হইল। চর ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণকথিত বাক্যাবলীর সত্যতা আরও দৃঢ় করিল।"*

* মিনহাজ-সিরাজ লিখিত তবাকত—নেহারী হইতে।

যাহা হউক ইহার মূলে সত্যতা থাকুক আর না থাকুক, বখতিয়ারের বিহারবিজয়ের পর বঙ্গবাসিগণ সমতট, কামরূপ প্রভৃতি প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। একাকী বৃদ্ধ রাজা নিশ্চেষ্টভাবে রাজধানীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ তুরক অশ্বারোহী কর্ত্তৃক গৌড়বিজয় সত্য কি না? ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের অনুসরণকারিগণ অবশ্যই সত্য বলিবেন। কিন্তু গৌড়বাসিগণ কি এতই ভীরু? সপ্তদশ অশ্বারোহীর গতিরোধ করিতে রাজধানীতে কি শতাধিক সৈন্যও ছিলনা? গৌড়ের তাৎকালিক বিবরণপাঠে জানা যায় যে গৌড়বাসিগণ নিতান্ত কাপুরুষ ছিলেন না, বীরত্ব ও তেজ তাঁহাদের মধ্যে ছিল। সপ্তদশ অশ্বারোহী এত বড় রাজ্য দখল করিল—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর জাতিনাশ করিল, দেবমন্দির ধ্বংস করিল, গোহত্যা করিয়া পবিত্র হিন্দুর দেশ কলুষিত করিল, অথচ কেহ একটু বাধা মাত্রও দিল না,—ইহা কি অশ্রদ্ধেয় কথা নহে? অলীক উপন্যাসবৎ ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? সমস্ত বঙ্গের রাজধানী প্রবল পরাক্রম সেনরাজগণের অধিকারে অন্ততঃ পঞ্চসহস্রাধিক সৈন্যও সুসজ্জিত ছিলনা কে বলিবে? অতর্কিত আক্রমণে রাজভবন মাত্র অধিকৃত হইলেও হইতে পারে, তাই বলিয়া সপ্তদশ জনের সাহায্যে সমগ্র গৌড়জনপদ অথবা বঙ্গদেশবিজয় কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তবে ইহার কারণ কি?

বিহারবিজয়ের * দুই বৎসর পরে মহম্মদ বখতিয়ার স্বীয় বৃহৎসৈন্যদল লইয়া গোপনে গৌড়রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের

* বিহারবিজয় বখতিয়ারের নিষ্ঠুরতার, বর্ব্বরতার ও তাঁহার মূর্খতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। মহম্মদ বখতিয়ার বিহারে প্রবেশ করিয়া হিন্দুদিগের প্রাণবধ, ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন, স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব অপহরণ প্রভৃতি মানব চরিত্রের ঘৃণা ও কলঙ্কতার কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মন্দির ভগ্ন, দেবমূর্ত্তি কলুষিত, প্রধান প্রধান লোকপূর্ণ নগরী অগ্নি সংযোগে ধ্বংশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পূর্ব্বভারতের গৌরবকেতন, বহুকালসঞ্চিত

ভবিষ্যবাণীতে রাজ্যবাসিগণ কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল—সুতরাং রাজ্য রক্ষার্থ তাদৃশ কোনরূপ বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে ছিল না, বখতিয়ার গুপ্তচরমুখে এই সংবাদ পাইলেন। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি এরূপ ভীষণ বেগে অশ্বচালনা করিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র সপ্তদশজন অশ্বারোহী তাঁহার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল—অবশিষ্ট বৃহৎ সৈন্যদল পশ্চাতে ছিল। সেই অষ্টাদশ অশ্বারোহী নগর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগকে অশ্ববিক্রেতা বলিয়া পরিচয় দিলেন। নগরবাসিগণ তাঁহাদের কার্য্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না—ক্রমে সেই অষ্টাদশ অশ্বারোহী রাজভবনের সম্মুখীন হইয়া দ্বাররক্ষককে আক্রমণ করিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ড করিল। আকস্মিক এই ঘটনায় ভয়ানক গণ্ডগোল পড়িয়া গেল, ইতিমধ্যে বখতিয়ারের অবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া অপ্রস্তুত নদীয়া বাসিগণকে আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ রাজা অন্তঃপুরে ভোজনে বসিয়াছিলেন—তিনি ইহার কোন সদুপায় করিতে অক্ষম হইয়া খিড়কীদ্বার দিয়া সমতট বঙ্গে প্রস্থান করিলেন। এই ত গেল আসল কথা—ইহাই নানানভাবে নানান হাতে পড়িয়া এবং ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ ইহা হইতে সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গ-

জ্ঞানভাণ্ডার, স্বরস্বতীর ক্রীড়াক্ষেত্র জগদ্বিখ্যাত নালন্দা তাঁহার হস্তগত হইল—প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের জ্ঞানগর্ভ রাশীকৃত গ্রন্থ তাঁহার অধিকারে আসিল। সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থ নিচয় পাঠ করাইবার জন্য বখতিয়ার ব্রাহ্মণদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বর্ব্বর ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন সৈন্যদিগের কৃপায় তত্রস্থ ব্রাহ্মণ বংশ প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছিল—এবং যাঁহারা তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন তাঁহারা ও স্ব স্ব জাতি ধর্ম্ম রক্ষার্থ স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সকল অমূল্য গ্রন্থের পাঠোদ্ধার হইল না। বানরের গলায় মুক্তামালা কবে শোভা পাইয়া থাকে? মূর্খ খিলিজি সৈন্যগণ যখন সেই সব সংস্কৃত পুস্তকের বিন্দুমাত্র বুঝিতে সক্ষম হইল না, তখন আপনা-দিগের মূর্খতাও বর্ব্বরতার পরিচয় স্বরূপ সেইসব প্রাচীন গ্রন্থ ধ্বংস করিয়া ভারতের বহু কালের জ্ঞান সমৃদ্ধি একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। আরবদিগের কর্ত্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ায় লাইব্রেরীধ্বংস এবং বখতিয়ার কর্ত্তৃক নালন্দাধ্বংস জগতের কত প্রভূত জ্ঞানোন্নতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল।

বিজয়ের সত্যতা ঘোষণা দ্বারা নিষ্কলঙ্ক গৌড়বাসীর চরিত্রে কাপুরুষ-তার কলঙ্ক লেপন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। মিনহাজের লেখার সত্যতা স্বীকার করিতে হইলে সপ্তদশ অশ্বারোহীর কর্ত্তৃক গৌড়বিজয় সম্পূর্ণ অমূলক ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদিগের কৃপায় বাল্য হইতে আমরা একটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক অমূলক বিষয় শিক্ষা করিয়া আসিতেছি—সেটা এই, "লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগপূর্ব্বক জগন্নাথক্ষেত্রে সপরিবারে গমন করিয়াছিলেন।" ইহা কতদূর সত্য সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণ ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, বখতিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ জয় করিয়া কেবল রাঢ় দেশের উত্তর ও বারেন্দ্রের পশ্চিমাংশমাত্র অধিকার করিয়াছিলেন—সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার পদানত হয় নাই। মহম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপা-ধিকারের পর এক শতাব্দী পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানাধিকার বিন্দু-মাত্রও স্থান লাভ করে নাই। রাঢ় ও বারেন্দ্রজয়ের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গ-দেশ লক্ষ্মণসেন দেবের রাজছত্রের অধীন হইয়াছিল—তাঁহার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারিগণ প্রায় শতাধিকবর্ষ বঙ্গদেশ স্বাধীনভাবেশাসন করিয়া-ছিলেন। যদি প্রকৃতই লক্ষ্মণসেন দেব জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করিতেন, তাহা হইলে অরাজকতাপূর্ণবঙ্গদেশ অধিকার করিতে বখতিয়ারের কখনই বিশেষ বেগ পাইতে হইত না—একবারেই অধিকার করিতে পারিতেন। যখন আমরা লক্ষ্মসেন দেবের জগন্নাথতীর্থে গমনের কোন প্রাচীন ইতিহাসপ্রমানিত সাক্ষ্য পাইতেছি না, তখন ইংরাজ ইতিহাস লেখকদিগের কথা অমূলক বলিয়া কেন না বিশ্বাস করিব? বখতিয়ারের নবদ্বীপ বিজয়ের ৪০ বৎসর পরে মিনহাজ স্বয়ং গৌড়ে আসিয়া যাহা অবগত হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন:—"লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সমতটে আসিয়া বাস

করেন। তথায় কিছুকাল রাজ্য শাসন করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি তথায় রাজত্ব করিতেছেন।" বৃদ্ধ মীনহাজের বাক্য অবিশ্বাসের কোন কারণ আছে কি?*

বখতিয়ার বঙ্গদেশের কতটুকুমাত্র অধিকার করিয়াছিলেন? এই প্রশ্ন স্বতঃ মনোমধ্যে উদিত হইবার সম্ভাবনা; যেহেতু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বখতিয়ার একেবারে সমস্ত বঙ্গদেশ জয় করিতে পারেন নাই। মহম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপে আগমনকালে বর্ত্তমান বাঙ্গলার অধিকাংশ সেনবংশীয়দিগের অধিকারভুক্ত ছিল না। রাঢ়দেশের অধিকাংশই উড়িষ্যার রাজাদিগের অধিকারে ছিল—উৎকল ইতিহাস লেখকদিগের মতে এই সময় ত্রিবেণীর ঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয় উৎকল নৃপতিদিগের শাসনাধীন ছিল এবং দক্ষিণদিকে সমুদ্রতটে কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজ্য বা প্রদেশ ছিল না। উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ কামরূপাধিপতি ও কুঁচ ও মেচ প্রভৃতি অসভ্যজাতির অধিকারভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান বাঁকুড়া, মানভূম, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ পঞ্চকোট ও বিষ্ণুপুরের রাজার অধীন ছিল। পূর্ব্বদিকে স্বাধীন ত্রিপুরা, পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে জয়ন্তীয়ার রাজা, তৎপূর্ব্বে কাছাড়ের স্বাধীন নৃপতিদিগের রাজ্য ছিল। কেবলমাত্র রাঢ়ের উত্তরাংশ, বারেন্দ্রের পশ্চিমাংশ ও বঙ্গদেশ সেনবংশীয়দিগের অধিকারভুক্ত ছিল। ইহাও আবার দুইভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তর-পশ্চিমভাগের রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী, পূর্ব্বভাগ সুবর্ণগ্রাম বা বঙ্গবিক্রমপুরের অধিকারে ছিল। সমতট ইহার রাজধানী। মহম্মদ বখতিয়ার নবদ্বীপ জয় করিয়া কেবল

* ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এরূপ ভ্রমাত্মক বিষয় কোথায় পাইলেন? একটু অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা ২।৩ শত বৎসরের প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস "তজকরত উলমুলুক" এবং "তবাকত-ই-আকবরই" এর অনুসরণ করিয়াছেন। মিনহাজের তুলনায় এই দুই গ্রন্থ খুব আধুনিক এবং কতকগুলি ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন মিনহাজের বাক্য উক্ত দুইগ্রন্থ অপেক্ষা অতিশয় প্রাচীন এবং সত্যপূর্ণ।

গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন মাত্র। পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, আধুনিক বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সি কতটুকু ক্ষুদ্রতম অংশ বখতিয়ার অধিকার করিয়া ছিলেন।

মহম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপ অধিকারের অব্দ লইয়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে একটা বিশেষ গোলযোগের সূত্রপাত উপস্থিত হইয়াছে।* কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ ইতিহাসলেখকের মতে ১২০৫ খৃষ্টাব্দ (১১২৭ শকাব্দে) এই ঘটনা হইয়াছিল। কারণ লক্ষ্মণসেন দেবের সমসাময়িক সদুক্তি কর্ণামৃত-প্রণেতা শ্রীধর দাসের লিখিত বিবরণে আমরা তাঁহাকে ১১২৭ শকাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে দেখিতে পাইতেছি, তখন আমরা কখনই বলিতে পারিব না যে ১২৩৩ খৃঃ (১১২৫ শকাব্দে, আধুনিক ইতিহাসে এইমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) কিংবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে মুসলমানগণ বাঙ্গালার নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন।

মিনহাজের লিখিত বিবরণে আমরা আরও জানিতে পারি যে "লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিলে মহম্মদ বখতিয়ার তাঁহার সৈন্যগণকে নগর লুণ্ঠন করিতে আদেশ দিলেন। কেবল রাজভাণ্ডার ও হস্তিগুলি তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তৎপর বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতীতে মন করিয়া তথায় রাজপাঠ স্থাপন করিলেন। মুসলমানদিগের থানুসারে মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

বখতিয়ার তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—পূর্ব্বভাগ "লক্ষ্মণাবতী দেবকোট" পশ্চিমাংশ "লক্ষ্মণাবতী লক্ষনৌর।" দিনাজপুরের অন্তর্গত "দেবকোট" রাজধানী ছিল, আধুনিক বীরভূমের অন্তর্গত রাজধানীর নাম "লক্ষনৌর," উত্তরকালে "নগর" নামে পরিচিত ছিল। এই প্রাচীন "নগর" "লক্ষনৌর" হইতেই পশ্চিমাংশ "লক্ষ্মণাবতী লক্ষনৌর" নামে বিখ্যাত ছিল।

* এতদ্ সম্বন্ধে বাবু কৈলাশচন্দ্র সিংহ প্রণীত "সেন রাজগণ" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

বখতিয়ারের অদম্য আকাঙ্ক্ষাপ্রণোদিত বঙ্গবিজয়ের কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সাধ্যমত ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই—ক্ষুদ্র লেখনীর সাহায্যে যতদূর সম্ভব ততদূর এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাধ্যমত বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বারান্তরে পাঠকবর্গকে আরও ২।১টী কথা শুনাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।

কলঙ্ক।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পত্র।

ভাই বিমলাচরণ,

আমাদের ছাত্রজীবন শেষ হইল; তুমিও চাকুরী লইয়া বিদেশবাসী হইলে। আমি এখন কি করিয়া সময় কাটাইব ভাবিতেছি। সংসার কর্ম্মময়; এবং মনুষ্যজীবনও কর্ম্মসেবায় নিয়োজিত হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পীড়িতের আর্ত্তনাদ, পীড়কের জয়োল্লাস, দরিদ্রের দৈন্য, ধনীর ঔদাসীন্য, দুঃখীর মর্ম্মবেদনা এবং সুখীর ভোগবাসনা, আমাদিগকে নিয়ত কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছে। মূর্খের অপমান, জ্ঞানীর অভিমান, পুণ্যের মলিনতা, পাপের অসীমতা, পরার্থপরতার অভাব এবং আত্মাদরের প্রভাব আমাদিগকে কর্ম্মপরায়ণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। কিন্তু কি করিব? এই অনন্ত তরঙ্গসংক্ষুব্ধ সংসারসাগরে আমার ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যের ভেলা ভাসাইতে পারিব কি?

আমার পিতৃদেবের ইচ্ছা, আমি আইনব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই। এ ব্যবসায়ের উপযোগী অনেক আয়োজনও করিয়াছিলাম, জান। কিন্তু রামের সম্পত্তি শ্যামকে দিয়া, অথবা জমীদারের চক্রান্তজড়িত নিরীহ প্রজাকে জেলে পাঠাইয়া, আমার কি সুখ হইবে? মনীষীনাথেরও ইচ্ছা নয় যে আমি ব্যবহারজীবী হই। তিনি আমারও গুরু আমার পিতারও গুরু, তিনি জ্ঞানী, তিনি ধার্ম্মিক, তিনি ঋষিতুল্য। তাঁহার ইচ্ছা যে আমি বুদ্ধদেবপ্রমুখ মহাপুরুষদিগের পদানুসরণ করিয়া কর্ম্মযজ্ঞ আরম্ভ করি। কিন্তু এ যজ্ঞের জন্য, সমিৎপুষ্পাদি আহরণ করিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার নাই। যে দেবপ্রসাদ ইহার প্ররোচনা, তাহা কি কখনও লাভ করিতে পারিব? ক্ষমা করিও, একটা ইংরাজী কথা তুলিবার প্রবৃত্তি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। Many are called, but few are chosen.

আমি কি করিব তাহা স্থির হয় নাই। কাজেই অতিশয় সুখময় কিছু-না-করা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ইহারই নাম বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। কথায় বলে যে, কোন কাজ না থাকিলে, খুড়ার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করে। আমার বেলায় কিন্তু উল্টা হইল। কোন কাজকর্ম্ম নাই দেখিয়া, দশজনে মিলিয়া আমার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিতেছে। চারিদিক হইতে আমার বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে। ধেড়ে বয়সে আর বাল্যবিবাহের নিষিদ্ধতার আপত্তি তুলিবার পথ নাই। পিতারও একান্ত ইচ্ছা, আমি বিবাহ করি। এ ইচ্ছা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; কারণ তাঁহার পারিবারিক জীবনের সুখহীনতা, আমার বিবাহে দূরীকৃত হইবে বলিয়া, তিনি আশা করেন। কিন্তু আমি যদি বিবাহ করিয়া সুখী না হই, তাহা হইলে তাঁহার আশা ত ফলবতী হইবে না। এখন আমি দশজনের অনুমোদনে বিবাহ করিলে, আমার জীবনের চিরপোষিত আদর্শ চূর্ণ হইয়া যাইবে। গুরু মনীষীনাথও

পিতার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। যাহা হউক, আমি যথাসাধ্য এ প্রস্তাব রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

শীঘ্রই একবার নগাধিরাজ হিমালয়দর্শনে যাইব। আমাদের আত্মীয় রাসবিহারী বাবু এখন দার্জিলিংএ। তাঁহার কন্যা মৃণ্ময়ী, সেখানকার লতাপাতা ফুল উপহার পাঠাইয়াছেন। তুমি যে অঞ্চলে গিয়াছ, সেখানে খুব পাহাড় আছে লিখিয়াছ। বঙ্গদেশই কেবল ধান্যক্ষেত্রপূর্ণ সমতল ভূমি। শীঘ্র পত্র লিখিও।

তোমার স্নেহের

বিভূতিনাথ।

দ্বিতীয় পত্র।

স্নেহের বিভূতিনাথ,

তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই পত্র লিখিয়াছিলাম। সেখানি নানা কথার বর্ণনায় আটপৃষ্ঠা কলেবর লইয়া গিয়াছে। বিদেশে, নিঃসঙ্গ গৃহে তোমার পত্রই আমার একমাত্র বন্ধু।

ফলাহারের নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণের অরুচি, এবং বিবাহে যুবকদের বৈরাগ্য, নূতন কথা বটে। তবে লুচি পাঁটার ব্যবস্থা থাকিলে চিঁড়ে দই উপেক্ষা করা যায়। পাহাড়ের লতা পাতার অনুরাগে শৈলভ্রমণে সাধ হইয়াছে ভাল কথা। কালিদাসের সময়ের 'একোহি দোষঃ' এখন গুণবিশেষে পরিণত; সেই দেবতাত্মা মনুষ্যের আবাসে পরিপূর্ণ। যদি দার্জিলিংএ যাও, তাহা হইলে দেবতাত্মার মন্দিরে সচলাদেবী দেখিতে পাও কি না, লিখিও।

কলিকাতার পাত্রীতে যদি মন না উঠে, তবে এখানকার একটা পাহাড়ে মেয়ে পাঠাইয়া দিব; কিন্তু রং খুব কাল; যৌবনসম্বন্ধা, অসিতাঙ্গিনী, মনমোহিনী নহে বলিতে পারিবে না। চক্ষু বড় উজ্জ্বল; বিনা আগুনে চুরুট ধরান চলিতে পারে। ভাল কথা; আমার জন্য

কিছু চুরুট পাঠাইয়া দিও। কেননা, বুদ্ধির গোড়ায় ভাল করিয়া ধোঁয়া না দিলে, তোমার মনের ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না।

স্নেহাধীন

বিমলাচরণ।

তৃতীয় পত্র।

প্রিয় বিমলাচরণ,

পিতার অসুস্থতার জন্য আমরা ভারি ব্যস্ত। এমন প্রবল জ্বর, কদাচিৎ দেখা যায়। প্রলাপ বকিতেছেন, এবং মুহুর্মুহু আমার স্বর্গবাসিনী জননীর কথা, ও আমার বিবাহের কথা বলিতেছেন। স্বতই মনে হইতেছে, যেন আমি বিবাহ করিব না বলিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। পিতার বন্ধু বান্ধবেরা নিরন্তর আমাকে বলিতেছেন যে, আমি প্রাচীন প্রথা অনুসারে বিবাহ করিব না, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় হইয়াছে বলিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। মনে হইতেছে যে, তোমাকে দার্জিলিং হইতে যে সকল কথা লিখিয়াছিলাম, কেহ কেহ তাহার আভাষ পাইয়াছেন বলিয়া, পিতৃদেবের শান্তির কামনায় এত ব্যস্ততা দেখাইতেছেন। এটা আমার অনুমান মাত্র।

যে আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া আমরা জীবনপথে অগ্রসর হইতেছিলাম, তাহা কি চিরদিনের মত পরিহার করিব? পিতার অসুস্থতা দেখিয়া অনেকবার ভাবিতেছি যে, আত্মসুখকামনায় জলাঞ্জলি দিয়া, যিনি জীবনদাতা, তাঁহার শান্তি এবং সুখবিধানের জন্য, যাহা করিতে হয় করিব। যত কষ্ট সহিতে হয় সহিব; কিন্তু অসহৃদয় সংসারের হাটে পিতৃহন্তা নাম ক্রয় করিব না। আবার ভাবিতেছি যে, আমি যদি বিবাহ করিয়া অসুখী হই, তাহা হইলে ত পিতার অসুখের সীমা থাকিবে না। এখন কি উপায় করি?

আমরা ঘটনা এবং অবস্থার দাস; আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? কতবার ভাবিয়াছিলাম যে, মনুষ্য জীবন করুণাময়ের কৃপাভূমিতে দৃঢ়প্রথিত স্তম্ভ। কিন্তু এখন মনে হইতেছে, যেন এ জীবন নিয়তির স্রোতমুখে তৃণমাত্র। পিতার শয্যাপার্শ্বে যাইতেছি; এখন বিদায় হই।

নিয়তিতাড়িত

বিভূতিনাথ।

চতুর্থ পত্র।

(সারদা বাবুর পত্র)

প্রিয় বিমলাচরণ,—

আমি তোমার শিক্ষক, তুমি আমার ছাত্র। তোমাকে জোর করিয়া একটা কাজ করিতে বলিলে করিবে না কি? বিভূতিনাথের পিতার অসুস্থতার কথা হয় ত শুনিয়াছ। তাঁহার মত: আদর্শচরিত্র, ন্যায়পরায়ণ এবং পরোপকারী ব্যক্তি সমাজে দুর্লভ। তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য বিভূতিনাথ যদি জীবন বিসর্জ্জন করেন, তাহাও প্রার্থনীয়। বিভূতির মাতৃস্নেহহীন শৈশব এবং যৌবন, যাঁহার স্নেহে পালিত এবং বর্দ্ধিত; তাঁহার জীবন রক্ষার উপায় এখন বিভূতি নাথের হস্তে। রোগ-শয্যায় পড়িয়া বিভূতিনাথের মাতার কথা, এবং বিভূতিনাথের বিবাহের কথা যে ভাবে বলিতেন, তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই তোমার মন গলিয়া যাইত। পুত্রবধূ লাভ করিলে, তিনি হতভাগিনী সহধর্ম্মিনীর বিয়োগ-দুঃখ বিস্মৃত হইতে পারিতেন। আত্মসুখ উপেক্ষা করাই যখন শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম, তখন বিভূতিনাথ প্রাচীন প্রথায় বিবাহ করিয়া পিতাকে সুখী করুন। আমরা এ বিষয়ে কথা কহিলে তিনি উত্তর দেন না। এ সময়ে তুমি একবার উঁহাকে অনুরোধ কর। বিবাহ পদ্ধতিটা যাহাতে তাহার মনের মত হয়, অথচ সমাজদ্রোহিতা না হয়, তাহার ভার লইতে

আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি। নিশ্চয়ই অনুরোধ করিও; আমাদের অনু-রোধেই না হয় অনুরোধ করিও—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীসারদা প্রসাদ—

পঞ্চম পত্র।

প্রিয় বিভূতিনাথ—

তোমাকে, তোমার পিতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে অর্থাৎ একবার হাতে সূতা বাঁধিতে অনুরোধ করার জন্য, অনুরুদ্ধ হইয়াছি। তোমার মনের কথা জানি, কষ্টের কারণ কি তাহাও বুঝিতেছি; এমন অবস্থায় একটা ঢেঁকি গিলিতে অনুরোধ করা সহজ নয়।

তুমি মানসপটে যাঁহার ছবি আঁকিয়াছ,—তিনি তোমার প্রণয়-প্রার্থিনী কি না, জান না। তাঁহার সদ্ব্যবহার, সৌজন্য এবং আনুগত্য, ভিন্ন শ্রেণীর স্নেহের ফলেও হইতে পারে। তুমিও ত লিখিয়াছিলে যে, নানা কারণে একটা সত্য সত্য প্রস্তাব করিবার দিকে তুমি অগ্রসর নহ। এরূপ অবস্থায়, যদি তাঁহায় ছবিটি একটু অপার্থিব রঙে আঁকিয়া রাখ, এবং গৃহ-শান্তির জন্য একটা বিবাহ কর, তাহা হইলে চলিতে পারে কি না? কথাটা যেন আধখানা প্রাণে লিখিলাম। জমাট বাঁধিল না। যাঁহার আলোকে জগৎ ভাস্বর, তাঁহার আলোকে পথ দেখিয়া চলিও। তোমার পিতার আরোগ্যসংবাদের জন্য উৎসুক রহিলাম। মনীষী নাথকে আমার প্রণাম জানাইও।

হতবুদ্ধি

বিমলাচরণ।

ষষ্ঠ পত্র।

প্রিয় বিমলাচরণ—

অশেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। আমার সম্পূর্ণ ধারণা যে, তোমার

অনুরোধে অনেক উপকার হইয়াছে। ঈশ্বরকৃপায় বিভূতিনাথের শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার পিতা সুখী, পরিবার পরিজন সুখী, আমরাও সুখী।

বিভূতিনাথের মন এখনও প্রসন্ন নহে; কিন্তু অল্প দিনেই হইবে। বয়স না হইলে বিবাহ করিব না, এই ইংরাজি প্রথামূলক ভাবটা, তাঁহার অন্তঃকরণে বদ্ধ ছিল। সেইজন্য মনোনয়ন প্রথার অভাবে, এখনও বিবাহটা উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন যে, তাঁহার মনে হইয়াছিল, সে বিবাহে তিনি যেন একজন দর্শকমাত্র। পাত্রীটি খুব সুন্দরী কিন্তু বিভূতিনাথ তাঁহার মুখ দেখিয়া বলিয়াছেন যে, যদি মুখের ছবিতে মনের প্রতিকৃতি থাকে, তবে তাঁহার পত্নী খুব নির্ব্বিরোধী হইবেন; এবং তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা না দিয়া, সকল বিষয়েই উদাসীনতা দেখাইবেন। বিবাহকে বিবাহ বলিয়া গ্রাহ্য না করা, অথবা অন্য কোন ভাব মনে পোষণ করা, সামাজিক সন্নীতির বিরোধী। যাহা হউক তাঁহার কথাগুলি বড়ই অদ্ভুত। আশা করি তোমার বন্ধুটি যাহাতে উন্মাদগ্রস্তের মত কোন ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসারদা প্রসাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পত্র।

সোদরপ্রতিম বিমলাচরণ—

সংসারযাত্রায়, বিবাহের পালায়, পাত্র পাত্রী সং। যে দিন সং সাজিয়াছিলাম, সে দিন যদি তুমি দেখিতে! পিতার যেন এখন আনন্দ

আর ধরে না; আবার যেন বাল্য জীবন ফিরাইয়া পাইয়াছেন। সর্ব্বদাই হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, এবং দশরকমে লোকজনের সঙ্গে মিশিতেছেন। কিন্তু হায়! আমার অন্তঃকরণের অন্ধকার ঘণীভূত হইতেছে।

নানা গোলে তোমার একটা পুরাতন অনুরোধে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এবার তোমাকে সিগার ও সিগারেট পাঠাইলাম।

একটা ভাল কথা লিখি। শ্রীযুক্ত মনীষীনাথের নিকট বসিয়া বুদ্ধদেবের চরিত পাঠ ও শ্রবণ করিতেছি। ক্ষুদ্রদর্শীরা সংসারকে সুখময় বলে; কিন্তু বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, সংসার দুঃখময়। হিমালয়ের চির-তুহিনাবৃত শৃঙ্গে সূর্য্যকিরণসম্পাতের মত, মনীষীনাথের উন্নত এবং নির্ম্মল হৃদয়ে, সিদ্ধার্থের অপার্থিব শিক্ষার দীপ্তি বড় মনোহর। মনে মনে আশা হয় যে, একদিন সকল উপধর্ম্ম বিনাশ করিয়া, সেশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীতে জয়লাভ করিবে।

তোমার
বিভূতিনাথ।

দ্বিতীয় পত্র।

পিয়ং মে পিয়ং,

তোমার প্রেরিত চুরুটগুলি পাইলাম। তুমি ইহার সেবক না হইলেও সমজদার ব্যক্তি; বেড়ে চুরুট। মিষ্টান্নটা ইতর জনের জন্য; কিন্তু চুরুটটা নিশ্চয়ই আপনার লোকের জন্য।

কোন একটা নেশা না করিলে বুদ্ধি খোলে না; সাক্ষী কমলাকান্ত শর্ম্মা। ধূম্রপান যে সাহিত্যচর্চ্চার অনুকূল, তাহার অনেক বিলাতি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আজি চুরুটধূম্রমার্জ্জিত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি যে, তোমার আতঙ্ক এবং হুতাশ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। পাত্রী যখন সুন্দরী এবং সৎকুলোদ্ভবা, তখন পরে সুখী হইতে পারিবে।

বুদ্ধদেব কোন নেশা করিতেন না ; কাজেই তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বজনাদ্রিত হইবার আশা নাই। খৃষ্ট বিশুদ্ধ জলকেও লাল পাণিতে পরিণত করিতে পারিতেন। শিষ্যদিগকে রুটির সঙ্গে যাহা পান করিতে দিতেন, তাহা জান। তাঁহার ধর্ম্মের সঙ্গে বুদ্ধদেবের তুলনা! প্রকৃত পক্ষেই আমার মনে হয় যে, খৃষ্টধর্ম্ম, লোক সাধারণের যত উপযোগী, এমন আর দেখিবে না। সাধারণ লোকেরা একটা বিশুদ্ধ মত লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা যাহাকে কুসংস্কার বলেন, তাহা না থাকিলে সাধারণের মনোরঞ্জন হয় না। নিরবচ্ছিন্ন আলোক আমাদের চক্ষে বড় ক্লেশদায়ক। ভাল কথাও আছে, ভূতও আছে, নররূপী ঈশ্বর আছেন, স্বর্গ নরক আছে, শয়তান আছে, জেতা এবং প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত জাতির পৃষ্ঠপোষকতা আছে ; এমন ধর্ম্ম আর হয়? প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম লোক সাধারণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কিন্তু এ ধর্ম্ম বিজিত জাতির ধর্ম্ম, তাহার উপর ভিন্নজাতীয় লোক লইবার প্রথা নাই। কাজেই খৃষ্টধর্ম্মেরই জয়।! একটা মহাপুরুষ খাড়া করিতে না পারিলে, ধর্ম্ম গড়া যায় না। সে হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু আশা আছে। দেখিতে পাইতেছি যে, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে যীশুর পরিচ্ছদে পরাইয়া, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকামনায় নূতন আদর্শ গড়িতেছেন। বুদ্ধির কর্ম্ম বটে। কিন্তু গোবিন্দ অধিকারীর দূতীর ভাষায় আক্ষেপ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, "ও সে পীতধড়া কই, ও সে চূড়া কই, ও সে বাঁশী কই?" কেহ ইহাতে বলিতে পারেন যে, এ প্রকার পরিবর্ত্তনে ক্ষতি কি! ক্ষতি না থাকিতে পারে ; বরং একদিন এই প্রকার প্রয়াসে হিন্দু সমাজের উপকার হইয়াছিল। আদর্শ মহাপুরুষ লইয়া বৌদ্ধদের জয় হইতেছিল বলিয়া, তাহাদের পরাজয়ের জন্য, হিন্দুরা অবতার সৃষ্টি করিয়াছিল। পূর্ব্বকাল হইতে দেশময় যে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রবাদ কথা, প্রাচীন

প্রবাদরূপেই চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া, নূতন আদর্শে রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হইয়া, হিন্দুজাতির আদর্শ মহাপুরুষ গঠিত হইয়াছিল। কাজেই কেহ আমাকে বলিতে পারেন, যে একালে যদি আমার পরিবর্ত্তিত রুচির অনুসারে, মহাভারতের অংশবিশেষ সুবিধামত প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া নূতন কৃষ্ণ গড়া যায়, তাহাতে তোমার বা দূতীঠাকুরাণীর ক্ষোভের কারণ কি? বিলাতী আইনের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, প্রাচীন কথাগুলি "ফিক্‌সনের" কলে ফেলিয়া দিয়া, নূতন পুরুষের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও সেই "ফিক্‌সন"। ইহাতে হয় এই, খোলও বদ্‌লায়, নল্‌চেও বদ্‌লায়, তবুও সেই প্রাচীন হুঁকাটাই বজায় থাকে। আমি নেশাখোর লোক, অন্য দৃষ্টান্ত পাইলাম না। আমি বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থাদি বিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু আমার মনে হয় যে, সেখর বৌদ্ধধর্ম্মটাও উক্ত প্রকারের বদ্‌লান জিনিষ। তুমি কেন বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া আমাদের শিক্ষা দেও না?

তোমার

বিমলাচরণ।

তৃতীয় পত্র।

ভাই বিমলাচরণ,

এখন আর আমি বড় কেও একটা নহি। সুবিখ্যাত হুতুমের মত, আমার বাল্যকালের জেঠামিটুকু, মুরুব্বি আনায় দাঁড় করাইয়াছি। একটা সভা ফাঁদিয়া, বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনার একশেষ করিতেছি। কথা এই, উপলক্ষ্য না থাকিলে দিন কাটে না। তাই, যাহারা শিক্ষিত এবং মার্জ্জিতরুচি তাঁহাদের সঙ্গে মিলিবার মিশিবার সুবিধার জন্য একটি সভা করিয়াছি। তোমাকে আন্দাজে বলিতে হইবে,

এ সভার সভ্য কে কে। এই সভার কৃপায়, সময়টা সুখে অতিবাহিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিও; তোমাকে কয়েকখানা বই পাঠাইয়া দিব। বড় হাসি পাইল যে, তুমি আমাকে সাময়িক পত্রাদিতে লিখিতে, ওরফে গ্রন্থকার হইতে অনুরোধ করিয়াছ। এমন কি পাপ করিয়াছি, যে আমার চিন্তা এবং ভাবগুলির মুক্তপক্ষ স্বাধীনতা নষ্ট হইবে? এবং সেগুলি মুদ্রাযন্ত্রের লোহার ফর্ম্মার চাপে ছিন্নপক্ষ হইয়া, চিরকালের মত ডিমাই বা রয়েল পৃষ্ঠা পরিমিত স্থানে অবরুদ্ধ থাকিবে? গ্রন্থকার জাতির লক্ষণ এই যে, তাঁহারা একবার কোন কথা ছাপাইয়া ফেলিলে, পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না। বরং আপনাদের অভ্রান্ত কথাগুলির গৌরব রক্ষার জন্য, কেবল নিরন্তর মিথ্যার উপর মিথ্যা চাপাইয়া চলেন। প্রতি দিন যাহার মতের পরিবর্ত্তন, তাহার পক্ষে লেখক হওয়া সাজে না। সত্য কথা এই, যে আমি এমন সুকৃতি করি নাই, যে অক্ষরময়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিব।

কিছুদিন হইল বড় অবসরের অভাব হইয়াছে বলিয়া, তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইতেছে। আমার পিতার দুই জন বন্ধু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিবারবর্গের দেখিবার কেহ নাই; অথচ অনেক সম্পত্তি আছে। সে সকলের তত্ত্বাবধান করিতে হইতেছে। অনেক বন্ধু আছেন, যাঁহারা এটর্ণিকে টাকা দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষয়িক ব্যবহারের কাগজপত্রগুলির লেখাপড়া করিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের একটু সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতে হইতেছে। কলিকাতা সহরে মৌনী শিয়ালের দৌরাত্ম্যে, অনেক গরীব ভদ্রলোককে নাস্তানাবুদ হইতে হয়। তাঁহাদের জন্য একটু পরিশ্রম করিতে পারিলে, পরিশ্রমের স্বার্থকতা হয়।

তোমার কি ইহজন্মে ছুটী হইবে না! একবার আমাদের অবস্থা স্বচক্ষে

দেখিয়া যাইও। রাসবিহারীবাবু কিছুদিন সপরিবারে একবার আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, এখন কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়াছেন। আমি একটু অবকাশ পাইলেই একবার দেশ পর্য্যটনে বাহির হইব সংকল্প করিয়াছি।

তোমার

বিভূতিনাথ।

চতুর্থ পত্র।

ভাই বিভূতি,

সভা সমিতি, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি লইয়া সুখে আছ লিখিয়াছ, সেটা ভাল কথা। যেমন করিয়া হউক, সুখে আছ শুনিলেই সুখী হই। কিন্তু তোমার নামে একটা নালিশ দায়ের হইয়াছে। তোমার পত্নীর সহিত তোমার নাকি দেখা শুনা হয় না, এই কথা। একবার শুনিয়াছিলাম যে, তুমি তাঁহাকে মনের মত করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিতেছিলে। অথবা তোমার ভাবগতিক বুঝিয়া, তোমার মনেরমত করিবার জন্য, তোমার পিতা তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, তিনি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ বা মমতা প্রদর্শন করেন নাই। তার পর এই নালিশ। একবার নিজে গিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবে, সে সুবিধা হইতেছে না। শীঘ্র কৈফিয়ৎ দিবে।

তুমি দেশ পর্য্যটনে বাহির হইবে লিখিয়াছ। কিন্তু কোথায় যাইবে লেখ নাই। এবার শীঘ্রই জবাব দিও।

তোমার

বিমলাচরণ।

পঞ্চম পত্র।

ভাই বিমলা,

দুঃখের দিন দুঃখেই যাইবে। আপনাকে সুখী করিবার জন্য যত

আয়োজন করিলাম, সকলই বিফল হইল। বিবাহের পর ভাবিয়াছিলাম, যে যখন এক সঙ্গে ঘর সংসার করিতেই হইবে, তখন একটা আপোষ করা ভাল। কিন্তু দেখিলাম যাহাতে যাহাতে আমার রুচি, ঠিক তাহাতেই অর্দ্ধাঙ্গিনীর অরুচি। আমি যাহা পরম পবিত্র বোধ করি, তিনি তাহার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চাহেন না। এমন করিয়া কতদিন চলে? যাহার প্রতি ভালবাসা নাই, আসক্তি নাই, তাহাকে সঙ্গিনী করিয়া, কত দিন নরক যন্ত্রনা ভোগ করিব? একা একা বেশ কাটন যায়, আর নিরুপমা ঠাকুরাণীও ইহাতে অসন্তুষ্ট নহেন। তিনি গঙ্গাজল এবং পুতুল সাজান আলমারী লইয়া সুখে আছেন। তিনি যখন সুখে আছেন, তখন অন্য কাহারও নালিশ করিবার অধিকার কি? উপযুক্ত পক্ষের অভাবে, নালিশি আর্জ্জিখানা সরাসরি ভাবে নামুঞ্জুর করিও।

শরীর সুস্থ নয় বলিয়া ডাক্তারের উপদেশে স্থানান্তরে যাইব, কিন্তু এখনও গন্তব্য স্থান স্থির করি নাই।

তোমার

বিভূতিনাথ।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পত্র।

স্নেহের বিমলাচরণ,

* * এই স্থানটি বড় মনোরম। তরঙ্গউৎক্ষেপচঞ্চলা নদী, গৃহসোপানমালা ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। চতুষ্পার্শে পুষ্পবাটিকা। কোথাও পাখী ডাকিতেছে, কোথাও প্রজাপতি উড়িতেছে, এবং সর্ব্বত্র স্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে। প্রভাত সমীরণে অঙ্গ

ঢালিয়া দিয়া, একাগ্রচিত্তে তোমাকে পত্র লিখিতেছি। ইচ্ছা হইতেছে যে, পত্র ভরিয়া কেবল নদীর তরঙ্গরঙ্গ, পুষ্পগন্ধ এবং মলয় সমীরণ পাঠাইয়া দিই। কিন্তু বিষাদগাথাই নাকি আমাদের মধুর গীতি, তাই প্রকৃতির সুখগৃহে বসিয়াও দুঃখের কথা লিখিব।

আমার শরীর দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছে; মানসিক স্ফূর্ত্তি বা উৎসাহ চলিয়া যাইতেছে। যৌবনের প্রারম্ভেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। জীবনধারন সুখকর না হইলেও বাঁচিয়া থাকিতে হয়, ইহাই আশ্চর্য্য।

অনন্তরূপশালিনী প্রকৃতির চরণতলে বসিয়া কিছু কিছু কাব্য আলোচনা করিতেছি, এবং মৃণ্ময়ীকে ইংরাজি কবিতা পড়াইতেছি। ইহার বুদ্ধির প্রখরতা এবং কাব্যানুভূতি এত বেশী, যেন শিক্ষা দিতে গিয়া অনেক স্থলেই শিখিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে। উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিবার জন্য ইঁহার পিতা মাতা বড় আগ্রহ করিতেছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহাদের সাহায্য করিতেছি। কিন্তু মেয়েটি কোন প্রকারেই বিবাহে সম্মত হয় না।

রাসবিহারী বাবুর সঙ্গে বাস বড়ই তৃপ্তিদায়ক। ইনি ধার্ম্মিক পরোপকারী এবং সাহসী। সংস্কারক বলিয়া ইঁহার জাতি গিয়াছে। যে সমাজে ভদ্রলোকের জাতি যায়, সে সমাজ কতদিন টিকিয়া থাকিবে?

তোমার

বিভূতিনাথ।

দ্বিতীয় পত্র।

প্রিয় বিভূতিনাথ,

মনীষীনাথের পরলোকযাত্রার পর, সংসার তোমার নিকটে জীর্ণারণ্য বলিয়া মনে হইতেছিল, লিখিয়াছিলে। স্বাভাবিক বটে। তাঁহার মত জ্ঞানী এবং সহৃদয় ব্যক্তি এ সমাজে আর কই? যাঁহারা খ্যাতিলাভের জন্য সংসারের হাটে প্রতিভার দোকান খোলেন, তাঁহাদের

মূঢ়তা এবং ধৃষ্টতা যত দেখি, ততই মনীষীনাথের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি। জীবনবিজ্ঞানের সুতীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ পড়িয়াও, ইঁহাদের পরলোক-গমনে স্বতই মনে হয় যেন "পরগৃহমস্মাকম্"। তোমার পিতৃদেবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার সেবার জন্য রাসবিহারী সপরিবারে আসিয়াছেন, এ সংবাদে সুখী হইলাম। বৃদ্ধ বয়সের রোগ, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা উৎকণ্ঠার বিষয় হইলেও, সমুচিত সেবায় তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন আশা করি। আমি যে দূরদেশে থাকি, তাহাতে পত্র পাইতে বহু বিলম্ব হয়। শীঘ্র পত্র লিখিও।

তোমার

বিমলাচরণ।

তৃতীয় পত্র।

ভাই বিমলাচরণ,

পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর হইতে, যে সকল কৃত্রিম বন্ধনে সংসারটি বাঁধা ছিল, তাহা শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন প্রথা মানি নাই অর্থাৎ হীন পৌরাণিক প্রথা অবলম্বন করিয়া শ্রাদ্ধাদি করি নাই বলিয়া, নিরুপমা ঠাকুরাণী এবং গৃহের অন্যান্য লোকেরা আমাকে ভিন্ন জাতীয় এবং নিঃসম্পর্কিত বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। ভালবাসা কখনও ছিল না, কিন্তু বাহিরে একটা আবরণের ঠাট ছিল, এখন তাহাও গিয়াছে।

অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বিপদের দিনে আমার একমাত্র সুখ মৃণ্ময়ীর স্নেহলিপি। সে লিখিয়াছে যে, শীঘ্রই এখানে আসিবে এবং রাসবিহারী বাবু নিজে রাখিয়া যাইবেন।

সাধের সমিতিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু সমিতির বন্ধুদিগের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হই নাই। তবে সকলেই আমার মত নিষ্কর্ম্মা নহে

এবং কেহ কেহ যশ ও পদমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য রাত্রিদিন ব্যস্ত বলিয়া, পূর্ব্বের মত দেখাশুনা হয় না।

বিপদসঙ্কুল

বিভূতিনাথ।

চতুর্থ পত্র।

(শারদাপ্রসাদের পত্র)।

প্রিয় বিমলাচরণ,

তোমাকে একটি অনুরোধ করিতেছি। বিভূতিনাথকে লিখিয়া দিও তিনি যেন মৃণ্ময়ীকে গৃহে স্থান না দেন। সন্তানের উপর পিতা মাতার প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী। তাঁহার মাতা যখন তাঁহাকে বিবাহিতা করাইতে চাহেন, তখন তাঁহার আপত্তি ধর্ম্মবিরুদ্ধ। মাতা যাঁহাকে সম্প্রদান করিবেন তাঁহাকেই গ্রহণ করা কন্যার কর্ত্তব্য। কেবল বিবাহের প্রস্তাব এড়াইবার জন্য উনি বিভূতিনাথের গৃহে আসিয়াছেন। বিভূতিনাথ বলিতেছেন যে তাঁহাকে খৃষ্টিয়ান কুমারীআশ্রমে পাঠাইবেন। ঐগুলি বাতুলতা নয় ত কি?

বিভূতিনাথ স্বাস্থ্যের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যাইবেন স্থির হইয়াছে। মৃণ্ময়ীও পরিবারবর্গের সহিত যাইবেন কথা হইয়াছে। যান, ক্ষতি নাই; কিন্তু মাতার কথা অনুসারে নিশ্চয়ই বিবাহ করা উচিত, একথা যেন বিভূতিনাথ তাহাদের বুঝাইয়া দেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশারদাপ্রসাদ।

পঞ্চম পত্র।

বিমলাচরণ,

বহুদিন পরে তোমাকে পত্র লিখিতেছি। আর কখনও লিখিতে পারিব সে আশা ছিল না। অতিশয় কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইয়া-

ছিলাম; এখন উঠিয়া বসিয়াছি। এই পীড়ার সময় মৃণ্ময়ী যেরূপ সেবা করিয়াছেন, তাহা ভুলিতে পারিব না। তাঁহারই কৃপায় এবার প্রাণ পাইলাম। রোগে পড়িয়াছি বলিয়া, নিরুপমা ঠাকুরাণীর তীর্থ-দর্শনে বড় ব্যাঘাত ঘটিতেছে। হিন্দুর অস্পৃশ্য খাদ্য পথ্যরূপে ব্যবহার করি বলিয়া সকলেই বিরক্ত! স্নেহ, দয়া, সৌখ্য প্রভৃতি, যদি গঙ্গা-জলের ছড়ার উপর নির্ভর করে, তবে ঐ পবিত্রজলেই উহার বিসর্জ্জন প্রার্থনায়। মনে করিও না, আমি কাহারও উপর রাগ করিয়াছি; সে অধিকার নাই। অন্যে যে দয়া করিবে তাহার উপর মৌরশি দাবি নাই। সংসারে নির্ম্মমতাও আছে, নিঃস্বার্থ পরসেবাও আছে। রোগ শয্যায় শুইয়া মৃত্যুকামনা করিয়াছিলাম; কিন্তু বাঁচিয়া উঠিয়া বাঁচিতে সাধ হইয়াছে। এই মনুষ্যপুত্তলিকা লইয়া যিনি ক্রীড়া করিতে-ছেন, সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

স্নেহের

বিভূতিনাথ।

ষষ্ঠ পত্র।

বিভূতিনাথ,

তোমার পীড়ার সংবাদে উৎকণ্ঠিত হইতে হয় নাই; একেবারেই আরোগ্য সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীমতী মৃণ্ময়ীদেবীকে আমার সভক্তি নমস্কার জ্ঞাপন করিবে। তোমার সম্পূর্ণ আরোগ্য সংবাদ-পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

তোমার

বিমলাচরণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পত্র।

ভাই বিমলাচরণ,

এখন প্রয়াগধামে আসিয়াছি। রোগে মাথার চুল উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই মস্তক মুণ্ডনের প্রয়োজন হইল না। ইংরাজী jealousy শব্দের বাঙ্গলা কি ভাই? বহুবিবাহের দেশে নায়িকাদিগকে কোপিনী এবং অভিমানিনী দেখিতে পাই; ঐটি কি সেই পদার্থ? যাহাই হউক, নিরুপমা ঠাকুরাণীকে এ সকল ভাবের কোনটিও কদাচ স্পর্শ করিতে পারে না। সকলেরই গুণের প্রশংসা করা যায়।

যাহার করুণায় মুক্তিলাভ করিয়াছি, যাঁহার মাহাত্ম্য আমরা চির-দিনের আদর্শ, যাঁহার মধুরতা আমার তিক্ত জীবনে একমাত্র উপাদেয় সামগ্রী, তিনিই আমার মুমূর্ষু হৃদয়কে পুনরুদ্দীপিত করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

এখানে একজন পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে সমাজতত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যা লইয়া কথাবার্ত্তা হইয়াছে। বিবাহ-প্রথার উৎপত্তি ও ইতিহাস লইয়া ইঁহাকে ম্যাক্‌লিনেন্ লাগায়েৎ গ্রান্ট আলেন্, অনেকের মতের সমালোচনা করা গেল। পুরুষের খলস্বভাব এবং স্ত্রীজাতির পরাধীনতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই প্রথার সৃষ্টি হইত না। যতই দীর্ঘজীবী হউক, মনুষ্য অল্প দিনের জন্যই পৃথিবীতে থাকে। অল্প কয়েকটি দিনের জন্য কপটতা বা গোঁজামিল চালাইবার আবশ্যকতা কি? যাহা হৃদ্য, হিতকর এবং শ্রেয়ীপ্রেয়মিশ্রিত, তাহা দুদশজন লোকের ভয়ে করিতে কুণ্ঠিত হওয়া কেন? যাহারা যশলোলুপ বা গৌরবার্থী, সেই দীনহীন কৃপার পাত্রেরা যদি পরের মুখ চাহিয়া চলে, চলুক। কোথায়

মনুষ্যত্ব, যদি নিন্দা বা প্রশংসা উপেক্ষা করিতে না পারা যায়? কোন পুণ্যাত্মা এ পর্য্যন্ত এমন কোন সৎকার্য্য করেন নাই, যাহার জন্য তাঁহাকে নিন্দাভাজন হইতে হয় নাই। কোন পাপাত্মা এ পর্য্যন্ত এমন কোন পাপানুষ্ঠান করে নাই, যাহার জন্য কোন না কোন লোক তাহাকে বাহবা দেয় নাই। এরূপ স্থলে লোকের নিন্দার বা প্রশংসার সমানই মূল্য। তুমি কলিকাতা আসিবে লিখিয়াছ; আমরাও গৃহাভিমুখী। বহুদিন পর একসঙ্গে সকল কথা আলোচনা করিব এবং তোমাকে দেখিয়া সুখী হইব।

তোমার

বিভূতিনাথ।

দ্বিতীয় পত্র।

বিভূতিনাথ,

শীঘ্রই একবার স্বদেশ দর্শন কপালে ঘটিবে আশা হইতেছে। তবুও দীর্ঘ পত্র লিখিলাম।

সংবাদপত্রে বক্তাজাতির প্রশংসা পড়িয়া বক্তা হইবার সাধ হইয়াছে। কিন্তু এ অঞ্চলে শ্রোতা দুর্লভ। অনেক বিজ্ঞতা জমিয়া রহিয়াছে; কিন্তু মাতৃভাষার এত অল্পই চাষ করিয়াছি যে, কোন সম্পাদক, আমার জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধগুলি, বঙ্গীয় পাঠকবর্গের হিতকামনায়, মুদ্রিত করিতে রাজি হইবেন না। আমার পাদ্রিগিরি, তোমার উপরেই জারি করিব।

সমাজ কঠোর এবং নির্ম্মম; কিন্তু পাহাড় ভাঙিবার জন্য ঢিল ছুঁড়িলে, ঢিলটিই চূর্ণ হয়। সমাজ বর্ব্বর এবং হিংসাপূর্ণ কিন্তু কণ্টকে পদাঘাত করিয়া লাভ কি? সমাজ অত্যাচারী এবং উৎপীড়ক; কিন্তু যিনি উৎপীড়িত তিনি একাকী।

একালের সংস্কারকেরা অধিকাংশ স্থলেই সংস্কারের নামে যাহা

কিছু ইউরোপীয়, তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। সে জন্য শাসনকর্ত্তাদের জাতীয়েরা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন। তাঁহারাই আমাদের আশ্রয় এবং অবলম্বন বলিয়া, এবং হিন্দুজাতির স্বাধীনতা নাই বলিয়া, নির্ব্বিঘ্নে নূতন সংস্কার চলিতেছে। কিন্তু যে ভাব বা সংস্কার, হিন্দু অহিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান, দেশী বিলাতি, সকলের মনের মধ্যে তুল্যভাবে বদ্ধমূল, তাহার বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান আত্মবিনাশের উপায় উদ্ভাবন মাত্র। ব্রাহ্মদের দৃষ্টান্ত দিতেছি,—তাঁহারা প্রতিমা পূজার বিরোধী বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু দেখ, যাহারা ঈশ্বরের একটা লৌকিক ভাবে জাতপুত্র স্বীকার করে, এবং তাহাকে ঈশ্বর বলে, সেই নীচ পৌত্তলিকেরা ইঁহাদের আদৃত। তাঁহারা নীতিগর্ভ বক্তৃতা করিতে ব্রাহ্মমন্দিরে নিমন্ত্রিত হয়েন। ইহার কারণ এই যে, প্রতিমাপূজা কথাটা উহাদেরই ধুয়া; এবং উহাদের সামাজিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মদের আদর্শ। অন্যদিকে দেখ হিন্দুদের পৌত্তলিকতা প্রতিমাপূজায় প্রতিমা নামেই, মূর্ত্তির বাস্তবতা অস্বীকৃত। কথায় কথায় তাঁহারা মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া আপনাদের একেশ্বরবাদী বলিয়া স্বীকার করেন। নীচতাপ্রাপ্ত বৌদ্ধদের পুত্তলিকা হিন্দুর সমাজে এখন পূজিত হইলেও, হিন্দুরা তাহার বাস্তবতা মানে না। তথাপি উহাদের কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মেরা আদর করিয়া ডাকেন না। কেহ হয় ত বলিতে পারেন, এ দৃষ্টান্তে কেবল ইহাই প্রমাণিত হয়, যে ব্রাহ্মেরা ধর্ম্ম অপেক্ষা, কতকগুলি নূতন সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি বেশী যত্নশীল। সে কথা ঠিক। কিন্তু এ কথাও প্রতিপন্ন হয় যে, ইউরোপীয় সমাজের একটু ছায়া না পাইলে, অথবা কৃতকার্য্যের জন্য ইংরাজদের বাহবা না পাইলে, ইঁহাদের চলে না। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে নূতন সংস্কার, ইউরোপীয়দের আশ্রয়েই হইতেছে। কিন্তু যিনি বিবাহপ্রথার বিরোধী কোন কার্য্য করিতে বসিবেন, তাঁহাকে সকল সমাজের সমবেত উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে।

গ্রাণ্ট আলেন বা লিন্ লিন্টনের নায়িকাদের পবিত্রতা এবং তেজস্বিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু সমাজের উৎপীড়নে, তাঁহারাও যে পিশিয়া গিয়াছিলেন, এ কথাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

কথায় বলে যে, দশ চক্রে ভগবান ভূত। যে যত পবিত্র বা সংযত চিত্ত হউক না, সকলের বিদ্রুপের কটাক্ষ যদি তাহার উপর পড়ে; সকলে যদি ঘৃণায় অঙ্গুলি তুলিয়া তাহাকে দেখায়, তবে জীবনধারণ সম্ভবপর হয় না। কলিকাতায় বসিয়া এ সকল কথার আলোচনা হইবে। এখন দেখিও, কলিকাতায় যদি পাদ্রিগিরি কর্ম্ম খালি থাকে, আমি যেন সংবাদ পাই।

তোমার

বিমলাচরণ।

তৃতীয় পত্র।

বিমলাবাবু,

শুনিলাম, তুমি কলিকাতা আসিয়াছিলে; কিন্তু কেন যে আমাদের সঙ্গে দেখা কর নাই, তাহা তুমি জান। আর শুনিলাম যে তুমি একটি পাপ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছ। জনরব যে বিভূতিনাথ বৌদ্ধমতে নূতন বিবাহ করিয়াছে; এবং তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে। কে শত্রু, কে মিত্র জানিয়া রাখিবার জন্য, তোমাকে পত্র লিখিলাম। প্রকৃত কথা লিখিবে। বিভূতির পাপমুখ আর দর্শন করিব না।

পূর্ব্ব পরিচিত,

শ্রীশারদা প্রসাদ।

চতুর্থ পত্র।

(অমরেন্দ্রনাথের পত্র।)

প্রিয় বিমলাচরণ,

আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে বিভূতিনাথের মত পরোপকারী, অমায়িক, সৌজন্যশীল, সুপণ্ডিত এবং সচ্চরিত্র আর কে আছে? তাঁহার নূতন বিবাহের পর সকলেই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল পুণ্যাত্মাই তাঁহাকে পাপিষ্ঠ বলিতেছেন। তাঁহার কলঙ্ক হইয়াছে, হইবেও। আমরা ভিন্ন কে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবে?

যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু আমি যদি পূর্ব্বে এ সকল কথা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে বিভূতিনাথকে বিবাহ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। তিনি যে প্রকার সংযত এবং জিতেন্দ্রিয়, তাহাতে প্রেম এবং অনুরাগ হৃদয়ে পোষন করিয়া, শারীর সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া, সংসারের শত্রুতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন না কি? এ সকল বিষয়ে তোমার মত কি, লিখিবে। সমাজে তাঁহার কার্য্যকারিতা নষ্ট হইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছি।

তোমার

অমরেন্দ্র নাথ।

পঞ্চম পত্র।

প্রিয় অমরেন্দ্র,

* * * * * * *

বিভূতিনাথের ধর্ম্মবুদ্ধির হিসাবে তিনি অবিবাহিত হইলেও, লোকসমক্ষে পূর্ব্ব হইতে বিবাহিত ছিলেন। তাঁহার উপর বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়া বিবাহ! লোকে বিরক্ত হইবে না ত কি? দেশীয় নীতিসূত্রের কথার একটা তামাসা দেখ। মৃন্ময়ী যদি স্বজাতীয়া হইতেন, তাহা হইলে বহু বিবাহ করিয়াছে, এই পর্য্যন্ত বলিত; কিন্তু রাগ করিত না। সংস্কারকেরাও কিছু বলিতে পারিতেন না, যদি ইংরাজি রকম প্রথায় বিবাহ রদ করিবার কোন পন্থা থাকিত বিভূতিনাথ যে অবস্থায় পড়িয়া

এই বিবাহ করিয়াছেন, তাহাতে কোন ধীরতাসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারেন না।

আমি দেখিতেছি যে সকলেই পাপীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবার একটা সুযোগ পাইয়াছে। একটা বলিদান, শত শত লোকের মুক্তির হেতু। যাহারা মহাপাপিষ্ঠ, তাহারা এই সুযোগে বিভূতিনাথকে তীব্র কথা বলিয়া, পুণ্যানুরাগী বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের উপায় করিতেছে।

বিবাহ না করিয়া, কেবল মাত্র প্রণয় পোষণ করিয়া থাকা সম্ভবপর ছিল কি না, সে বিষয়ে কিছু বলিতেছি। সে ভাবেও ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছিল, তাহা জান। ভালবাসিয়া চুপ করিয়া থাক, এ কথা লিখিতে ভাল, বলিতে ভাল; কিন্তু অপ্রাকৃতিক। প্রকৃতিতে যদি মনুষ্যত্ব থাকে, অনুরাগে যদি যথার্থতা থাকে, তাহা হইলে মানব মাহাত্ম্যের চরম বিকাশের একমাত্র উপায় এবং হেতুভূত প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে, কেহ মিলনকে উপেক্ষা করিতে পারে না। সৃষ্টির লোকান্তরগত উদ্দেশ্য কি, তাহা জানি না। কিন্তু এই সৃষ্টিতে যদি ঈশ্বরের কোন ইহলোকসাধনী কল্পনা থাকে তবে তাহা প্রেম-মিলনেই লক্ষিত হয়। যাহারা ক্ষুদ্র পাত্রে জল রাখে, জল তাহাদের আয়ত্তাধীন। তাহারা বলিতে পারে জল ঢালা না ঢালা তাহাদের ইচ্ছা। কিন্তু স্রোতস্বিনী নদীকে কেহ বিজ্ঞতার উপলাবরোধে বাধা দিতে পারে না। জল সেচন করিয়া এবং রবিতাপে রাখিয়া, যে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তাহা মূলত জীবন শূন্য। যেখানে আমার প্রতিরূপ আসিয়া আত্মাকে দেখা দেয়, যেখানে প্রণয়স্পর্শে হৃদয় বিকশিত হয়, সেখানে মিলননিবারণ অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক।

বিভূতিনাথ সমাজের চাপে পিশিয়া মরিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার পাপ পুণ্যের বিচারক সমাজ নহে। যাঁহার পরম প্রশান্ত আশ্রয় সকলের কাম্য, তিনি তাহাকে আশ্রয় দিবেন। বিভূতিনাথ আমাকে লিখিয়াছেন যে "যাহা আমার চিরশান্তির সহায়, সেই প্রণয় লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমি সাংসারিক নির্দ্দয়তায় ক্ষুব্ধ নহি; কারণ যাহা আমার জীবনের পুণ্যফল, তাহাই সমাজের বিচারে আমার কলঙ্ক।"

তোমার স্নেহাধীন

শ্রীবিমলাচরণ।

অনুরোধ।

(অনুবাদিত।)

রূপের লাগি যদি আমারে ভালবাস
মিনতি করি ভালবেস না,
রবিরে বাস ভাল রূপের আধার সে
আমরে দিওনা সখা যাতনা।
ধনের লাগি যদি আমারে ভালবাস
চরণে ধরি ভালবেস না,
জলধি ভালবাস রতন আকর সে
মিটিবে সখা তব কামনা।
আমার লাগি যদি আমারে ভালবাস
জনম জনম সখা ত্যজনা,
অর্ঘ্য সম হৃদি দিবহে তব পায়
আপনি বিকাইব আপনা।

রূপ ত দুদিনের, সুখ সে স্বপনের
দুদিনে চলে যাবে রবে না,
প্রেম যে চিরদিন রহিবে হৃদে লীন
কভু বিপথ পানে চাবে না।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

"অবোধী সখী।"

কতিদূর সহি যামুন তট
কতিদূর সহি বংশীবট—
কতিদূর সহি শ্যামরায়—
—বুঝই পারসি তুঝ হিয়ায়?
না না সহি না পারসি তুঁহু।
—মঝু হিয়া সঙে শ্যাম সে রহু।
এমঝু হিয়ায় যামুনতট!
এমঝু মাহ সে বংশীবট!
তুহুঁ সখী সভ অবোধী ভেলি।
কহে ভালে এ খেলি!

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ১৩১০। { ৮ম সংখ্যা।

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজকুমারী চলিয়া যাওয়ার পর আমার কোন বন্ধু আমায় এক দিন কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"রাধার কি হইল
অন্তরেতে ব্যথা,
বসিয়া বিরলে
থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারু কথা"!

বন্ধুর বিদ্রূপ বাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম বটে, কিন্তু সে হাসি কাষ্ঠ হাসি মাত্র; সে হাসিতে প্রাণের যোগ ছিল না,—মুখে যাই বলি, অন্তরে অন্তরে কিন্তু বন্ধুর সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সত্যই

সুখ-শেষে দুখ হবে
আগে কে জানিত বল,

প্রেম হবে 'পূর্ব্ব-স্মৃতি'
হাসি হবে আঁখি-জল।—

কয়েক মাস পূর্ব্বে ত ও সব জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না—হায় আমার এ সাদা মনে কেন কালি পড়িল, এখন আমি রাত্রিদিন ভাবি,

কেন লো পরের করে
সুখের নির্ভর করে,
আপনা আপনি কেন
সুখী নহে নর,
সদাশিব সদানন্দ
সতী বিনা নিরানন্দ
শ্মশানে ভ্রমেন ভোলা,
ভোলা মহেশ্বর!

আর ভাবি, রাজকুমারী কি নিষ্ঠুর! অন্য সম্বন্ধের কথা ছাড়িয়া দিই, সেত আমার ছাত্রী, আজ দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল—তবু কি তার এক ছত্র পত্র লিখিবার সময় হইল না! তখন আবার অজ্ঞাতে কত কথা মনে আসিত!

মনে হইত,
জানে কাঁদি তার তরে
তবু সে বিলম্ব করে
রমণী নিষ্ঠুর—

ভাবিয়া ভাবিয়া শেষ স্থির করিলাম——রমণী অসার, নিশ্চয়ই—

রমণী প্রণয় লেখে
জলের অক্ষরে।

———

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজকুমারীর বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। বধূঠাকুরাণীকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার পিত্রালয় হইতে একটি ঝি-সহ একজন আত্মীয় আসিলেন। কিন্তু বধূ ঠাকুরাণী এ বিবাহে উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃতা হইলেন না। তিনি বলিলেন 'আমি গেলে ছোট ঠাকুরের খাওয়ার কষ্ট হইবে, তাঁহার যত্ন করার অন্য লোক নাই, তাঁকে একা ফেলিয়া কেমন করিয়া যাই?

একে পিত্রালয় হইতে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিয়াছে, তায় সম্মুখে ভগিনীর বিবাহ, এ সুযোগ কোন হিন্দুরমণী পরিত্যাগ করেন? বধূ ঠাকুরাণীর আত্মীয়টি বধূ ঠাকুরাণীর এই অ-রমণী-সুলভ কথায় নিতান্তই বিরক্ত হইলেন,—তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন—কালে কালে একি হইল—মেয়েগুলা শ্বশুরবাটি হইতে বাপের বাটী যাইতে চায় না, কি বেহায়া, সাক্ষাৎ কলি কি না!

বধূঠাকুরাণীর মনের ভাব বুঝিলাম। তাঁহার প্রস্তাবিত সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার শ্বশুর-কুলকে দরিদ্র মনে করিয়া, তাঁহার পিতামাতা যে ভগিনীর অন্যত্র সম্বন্ধ করিতেছেন, এ অপমান, এ অভিমান তিনি ভুলিতে পারেন নাই! কেন তাদের কিসের অভাব? তাঁহার অপেক্ষা সুখী কে? কেবল ঐশ্বর্য্যই কি সুখের মূল? তাঁহার গর্ব্ববিস্ফারিত লোচনে, তেজদৃপ্ত বদনে যেন এই কথাই প্রকাশ পাইতেছিল। ইহার ভিতর আরও বুঝি কিছু কথা ছিল,—সে কথাটা মনে না হইলে, হয়ত শুধু অভিমানে এতটা হইত না!

দাদার শ্বশুর-বাটীর সেই আত্মীয়টি কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বধূঠাকুরাণীর

নামে ডাকে একখানি পত্র আসিল। কার এ হস্তাক্ষর,—এ যে রাজকুমারীর চিঠি! রাজকুমারী তার দিদিকে লিখিয়াছে—"দিদি, আপনি কবে আসিবেন? আপনাকে দেখিবার জন্য মন বড় অস্থির হইয়াছে। আপনি আসিতে আর বিলম্ব করিবেন না। আপনার ছোট ঠাকুরকে আমার প্রণাম জানাইবেন। আপনার সঙ্গে তিনি এ সময় একবার আসিলে আমি বড় সুখী হই!"

রাজকুমারীর বিবাহের সময় আমি উপস্থিত থাকিলে সে বড় সুখী হয়—তার এ সুখ, এ সাধ কেন আমি অসম্পূর্ণ রাখিব! রাজকুমারীর সুখই ত সুখ,—আমি কে? রাজকুমারীর হাসিমুখ দেখিবার জন্য আমি সমস্তই সহিতে প্রস্তুত!

সেই ডাকে আরও দুইখানি পত্র আসিয়াছিল—একখানি দাদার। তিনি বধূঠাকুরাণীকে সপ্তাহের জন্য পিত্রালয় যাইতে লিখিয়াছেন, আমাকেও যাইতে বলিয়াছেন—তিনি ভিতরের এত কাণ্ড জানিতেন না! অপরখানি দাদার শ্বশুরমহাশয়ের; তিনি বধূঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া আমাকে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন!

পত্রগুলি পড়িয়া বধূঠাকুরাণী একবার গম্ভীর মুখে আমার দিকে চাহিলেন—বলিলেন "ছোট ঠাকুর!"

ভারত শাসন।

আধুনিক ভারত-শাসনের অঙ্গ নানা ভাগে বিভক্ত। সম্রাট হইতে সামান্য গ্রাম্য চৌকিদার পর্য্যন্ত এই বিপুলকায় শাসন-সৌধের অংশ। সম্রাট তাঁহার প্রতিনিধি দ্বারা এ দেশ শাসন করেন বটে কিন্তু প্রতি-

নিধির স্থান স্বয়ং সম্রাটের নীচেই নহে। রাজপ্রতিনিধি বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিস্ এবং তাহার অধ্যক্ষ ষ্টেট্ সেক্রেটারীর অধীন। ষ্টেট্ সেক্রেটারী আবার পার্লামেণ্টের অধীন। সম্রাটপ্রতিনিধির বিস্তৃত শাসনচন্দ্রাতপতলে আবার নানারূপ বিভাগীয় শাসনকর্ত্তাদের মসনদ। সুতরাং বলিতে হয় যে এই বিপুল শাসন ব্যাপার যেন বহু এক-কেন্দ্র-বৃত্ত (Concentric Circles) দ্বারা সমাচ্ছন্ন, একটি বৃত্তের পক্ষপুটতলে অন্য বৃত্ত অবস্থিত। একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি বৃত্ত অঙ্কিত করিলে তাহাদের মধ্যে বৃহত্তম বৃত্ত যেমন কেন্দ্র হইতে দূরতম, এ ক্ষেত্রেও প্রায় তাহাই হইয়াছে। সম্রাট বা ইণ্ডিয়া আফিস্ বিলাতে অবস্থিত; সুতরাং তাঁহারা ভারত হইতে কেবল বহুদূরে আছেন এমন নহে, ভারতবর্ষের সহিত মাত্র উপাধি ভিন্ন অন্য কোন রূপে বিশেষভাবে সংযুক্তও নহেন। তাঁহাদের এই ভারতবর্ষের সহিত যে যোগ তাহা official যোগ মাত্র, রক্ত-মাংস অথবা হৃদয়ের যোগ নহে।

ভারত-সম্রাট যুবরাজাবস্থায় এ দেশে ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন, এ দেশের লোকচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা না আছে এমন নহে, তিনি সম্ভবতঃ এদেশবাসীকে প্রাণের টানে ও স্নেহচক্ষে দেখিতে পারেন, কিন্তু ইউরোপীয় আধুনিক রাজতন্ত্রের আবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহাকেও হয়ত মনের কথা মনেই চাপিয়া যাইতে হয়। কোন নূতন বিধিব্যবস্থা-প্রণয়নে, যুদ্ধাদিঘোষণায়, শান্তি-সন্ধি-সংঘটনে অথবা অন্যায় বিচারের প্রতিকারে রাজার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতার কথা প্রকাশ থাকিলেও কার্য্যকালে রাজা সে ক্ষমতার কোনরূপ পরিচালনা করেন না, ইহাই হইল বর্ত্তমান ইউরোপীয় রাজনীতি। ইউরোপীয় অধিকাংশ রাজাই এখন রাজ্যরূপ সৌধের শিল্প-সৌন্দর্য্য শোভিত চূড়াবিশেষ। তাঁহাদিগের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলে আনন্দ, ভক্তি, বিস্ময় সকলই মনে উদয় হয়, কিন্তু

তবু তাঁহারা রাজ্যের অলঙ্কার ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। দেশবাসীর সামাজিক বা রাজ-নৈতিক নেতা, রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি ও স্তম্ভ দেখিতে চাহিলে রাজা ভিন্ন অধুনা অন্যত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়।..

ভারত-সম্রাটের নিম্নে, বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীন ইণ্ডিয়া আফিস্ ও তদধ্যক্ষ ষ্টেট্‌সেক্রেটারী আমাদের ভাগ্যচক্রের দ্বিতীয় নিয়ন্তা। যাঁহারা ভারতীয় অর্থে রক্ষিত ও প্রতিপালিত ইণ্ডিয়া-আফিসের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের এদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যে যথেষ্ট এমন বলিতে পারা যায় না। তাঁহাদিগকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই উত্তর পাওয়া যায় যে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের কোন official সংবাদ তাঁহারা অবগত নহেন। সেকালে উত্তরবঙ্গে ভবচন্দ্র রাজার এক গবচন্দ্র মন্ত্রী ছিলেন। এইরূপ জনপ্রবাদ যে উক্ত মন্ত্রীপ্রবর আপনার বুদ্ধি পাছে বাহির হইয়া যায় এই ভয়ে ভীত হইয়া নাকে-কানে তুলা পুরিয়া রাখিতেন এবং চক্ষু সপ্তস্তর বস্ত্রে আবৃত করিতেন। রাজসভায় বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিবার কাল উপস্থিত না হইলে তিনি কখনই নাক, কান বা চক্ষুর আবরণ অপসারিত করিতেন না। ইণ্ডিয়ার ষ্টেট্‌সেক্রেটারী মহোদয়েরাও প্রায় উক্ত দশাপ্রাপ্ত। এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতার রাজ্যে তাঁহারা ভারত সম্বন্ধীয় কোন কথা জানিতে হইলে কম্পাশের কাঁটার মত কেবল একমুখী হইয়াই অবস্থান করেন, official দিকে ভিন্ন অন্য দিকে চক্ষুকর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যবশতঃ পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের প্রকৃত হিতৈষীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প; সুতরাং ভারতের তেলে জলে পুষ্ট ইণ্ডিয়া আফিসের সচিব মহাশয়কে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া উত্যক্ত করিতে, তাঁহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিতে সক্ষম হওয়ার আশা নিতান্তই কম। পুরাকালে হিন্দুরাজগণ অধীনস্থ কর্ম্মচারীর কার্য্যকলাপ, প্রজাবর্গের অবস্থা ও অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য বিশ্বাসী গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন। এই জ্ঞানোন্নতির দিনে, এই

সংবাদপত্র ও তাড়িতবার্ত্তা-প্রবাহের প্রচলনের দিনে রাজ্য সম্বন্ধে কোন সংবাদ অবগত হইবার জন্য গুপ্তচরের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে এমন মনে হয় না, কেবল একটুকু সজাগদৃষ্টি থাকিলেই হয়ত কাজ চলে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উচ্চকর্ম্মচারীর ন্যায়বুদ্ধি একটু অপ্রখর হইলে নিম্ন কর্ম্মচারীর অন্যায় আচরণে বাধা দেওয়া দূরের কথা, উভয়ে উভয়ের কার্য্যকলাপের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া ধন্য হন। বেতনের সঙ্গে যে স্থানে মাত্র সম্পর্ক, স্বদেশের কাজ করিতেছি এই বুদ্ধি-জনিত উৎসাহের যেখানে লেশমাত্রও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, সে স্থানে এতদপেক্ষা আর অধিক কি আশা করা যাইতে পারে। আর যে বিষয়ে শাসন করিতে হইবে সে বিষয়ে উচ্চ কর্ম্মচারীর জ্ঞান যদি নিম্ন কর্ম্মচারীর জ্ঞান অপেক্ষা অল্প হয় তবে সে ক্ষেত্রে উচ্চ কর্ম্মচারীর শাসন করিতে যাওয়া ভয় ও ধৃষ্টতা উভয়েরই উদাহরণ হইতে পারে।

ভারত সচিবের নীচে সম্রাট্-প্রতিনিধির আব্রহ্ম বিস্তৃত শাসন সংরক্ষণ বিভাগ। ইঁহাকে আসমুদ্র সমুদয় ভারতের রাজকার্য্য সমূহের কর্ণধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইঁহার শাসনকাল-মাত্র পঞ্চ-বর্ষস্থায়ী। এদেশ সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞতা লইয়া সাধারণতঃ সম্রাট-প্রতিনিধিগণ আগমন করেন তাহাতে রাজকার্য্যের গলি-ঘুঁজির সহিত পরিচিত হইতেই তাঁহাদের পদত্যাগের সময় উপস্থিত হয়। এই অবস্থা দেখিয়া বাগ্মীপ্রবর বার্কের একটি উপমা মনে পড়ে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক-দিগকে যখন চিমনীতে প্রবেশ করাইয়া তাহা পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত করা হয়, তখন বয়সের অল্পতানিবন্ধন তাহারা উক্ত কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না, কিন্তু যখনই তাহারা চিমনী ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে শিখে, তখনই বয়সবৃদ্ধির সহিত শরীরের আয়তন বর্দ্ধিত হওয়ায় আর চিমনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদের উচ্চতম এদেশীয় শাসন কর্ত্তাদের দশা প্রায় এই চিমনী-পরিষ্কারকদিগের

ন্যায়। তাঁহারা যখন এদেশীয় রাজকার্য্য ও লোক-চরিত্র বুঝিতে আরম্ভ করেন তখনই সমুদ্রের পরপার হইতে তাঁহাদের তলব হয়। কিন্তু এই পঞ্চবর্ষস্থায়ী পদের কালের সঙ্কীর্ণতার একটি ভাল দিকও আছে। যদি কোন শাসনকর্ত্তা দেশের পক্ষে কিসে ভাল হইবে তাহা বিশেষরূপে না জানিয়া আপনার অতিকর্ম্মঠতার গর্ব্বে অধীর হইয়া, কল্যাণবোধে কোন অকল্যাণকর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন তবে তিনি যতশীঘ্র এদেশ ত্যাগ করেন তাহাই দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গল।

রাজ-প্রতিনিধির কার্য্য বহুধা বিভক্ত। সন্ধি-বিগ্রহ হইতে ভোজ, নাচ, শিকার সকলই রাজকার্য্য। ভোজ, নাচ, শিকারেই রাজ-প্রতিনিধি যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাকে কাউন্সিলস্থিত মন্ত্রিবর্গের অধীন থাকিতে হয় এবং এই মন্ত্রিবর্গের অধীনতা যেমন স্বাভাবিক তেমনি প্রয়োজনীয়। রাজপ্রতিনিধি বহুগুণসম্পন্ন হইলেও সর্ব্বগুণসম্পন্ন নহেন। রাজকার্য্যের সর্ব্ববিভাগেই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিবে তাহা আশা করাও বিড়ম্বনা, সুতরাং এদেশে বহুদিন স্থায়ী স্ব স্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ উপেক্ষা করা রাজপ্রতিনিধির পক্ষে কোন দিনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। এবং ফলে তাহাই হয়। কিন্তু মন্ত্রিবর্গের অযথা স্বজাতি-প্রীতি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় এবং তাঁহারা অন্যান্য নীতি অপেক্ষা ভেদ ও দণ্ডনীতিতে অতিরিক্ত প্রাজ্ঞ হওয়ায় বিপরীত ফলই ফলে! সাধারণতঃ অনভিজ্ঞ, সদ্য আগত রাজপ্রতিনিধিগণ অন্ধের মত রাজকার্য্যের কর্ণ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন এবং চক্ষুষ্মান্ মন্ত্রিবর্গের মন্ত্রণামতে দক্ষিণে বা বামে, কোথায় যাইতেছেন তাহা না জানিয়া, রাজকার্য্যরূপ তরণী পরিচালন করেন। তিনি মন্ত্রিবর্গের ইঙ্গিতে যে স্থান অতলস্পর্শ সে স্থানে গুপ্ত চর এবং যে স্থানে আকাশ নির্ম্মেঘ সে স্থানে ঝড়ের আশঙ্কা করেন।

রাজ-প্রতিনিধির নিম্নে ক্ষুদ্র বৃহৎ পাত্র-মিত্র-সমন্বিত নানাভাগে

বিভক্ত, বিভাগীয় শাসনকর্ত্তাদের গভর্ণমেণ্ট। এই বিভাগের রাজকর্ম্মচারিগণ মুখে বলিয়া বেড়ান তাঁহারা ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের "মা বাপ।" তাঁহারা ভারতের উন্নতির জন্যই ভারত শাসন করিতেছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের এতই হিতাকাঙ্ক্ষী যে স্বাস্থ্যের পক্ষে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অনুপযুক্ত হইলেও স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, শরীর মন মাটি করিয়া, দীর্ঘ অতিদীর্ঘ দিন এই অধঃপতিত দেশের হিত-সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আর নিজ প্রশংসা নিজে গাহিয়া তাঁহারা বাহবাও কম লইতেছেন না। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহাদের উদারতা বা স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত যে কত বিরল তাহা সহজেই ধরা পড়ে। ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ভিসে এমন অনেক মহাত্মা ছিলেন ও আছেন যাঁহারা যথার্থই ভারতবর্ষের উপর স্নেহ-প্রণোদিত হইয়াই উহার মঙ্গলসাধনে বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু এরূপ মহামনা ব্যক্তির সংখ্যা এতই অল্প যে অঙ্গুলিতে তাঁহাদিগকে গণনা করা যায়। কিন্তু যে সমুদয় রাজকর্ম্মচারী এইরূপ উদারহৃদয় শাসনকর্ত্তাদিগকে ভারতপ্রীতির জন্য লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত করিয়াছেন তাঁহারাই যখন ঢক্কানিনাদে আপনাদিগকে ভারত-বৎসল বলিয়া বিঘোষিত করিতে উদ্যত হন, তখন নির্লজ্জতার তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়া প্রত্যেক হীমান ব্যক্তিই মরমে মরিয়া যান। এদেশীয় অধিকাংশ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী স্বার্থবুদ্ধি বা স্বজাতিবাৎসল্যবশে ভারতবর্ষের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ নহেন। এদেশীয় ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্পকলা লোপ করিয়া বা লোপ হইতে দেখিয়াও তাঁহারা তৎপরিরক্ষণে বদ্ধপরিকর হন নাই, কিন্তু স্বদেশীয় ব্যবসায়িগণের স্বার্থরক্ষার্থ যদি অন্যায় আইন, বা অবৈধ কর ধার্য্য করিতে হয় তবুও তাঁহারা তাহারই সমর্থনে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়েন। তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্নেহ করেন, ইহার মত অন্তঃসারশূন্য কথা সকলেই কেমন করিয়া বলেন তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। এদেশে বহুদিবস বাস করিয়াও অধিকাংশ

সিভিলিয়ান এদেশীয় ভাষায় কথা কহিতে পারেন না, দেশবাসিলোকের সহিত আলাপ-পরিচয়, মিল-মিশা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ও হীনতার পরিচায়ক। তিনি এদেশীয় রীতি-নীতি অথবা সামাজিক অবস্থা কিছুই অবগত নহেন। কেবল চাপ্‌রাসী, আরদালী, আমলা, বড় বাবুর সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয়ে তিনি জীবিত ভারতবর্ষকে ভাল বাসিতে পারেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না, তবে মৃত ভারতবর্ষ অর্থাৎ এদেশের মুরগী, মাটন, মোটা মাহিয়ানা তাঁহার যে নিতান্তই প্রিয় তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

সিভিলিয়ানগণের বিচারপদ্ধতিও উল্লেখযোগ্য। এই দরিদ্রদেশে বহু অর্থ ব্যয়েও আজকাল সুবিচার পাওয়া সুকঠিন। উভয় পক্ষে যে স্থানে দেশীয় সে স্থানে সুবিচার হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও শ্বেত ও কৃষ্ণ যেখানে পক্ষ সে স্থানে যে বিচার-বিভ্রাট হইবে ইহা নিঃসন্দেহ ও ভারতীয় বিচারালয়ে আজকাল স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই গৃহীত। এদেশে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকে হত্যা করিত তবে সামান্য দণ্ডে দণ্ডিত হইত, ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড কোন দিনই হইত না। এখন বিলাতী সভ্যতার কৃপায় আইন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিচার পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এখনকার শ্বেত ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত পক্ষে বিচারে অবধ্য ও অদণ্ড্য। কৃষ্ণকায় শূদ্রকে হত্যা করিলে শ্বেত ব্রাহ্মণের স্বজাতীয় চিকিৎসক "প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু" বলিয়া সার্টিফিকেট দেন এবং ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায় বিচারের সহায় শ্বেত জুরীগণ একবাক্যে "নির্দ্দোষ" বলিয়া বেকসুর খালাসের অভিমত প্রকাশ করেন। ইহাই হইল আধুনিক ব্রাহ্মণত্বের সম্মান-সংরক্ষণ, ইহাই হইল সভ্যতাভিমানী ভারত শাসনকর্ত্তাগণের সূক্ষ্ম তুলায় ওজন করা ন্যায় বিচার! পুরাতন হিন্দুর বিচার বর্ব্বরোচিত হইলেও ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অভিনয় হইত না, অন্তরে বাহিরে তাহার একই মূর্ত্তি লোক-নয়নের গোচর হইত। সভ্যতার নামে, ন্যায়ের নামে সেই বর্ব্বর

প্রথা এখনও চলিতেছে; কেবল তাহা একটা ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া আসিয়াছে মাত্র। তাহার মুখস তুলিয়া লও, দেখিবে অত্যাচার ও অবিচারের রক্ত রসনা এখনও লক্ লক্ করিতেছে।

বৃটিশ সিভিলিয়ানগণের অন্য গৌরব, তাঁহারা এই অশান্তির দেশে শান্তি স্থাপিত করিয়াছেন। অবশ্য ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কালে যে লোমহর্ষক অশান্তি দেশ ব্যাপিয়া নৃত্য করিতেছিল তাহা এখন নাই। দেশব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয় স্বীকার করিয়া লইলেও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে জাতির শান্তিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাহাদিগকে শান্ত করিতে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল? শান্তি লোকের স্বভাব না হইলে, বহুবিস্তৃত জেলায় একটি মাত্র ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ শান্তিরক্ষণের গর্ব্ব করিতে পারিতেন কি? কাজ অপেক্ষা আস্ফালন বেশী দেখিলে এ অবস্থায় দর্শকের হাস্য সম্বরণ কঠিন হইয়া পড়ে। লোকচরিত্র অজ্ঞাত থাকিয়া, চক্ষু মুদিয়া কাগজে দস্তখত করিয়া, ভোজে, নাচে, শিকারে, সেলামে অভিনন্দনে অভ্যর্থিত হইয়া সিভিলিয়ানগণ মনে করেন তাঁহারা এই পতিত দেশকে উদ্ধার করিতেছেন; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যায় তাঁহাদের কেরাণীগণ দেশের অভিজ্ঞতায় তাঁহাদের অনেক উচ্চে এবং প্রকৃত পক্ষে নিম্ন কর্ম্মচারিগণই নবাগত সিভিলিয়ানের রাজকার্য্যে শিক্ষক ও সকল প্রকার গুরুতর কার্য্যে ভারবাহী। নিম্ন কর্ম্মচারিগণই প্রায় সকল কাজ চালাইয়া লয়, সিভিলিয়ান শাসনকর্ত্তার কাজ কেবল মাসান্তে বিল করিয়া মোটা মাহিয়ানা বাহির করিয়া আনা। এ বিষয়ে তাঁহাদের মত সৌভাগ্যবান পৃথিবীতে আর কেহ আছে কি না সন্দেহ।

বিদেশীয় মূলধনের সাহায্যে রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতির সম্প্রসারণে, নীল-চা-প্রভৃতির আবাদে, কয়লা-স্বর্ণ-খনি প্রভৃতি কার্য্যে দেশের কিছু

উপকার হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু উহা কেবলই মুজুরের লাভ। ভারতবর্ষীয় মুজুর যদি শস্তা না হইত তবে ঐ লাভ টুকুও এ দেশের লোকের ভাগ্যে জুটিত না নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। বৃটিশ পোতে দেশীয় লস্কর নিয়োগের তুমুল আন্দোলনে উহার কিঞ্চিৎ আভাস না পাওয়া গিয়াছে এমন নয়।

ভারতীয় প্রজার স্বার্থহানি করার হেতুতে ব্রহ্মরাজ থিব রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া মনে হয় ভারত-গভর্ণমেণ্ট প্রজার অনিষ্ট নিবারণে ও সংরক্ষণ বিশেষ যত্নশীল। কিন্তু চিত্রের অন্য পার্শ্ব দর্শন করুন, বিভিন্ন দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় যে সমুদয় ভারতবাসী আছে তাহাদের উপর তথাকার শ্বেত অধিবাসীর অত্যাচার ও অবিচারের কথা স্মরণ করুন। সত্য বটে ভারত গভর্ণমেণ্টের উপনিবেশ সমূহের উপর কোন ক্ষমতা নাই কিন্তু ইংলণ্ডস্থ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরও কি সে ক্ষমতা নাই! ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গ্রেট্‌ব্রিটেন এই কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালনে কোন যত্ন করেন নাই। তিনি উপযুক্ত পুত্রের উপর ক্ষমতা প্রসারণে ভীত হইয়া, শিশু পোষ্য পুত্রের কাতর ক্রন্দনে বধির হইয়া আছেন। ইহা মাতার ধর্ম্ম নহে, বিমাতার হৃদয়হীন আচরণ!

পূর্ব্বে এদেশে রাজা ছিলেন ধর্ম্মের অধীন। ধর্ম্মগুরু ব্রাহ্মণের প্রবল প্রতাপে তিনি স্বেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ পান নাই। ব্রাহ্মণ ছিলেন আইন-প্রণেতা, রাজা ব্রাহ্মণের সাহায্যে সেই আইনের প্রচলন কর্ত্তা ছিলেন মাত্র। এখনও রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি নিজে আইন কর্ত্তা এমন বলা যায় না, তবে তাঁহারা প্রণীত আইন প্রচলিত করিবার মতদাতা। এখন বাণিজ্য-প্রাণ রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় বণিকেরাই প্রকৃত পক্ষে আইনকর্ত্তা, সুতরাং বণিকের কথা রাজা বা প্রতিনিধি শুনিতে বাধ্য। ইংলণ্ডের ধন, সম্পত্তি, সম্মান প্রতিপত্তি সবই বাণিজ্যের

সাহায্যে, এই যে বৃহৎ সাম্রাজ্য ইহার মূলেও বাণিজ্য। ইংলণ্ডকে বাণিজ্য উপেক্ষা করিলে চলে না, সুতরাং সেকালের ব্রাহ্মণের স্থানে এখন বণিক উপবিষ্ট। বণিক যাহা করিতে চায় পার্লামেণ্ট তাহাই করে। মাঞ্চেষ্টর, লিভারপুল, বারমিংহাম ক্ষেপিলে ইংলণ্ডে হুল স্থূল পড়িয়া যায়, রাজা মনে প্রমাদ গণেন। সেই আদর্শ এদেশেও অনুকৃত হইয়াছে। চাকরেরা যাহা বলিতেছে, বণিকসমিতি যাহা চাহিতেছে, তাহাতেই আশুতোষ ভারতগভর্ণমেণ্ট "তথাস্তু" বলিতেছেন।

এদেশে সিভিলিয়ান আসে পেটের জ্বালায়, বণিক আসে ধনের লোভে, সৈন্য আসে যুদ্ধ শিখিতে, আর লর্ড, মারকুইস্, ডিউকেরা আসেন শিকার করিতে। সকলেই নিজ লইয়া ব্যস্ত, কেবল মুখে বলেন "তোমাদের জন্যই আমরা," কিন্তু প্রকৃত কথা "আমারাই তাঁহাদের জন্য।" গাভী দোহন করিতে হইলে যেমন বৎসের প্রয়োজন ভারতদোহনেও ভারত সন্তান আমরা তেমনি বৎস। আর তাঁহারা পাকা গোয়ালা, যতটা পারেন দুগ্ধ দোহন করিয়া লন। দোহন-সৌকর্য্যার্থে আমাদের মাতৃস্তনে আমাদিগকে দুএকবার মুখ দিতে দেন মাত্র। আমরা হইলাম দোহার সহায়, ভোক্তা হইলেন তাঁহারা। এ যেন সেই পৌরাণিক সমুদ্র-মন্থন, তাঁহারা সুর, আমরা অসুর! আমরা বাসুকীর নিশ্বাসরূপ দুর্ভিক্ষ জর্জ্জরিত, আর তাঁহারা অচঞ্চলা লক্ষ্মী লাভে উৎফুল্ল!

শ্বেত কৃষ্ণে, শাসক ও শাসিতে যে সংঘর্ষ ও মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছে তাহা রাজাপ্রজা উভয়ের পক্ষেই অকল্যাণকর। আর সমুদয় জাতি যখন অত্যাচারিত হইতেছে মনে করে, তখন অত্যাচার যে কোন না কোনরূপে বর্ত্তমান তাহা অস্বীকার করা যায় না। এরূপ স্থলে শাসনকর্ত্তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যাহাতে অন্যায় দূরে পলায়ন করে তাহার ব্যবস্থা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। শাসন শাসিতের মিলন

সংঘটনে উভয়পক্ষীয় মৌখিক প্রেম-সম্ভাষণ যে অতীব অকিঞ্চিৎকর তাহা বলিয়া না দিলেও চলে। এখানে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে। প্রজার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া, তাহার অভাব, আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে তাহার মঙ্গল হয় তাহাই পালন করা রাজ-ধর্ম্ম। অন্তত হিন্দুরাজার ইহাই ধর্ম্ম ছিল।

মনু বলিয়াছেন :—

"মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাদ্ ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ॥"

মোহবশতঃ বিচার না করিয়া যে রাজা স্বীয় রাজ্যকে কর্ষিত করে সেই রাজা সবান্ধবে অতি শীঘ্র জীবন ও রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়।

যখন ইংরাজরাজত্ব এদেশে স্থাপিত হইয়াছিল তখনকার অবস্থায় ও এখনকার অবস্থায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। তখন লোকে নিজের ক্ষমতা টের পায় নাই, নিজের কথা খুলিয়া বলিতে সাহস করে নাই, তখন ইংরেজের আইন, ইংরেজের বিচারপ্রণালী সকলই তাহার নিকট নূতন ছিল। এখন ইংরেজরাজের কৃপায় ভারতীয় প্রজার চক্ষু ফুটিয়াছে, এখন তাহাকে ছেলের মত খেলনা দিয়া ভুলাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা এবং তাহাকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য পদে পদে খোঁড়া করিয়া রাখা নিতান্তই নিষ্ঠুরতা! যাহাতে সে এখন জগতের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইতে পারে, সভ্য গভর্ণমেণ্টের তদপেক্ষা আর কি কর্ত্তব্য হইতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেন।

কাব্য-গ্রন্থ।*

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—সুশিক্ষিত ও গভীর চিন্তাশীল সম্পাদক প্রফেসর শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র সেন এম. এ. মহাশয় এই কাব্যগ্রন্থের যে উৎকৃষ্ট ভূমিকা লিখিয়াছেন, রবীন্দ্র বাবুর কাব্য বুঝিবার পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আমরা রবীন্দ্র বাবুর কাব্য-গ্রন্থের শিশুখণ্ড হইতে একটি নূতন কবিতা ও এই ভূমিকা আমাদের সমালোচনীর পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি।

অপযশ।

বাছারে, তোর চক্ষে কেন জল?
কে তোরে যে কি বলেছে
আমায় খুলে বল্!
লিখ্‌তে গিয়ে হাতে মুখে
মেখেছ সব কালী,
নোংরা বলে তাই দিয়েছে গালি!
ছি ছি উচিত একি!
পূর্ণশশী মাখে মসী—
নোংরা বলুক্ দেখি!

* মূল্য দশটাকা, ২০শে ফাল্গুনের পূর্ব্বে লইলে ৬॥০ টাকা। ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য॥

বাছারে, তোর সবাই ধরে দোষ !
আমি দেখি সকল-তা'তে
এদের অসন্তোষ !
খেল্‌তে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে !
তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে !
ছি ছি কেমনধারা !
ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে
সে কি লক্ষ্মীছাড়া !

কান দিওনা তোমায় কে কি বলে !
তোমার নামে অপবাদ যে
ক্রমেই বেড়ে চলে !
মিষ্টি তুমি ভালবাস
তাই কি ঘরে পরে
লোভী বলে' তোমার নিন্দে করে !
ছি ছি হবে কি !
তোমায় যারা ভালবাসে
তারা তবে কি !

ভূমিকা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য-গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ ১৩০৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৩ সালের পর কণিকা, কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা ও নৈবেদ্য এই কয়টি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং এতদতিরিক্ত অনেকগুলি কবিতা বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর সমুদয় কবিতাগুলি একত্রে পাইবার ইচ্ছা তাঁহার পাঠকগণের স্বাভাবিক এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল !

এই সংস্করণে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কতকগুলি কবিতা বাদ গিয়াছে এবং যেগুলি ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্য্যে মনোহর ও মর্ম্মস্পর্শী সেগুলিকে রক্ষা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। আদর্শ কবিতার লক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য হইলেও এরূপ কবিতা চিনিয়া লওয়া যে খুব শক্ত তাহা বোধ হয় না। যাহা যথার্থ কবিতা, দিব্য কল্পনা যাহাকে জন্ম দিয়াছে, অকৃত্রিম ছন্দঃসৌন্দর্য্য তাহাকে বাহিরে ভূষিত করে এবং ভাবের গভীরতা

তাহাকে অন্তরে পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। তাহার আনন্দ কল্যাণকে আবাহণ করে এবং সৌন্দর্য্যে তাহা জগতের নিত্য-সুন্দর অনির্ব্বচনীয় পদার্থসমূহের সমতুল হয়। সাধারণভাবে সংক্ষেপ সঙ্কেতস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, যে কবিতা অনির্ব্বচনীয়তায় সঙ্গীতের যত সদৃশ এবং যে কবিতায় পাঠক মানব-জীবনের প্রসারতা যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ। যিনি কথার সাহায্যে একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যিনি শুধু চিত্রাঙ্কণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার ছন্দের মর্ম্মে মর্ম্মে সঙ্গীতের অপূর্ব্ব অপরূপ ঝঙ্কারগুলি আনিতে পারেন। যিনি জীবনের একটি সামান্যতম সত্যকে পরিস্ফুট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যাঁহার কবিতায় সমগ্র জীবনের সুগম্ভীর বিজয়গীতি শ্রুত হয়। যিনি সত্য ও ছন্দের সাহায্যে পাঠকের মনে আনন্দ সৃজন করেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যাঁহার নিজের আনন্দ এত স্বাভাবিক ও যথেষ্ট যে পাঠক কণামাত্র আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পারেন, আমি আগন্তুকমাত্র, আমার অপেক্ষা কবির নয়ন অশ্রুতে অধিক সমাকীর্ণ, আমার অপেক্ষা কবির হাস্য আনন্দে অধিক উদ্ভাসিত।

এই খানেই রবীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব। ছন্দ ও ভাবসৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ কবিতা তিনি এত রচনা করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ তাঁহার কাছে

অশেষ ঋণে ঋণী। এই সকল কবিতা তাঁহার পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত। শারদ প্রাতে, চৈত্র রজনীতে অথবা "ঘনঘোর বরষায়," একাকী বা বন্ধুসনে, ইহাদের লইয়া অনেকেই আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন এবং "কখনও সুখে, কখনও দুখে," কখনও আশায়, নৈরাশ্যে, আশঙ্কায়, সংকল্পে, ব্যথায়, উচ্ছ্বাসে, হৃদয়ের সহিত ইহারা যথার্থ আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছে। তবু শঙ্কা হয় যে, কবি সাধারণের নিকট গানের দ্বারা যত পরিচিত, কবিতার দ্বারা তত নন্। এ আশঙ্কা সত্যমূলক হইলে বাস্তবিক দুঃখের কারণ। যাঁহার কবিতা এই দেশের ও সময়ের উপযোগী একটি সুমহান্ সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, সর্ব্ববিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ দিব্য কল্পনা যাঁহার কবিতাকে বরণ করিয়াছে, যিনি আমাদের আধুনিক জটিল, কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনসমস্যার উপর নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাকে যথার্থভাবে গ্রহণ না করিয়া আমাদের দেশ শুধু নিজের হতভাগ্যতারই পরিচয় দিয়াছে।

রবীন্দ্রবাবুর কবিতা বুঝিতে গেলে কোন কোন পাঠকের পক্ষে কোনও অন্তরায় থাকা সম্ভব, কিন্তু আশা করি তাহা অচিরে দূর হইবে। বর্ত্তমান সংস্করণ তাঁহাদিগকে দুই একটি বিষয়ে সাহায্য করিলেও করিতে পারে। এই সংস্করণে রবীন্দ্রবাবুর কতকগুলি কবিতা এবং কোনও কোনও কবিতার কতক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। পত্রবাহুল্য কখনও কখনও পুষ্পকে পূর্ণসৌন্দর্য্যে

প্রকাশিত হইতে দেয় না এবং পুষ্পিত স্তবকে সকল পুষ্পই কিছু সমানভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। বাদ দিয়াও যে কবিতা কয়টি অবশিষ্ট রহিল তাহাদের সংখ্যা ও বিষয়বৈচিত্র্য উভয়ই পাঠকের বিস্ময়ের কারণ হইবে সন্দেহ নাই। বিষয়গুণে যে সকল কবিতা পরস্পর সদৃশ সে গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতর একত্র করা হইয়াছে।

পাঠকের সুবিধার্থে এখানে শ্রেণী কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

১ম ভাগ। যাত্রা, হৃদয়ারণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব, সোনার তরী, লোকালয়।

২য় ভাগ। নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক, যৌবনস্বপ্ন, প্রেম।

৩য় ভাগ। কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য, সংকল্প, স্বদেশ।

৪র্থ ভাগ। রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা।

৫ম ভাগ। মরণ, জীবনদেবতা, নৈবেদ্য।

৬ষ্ঠ ভাগ। শিশু।

৭ম ভাগ। গান।

৮ম ভাগ। নাট্য।

এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে হয়। সকলেই জানেন কবিতা শ্রেণীভুক্ত করা কত কঠিন। সুন্দর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া মনে যে ভাববৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, তাহা সান্ধ্য গগনে বিকশিত বর্ণবৈচিত্র্যের ন্যায়; কোন্ ভাব বা কোন্ বর্ণ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। ভাবের ছন্দোময়

প্রকাশ অর্থাৎ কবিতা সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে। বিশেষতঃ রবীন্দ্র বাবুর কবিতা সম্বন্ধে এ কথা বড় খাটে। তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম, তাহার ভিতর বানানো কিছুই নাই, কোন একটি ভাবকে খাড়া করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে রং ফলানো নাই, কোন একটি মর‍্যাল বা নৈতিকবিধি শিক্ষা দিবার সজ্ঞান চেষ্টাও নাই। তাঁহার অনেকগুলি কবিতা দেবনিশ্বসিতের ন্যায় অহৈতুকী, "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" উঠিয়াছে। বুদ্ধি দ্বারা তাহাদের অর্থ ছাঁকিয়া বাহির করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। সোনার তরীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে? হৃদয়-যমুনায় কাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে? এ সব প্রশ্ন আমরা বৃথা জিজ্ঞাসা করি। অথচ এই দুইটি কবিতাতে হৃদয়ের যে ভাবটি প্রকাশিত তাহা কত পরিষ্কার, যে বেদনা ধ্বনিত হইয়াছে তাহা কত সুস্পষ্ট! কবি যে ভাবময়ী মূর্ত্তিটি সৃজন করিয়াছেন আমরা বিস্মিত ব্যথিত হৃদয়ে তাহার দিকে চাহিয়া থাকি এবং তাহার ভাষার সহিত আমাদের হৃদয়ের ভাষা মিশিয়া যায়। কিন্তু তাহার কি নাম দিব? কোন্ শ্রেণীতে তাহাকে রাখিব? সহজে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারি না।

এইরূপ কতিপয় কবিতাকে একত্র করিয়া "সোনার তরী" নাম দেওয়া হইয়াছে। সে গুলির সাধারণ লক্ষণ দুইচারিটি কথায় বলিতে চেষ্টা করিব। রবীন্দ্রবাবুর পাঠক মাত্রেই জানেন তাঁহার প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ কত গভীর, তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে

কিরূপ মুগ্ধ। এ সম্বন্ধে তিনি একটি অপ্রকাশিত চিঠিতে লিখিয়াছেন * "আমি অনেক বার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায় সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে'—এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণ লতা তরু গুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ু প্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্ত্তন, এই ঋতু চক্র, এই অনন্ত আকাশপূর্ণ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্য্যায়, এ সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে—সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, এই ছন্দের যেখানে যতি পড়ছে যেখানে ঝঙ্কার উঠছে, সেই খানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে—প্রকৃতির সমস্ত অণু পরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে সৌন্দর্য্যে এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান না থাকৃত, তা'হলে কখনই এই বাহ্য জগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘট্‌ত না। যাকে আমরা অন্যায় পূর্ব্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে, নইলে কখনই নির্জীবের প্রতি জীবের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য্য ভালবাসার বন্ধন থাকৃতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের

* ২৩এ আগষ্ট, ১৮৯৫।

ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোন জাতিভেদ নেই, সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি, নইলে আমাদের উভয়ের জন্য দুই ভিন্ন জগত সৃজিত হয়ে উঠ্‌ত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হবে না, আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি; আমার আর কোন যুক্তি নাই।"

প্রকৃতির প্রতি কবির অনুরাগ কত গভীর এবং তাহার আত্মীয়তাসুখে তিনি কত সুখী, তাঁহার কাব্য হইতে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। মাকে মা বলিয়া সন্তান যেমন সার্থক হয়, প্রকৃতিকে সুন্দর বলিয়া কবি তেমনি আপনার কবিতাকে সার্থক করিয়াছেন। আমরা "বিশ্ব" খণ্ডের কবিতাগুলিতে কোনও কোনও সুন্দর বস্তুবর্ণনায় এই সার্থকতা দেখিতে পাই। কিন্তু অনির্ব্বচনীয়কে কে বর্ণনা করিবে? এই আলো-আঁধারের স্পন্দনের সহিত কত ভাব কত সঙ্কেতই হৃদয়ের উপর দিয়া ভাসিয়া যায় তাহাদিগকে কে ধরিয়া রাখিবে? তাহাদিগের মর্ম্ম কিসে পরিস্ফুট হইবে?

আমাদের হাতে শুধু একটি মাত্র জাল আছে যাহাতে প্রকৃতির এই অনির্ব্বচনীয় ক্ষিপ্রগতি ক্ষণিক ভাবগুলিকে ধরিয়া রাখা যায়, তাহা সঙ্গীত। বাস্তবিক ভাষাহীন সঙ্গীতের সুরের ভিতরে কি একটি বেদনা, আনন্দ, আকুলতা বা শান্তি নিহিত থাকে যাহার

কাছে বিশ্বের চঞ্চল শোভা ও সৌন্দর্য্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিশ্চল হইয়া যায় এবং সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু এই নির্ব্বাক সঙ্গীতকে ভাষায় যিনি ব্যক্ত করিতে পারেন. তাঁহাকেই প্রকৃত কবি বলিয়া স্বীকার করি এবং সোনারতরী প্রভৃতি কবিতার যদি কোন অর্থ বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে তাহা এই যে, ঘন বর্ষা, ভরানদী, সঞ্চিত ধান, দ্রুত বহমান তরী প্রাণে যে আকুলতা সঞ্চার করে তাহার সহিত মানব হৃদয়ের একটি অতি চিরন্তন ও গভীর বেদনা মিলিত হইয়া একটি অপূর্ব্ব রাগিণী সৃজন করিয়াছে, যে রাগিণীকে একটি চিত্রে অথবা অবস্থাবিন্যাসে পরিণত করা হইয়াছে। "সোনার তরী" শীর্ষক কবিতাগুলির ইহাই বিশেষত্ব।

"লীলা" খণ্ডের কবিতাগুলির ভিতর পাঠক একটি বিশেষ মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রেমের যে সুখ বা দুঃখ তাহার এমন-একটি গাম্ভীর্য্য আছে যে তাহা লইয়া লীলা কৌতুক চলে না। কিন্তু লৌকিক প্রেম অনেক সময় প্রেমের ছায়া মাত্র। কল্পনা করিতে পারি যে এই অবাস্তব ছায়া যথার্থ প্রেমের নিকট তিরস্কারভাজন না হইয়া কৌতুকভাজন হইয়াছে এবং তাহার কৌতুকমিশ্রিত কটাক্ষ দ্বারা লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কৌতুক হাস্যেই লীলার কবিতাগুলি দীপ্তিমান। তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতর গভীর অর্থ লুক্কায়িত আছে। কিন্তু—

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই,
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি তাই
আপন ব্যথাটাই।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"ভালবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সঙ্গতকে নহে অসঙ্গতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দরমুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালবাসার ধনকে ভালবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেই জন্য সত্যকে সত্য-কথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়, তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। প্রেমলীলার এই অঙ্গটি এই গ্রন্থাবলীর লীলাখণ্ডে পাঠকেরা পাইবেন। ইহা ছাড়া লীলার মধ্যে আর একটি জিনিষ আছে তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আপনাকে বিরূপ মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতেছে।

"মাতাল" যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমান বলে আমি সমাজসঙ্গত ভব্যতার ধার ধরি না—বিদ্রোহী প্রেম বলে আমি ক্ষণকালের খেলা মাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না,—একান্ত বেদনাকে স্পর্দ্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।"

আর একটি শ্রেণী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেটির নাম "জীবনদেবতা"। এই জীবনদেবতা কে? কাহাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম!

কাহাকে লইয়া তিনি মিলন-উৎসবে মগ্ন এবং কে তাঁহার মুখের ভাষা কাড়িয়া কথা কহিয়াছেন—"মিলায়ে আপন সুরে"? ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই এই জীবনদেবতার সহিত বিশ্বদেবতার সৌসাদৃশ্য কল্পনা করিবেন। কিন্তু ইঁহাকে বিশ্বদেব বলিলে কবির আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভোগের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। আমার মনে হয় ফুলফলভারে অবনত কোনও তরু নিজের অন্তর্যামী

প্রাণকে সম্বোধন করিয়া কবির ন্যায় প্রশ্ন করিতে পারে—"আমাতে কি এখন তুমি সার্থক হইয়াছ?" এই প্রাণ অনন্ত প্রাণ নহে ইহা শুধু এই বৃক্ষটিতেই আবদ্ধ। কিন্তু প্রথম হইতে ইহাই বৃক্ষকে অধিকার করিয়াছে এবং ক্রমশঃ পত্রপুষ্প-পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া তাহাকে নৈপুণ্যসহকারে গঠিত করিয়া সার্থকতা দিয়াছে। মানব জীবনও এইরূপ দুই ভাগে বিশ্লিষ্ট করা যায়। রবীন্দ্রবাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন "আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া একটি বৃদ্ধি অনুভব করিতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি মাঝে মাঝে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের ক্ষণিক জীবন যে সুখ দুঃখ ভোগ করে, আমাদের চিরজীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে।"* এই যে দুইটি জীবন ইহার ভিতর কবি প্রণয় কল্পনা করিয়াছেন। একজন সুনিপুণা গৃহিণীর ন্যায় অন্তঃপুরবাসিনী, আর একজন তাঁহার যত কিছু দৈনিক সুখ দুঃখ, সত্য মিথ্যা ধারণা চিন্তা ও ভাব জড় করিয়া আনিতেছেন, অন্তর্যামী প্রকৃতি তাহারি ভিতর হইতে উৎকৃষ্ট এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উপাদান সকল গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু যদিও ইনি গৃহিণী তবু ইঁহার সহিত কবির যথেষ্ট পরিচয় এখনও হয় নাই। তিনি কতকটা মূঢ়ভাবে ইঁহার অধীন। তাই

* অপ্রকাশিত চিঠি—২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

যখন ইঁহার রাগিণী তাঁহার কবিতায় ধ্বনিত হয়, তিনি অবাক্ হইয়া শুনিতে থাকেন। * সে পরিচয় যে আছে তাহা কি করিয়া বলা যায়? ইনি কত সুন্দর তাহা কি কবি জানেন? ইঁহার বাণীর গভীর অর্থ তিনি কি পরিমাণ করিয়াছেন? ইঁহার আনন্দের উচ্চশিখরে তিনি কি আরোহণ করিয়াছেন? কত যুগযুগান্তর লোকলোকান্তর হইতে ইনি কত বর্ণ ও শব্দ, ভাব ও ভাষা, সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, এবং কত বস্তুর সহিত কি প্রগাঢ় আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন, কবি তাহাত বলিতে পারেন না। †

* আজ কাল আমার কবিতার প্রশংসা শুনলে আমার মনে সে রকম একটা পুলক সঞ্চার হয় না। আসল তার কারণ, যে-আমাকে লোকে প্রশংসা করছে, সেই-আমিই যে কবিতা লিখে থাকি, এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমি জানি যে সমস্ত ভাল কবিতা আমি লিখেছি, সে আমি ইচ্ছা করলেই লিখতে পারিনে—তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও শত চেষ্টায় সে লাইন গড়িতে পারি কি না সন্দেহ।"—অপ্রকাশিত চিঠি, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫।

† এই যে যুগযুগান্তর লোকলোকান্তর হইতে বহমান অনুভূতি ইহা মিথ্যা কল্পনা নহে, সুদৃঢ় সত্যে প্রতিষ্ঠিত। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে, যদি স্থান ও কালের ধারণা আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিত, তা হ'লে আমরা কি তাহাদের বিশালত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম? জানি না কোন্ ভূমা প্রজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া এই ক্ষুদ্র পুষ্পের চারিদিকে অসীম স্থান দেখিতেছি এবং বুঝিতে পারিতেছি যে, অনাদি অতীত তাহার সমস্ত শুশ্রূষা দ্বারা পুষ্পটিকে বিকশিত করিয়াছে এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ তাহাকে কোনও না কোনও আকারে

তিনি শুধু জানেন যে সময়ে সময়ে আশাতীত সৌভাগ্যের ন্যায় তাঁহার চিত্তে তাঁহার জীবনদেবতার সৌন্দর্য্য প্লাবিত হয় এবং তিনিই বিচিত্ররূপিণী হইয়া তাঁহাকে "সুখের ব্যথায়" উদ্ভ্রান্ত করেন। তাঁহাকে তিনি "শত জনমের চির সফলতা" বলিয়াছেন এবং তাঁহারি সহিত অচ্ছেদ্য মিলন কামনা করিয়াছেন।

"গান" ও "শিশু" খণ্ডে কতকগুলি অন্যান্য খণ্ডে প্রকাশিত কবিতা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠক সহজেই ইহার কারণ বুঝিতে পারিবেন।

রবীন্দ্রবাবুর কবিতা সম্বন্ধে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেটি তাঁহার সমুদয় কবিতার অন্তরের কথা এবং সেটি ভারতবর্ষেরও কথা। ভারতবর্ষের সাধনা কি? শান্তং শিবমদ্বৈতং। ভারতবর্ষই বলিয়াছেন,—"যোবৈভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রবাবু যে বিষয়েরই অবতারণা করেন, তাঁহার প্রয়োগ-কৌশলে তাহা আপনার সামান্যতা পরিহার করিয়া সেই ভূমানন্দের অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে প্রকাশিত

রক্ষা করিবে। সৌন্দর্য্য-অনুভবও এইরূপেই হয়। শুক্ তারার জ্যোতি আমাদের মনে ক্ষণিক সুখসঞ্চার করে বলিয়া তাহাকে সুন্দর বলি না, কিন্তু যুগযুগান্তরব্যাপী চিরন্তন মানবহৃদয়কে উহা সংক্ষুব্ধ, আকুলিত বা আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছে বলিয়া উহা সুন্দর। আমরা যখন উহার সৌন্দর্য্য অনুভব করি, বিশাল গভীর মানবহৃদয় আমাদের সহিত সায় দেয় এবং তাহার স্পন্দনগুলি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে।

হয়। ইহা সামান্য কথা নহে। কারণ দেখিতে পাই আনন্দকে আনন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন করা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যসুখকে উচ্চতর সুখের বিদ্রোহী করিয়া চিত্রিত করা, প্রতিযোগিতা বিষে কলুষিত করিয়া আনন্দকে কেবলমাত্র একটি জাতি বা দেশের উপভোগ্য করা, সৌন্দর্য্যকে সীমাবদ্ধ করিয়া সৌখীন ক্ষুদ্রতা সৃজন করা, ইত্যাদি আজ কালকার অবনতিশীল (বিশেষতঃ ইউরোপীয়) আর্টের একটা খেয়াল দাঁড়াইয়া গেছে। আমাদের কবি তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের শিক্ষা আমরা শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতা, মঙ্গল এবং যে আনন্দ চিরন্তন, গভীর ও সার্ব্বজনীন তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারি না। এমন কেহই নাই যিনি তাঁহার কবিতার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর্দ্রচিত্ত, শান্ত, শ্রদ্ধান্বিত ও আনন্দিত হন নাই।

এই যে অদ্বৈতানন্দস্পৃহা তাঁহার কবিতাতে দেখিতে পাই ইহা তাঁহাকে বারম্বার এক আদর্শ লোকে উন্নত করিয়াছে এবং তথাকার সংবাদ দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "প্রতিধ্বনি" ও "উর্ব্বশী" দুইটি কবিতার উল্লেখ করি। প্রথমটিতে দেখিতে পাই সমুদয় সুন্দর বস্তু অনন্ত আদর্শ সৌন্দর্য্যের প্রতিধ্বনি বা প্রতিবিম্ব বলিয়া সুন্দর হইয়াছে। দ্বিতীয়টি নারী প্রকৃতিকে তাহার সমুদয় মানবীয় সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপটি দেখাইয়াছে। এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। গল্পে পড়িয়াছিলাম যে এক ব্যক্তি জ্যোতিষ্ক দেখাইতে বর্ত্তিকার সাহায্য লইয়াছিল। এই ভূমিকা লিখিবার সময়ে উক্ত ব্যক্তির সহিত সাদৃশ্য অনুভব করিয়া লজ্জিত ছিলাম। যাহা হউক বর্ত্তমান সংস্করণ কোনও পাঠকের নিকট রবীন্দ্রবাবুর কবিতার অর্থকে সুগম করিলে কৃতার্থ হইব।

—০—

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ১৩১০। { ৯ম সংখ্যা।

কবির প্রভাব।

কোন একটী জাতির উপর কবির প্রভাব সুপরিচিত। কিন্তু সে প্রভাব অতি স্নিগ্ধ, অতি মধুর এবং নীরবে কার্য্য করে।

যে রবিকরবর্ণাভা সুবর্ণোজ্জ্বল আলোকমালা চরাচর উদ্ভাসিত করে তাহার কার্য্য সুস্পষ্ট এবং চক্ষুরুন্মীলনমাত্র আমরা তাহা বুঝিতে পারি। সে আমাদিগকে আলোক, তাপ এবং জীবনী শক্তি প্রদান করে, এত আলোক, এত তেজ, ইহা আর অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু হিমাংশুর শীত রশ্মিতে যখন চরাচর স্নাত হয়, তখন মনে হয় ইহা কেবলই সৌন্দর্য্য, ইহা কেবলই মাধুর্য্য, ইহার আর অন্য কোনও কার্য্য নাই!

কিন্তু সে কি ক্ষুধিত, তৃষিত রুধিরাক্ত সংসারের হৃদয়ে শান্তির অমৃতধারা, সুপ্তির স্নিগ্ধ শীতল ছায়া, আনন্দের অপূর্ব্ব পুলক এবং সৌন্দর্য্যের কনক কিরণ আনয়ন করে না? সে কি লতা-জটিল-শ্যাম-কুঞ্জে কুসুমকে বিকশিত এবং চরাচরের পরিম্লান মুখশ্রীকে প্রফুল্ল করে না? এবং মান অভিমান, প্রেম মিলন, বিরহ প্রভৃতি জীবনের ভাব-জটিল ব্যাপারগুলাও যে এই জ্যোৎস্নার সাহায্যে অনেকটা সহজ

হইয়া আসিয়াছে—ইতিহাসে এমন উদাহরণও বিরল নহে! এমনি রাত্রে নীরবে বেলমণ্টের পথে পলায়নপর জেসিকা ও লরেনজোর কথা মনে করো, এমনি জ্যোৎস্নারাত্রে রোমিও ও জুলিয়েটের কি মধুর প্রেমসম্ভাষণ, এমনি রাত্রে প্রতাপ ও শৈবলিনীর সেই জ্যোৎস্না-স্নাত অগাধ জলে সাঁতার, আর আচ্ছোদ-সরোবরতীরে মহাশ্বেতার প্রেম-অভিসারে গমন! কিন্তু সে বড় নীরবে কার্য্য করে, সে যে সাগরবক্ষে অত বড় একটা জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে তাহাও কত নীরবে!

কবির প্রভাবও তেমনি অতি নীরবে কার্য্য করে। অথচ সহস্র সংস্কারক, বহু বিজ্ঞ দার্শনিকের চেষ্টা যেখানে ব্যর্থ হইয়া গেছে, কবির সুন্দর কল্পনা, অসাধারণ কবিত্ব এবং মনোমোহন আদর্শ চিত্র যে সেখানে অত্যন্ত সফল হইয়াছে এমন উদাহরণও পাওয়া যায়।

তাহা ছাড়া স্মার্ত্ত গভীর গবেষণায় ও নৈয়ায়িক বিস্তর তর্কজাল সৃষ্টি করিয়া যে নীতি ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন, সমস্ত জনসঙ্ঘের মধ্যে জনকতক তাহা আয়ত্ত করিয়া আত্মোৎকর্ষ করিতে পারে মাত্র, কিন্তু কবি সমস্ত মানব-হৃদয়ের উপর নিজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ, কবি ভাবের ভিতর দিয়া যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়া যান তাহা নিত্য, কিন্তু জ্ঞানাভিমানী অপরিণত ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ভিতর দিয়া যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়া যান তাহা চিরপরিবর্ত্তনশীল এবং অনিত্য, সুতরাং তাহা চিরদিন মানব-মনকে অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ, শুষ্ক সত্য ও কঠোর নীতি বাক্য অপেক্ষা, সরস চিত্র ও সুমধুর সঙ্গীত যে মানব হৃদয়কে অতিমাত্রায় আকর্ষণ করে ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং দার্শনিক ও নীতিতত্ত্ববিৎ সংস্কারক অপেক্ষা অত্যন্ত সহজে ও সুন্দর ভাবে কবি মানবচরিত্র গঠিত করেন এবং সে কার্য্য সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন এবং নিত্যকালস্থায়ী।

জাতীয় চরিত্রে কবিপ্রভাবের উদাহরণ স্বরূপ ফরাসীয় রাষ্ট্র বিপ্লবে ভল্টেয়ার, লামার্টাইন, হিউগো প্রভৃতি সাম্যবাদী কবিদের প্রভাব, এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডীয় কবিবর্গ জাতীয় চরিত্র উন্নীত এবং লোকশিক্ষায় কতটা সহায়তা করিয়াছিল তাহা উল্লেখ করিতে পারি; জার্ম্মান জাতির উপর গেটের প্রভাব, প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় জাতীয় চরিত্রে কবি এবং কাব্যের প্রভাবও সর্ব্বজনবিদিত।

এই কবিপ্রভাবের উদাহরণের জন্য আমাদের দূরদেশে যাইতে হইবে না।

দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের অবনতি প্রায় চরম দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল—আচারহীন, প্রাণহীন ধর্ম্ম যখন বৃথা আড়ম্বর ও মিথ্যাচারের মধ্যে আত্মলোপ করিতেছিল এবং তান্ত্রিকগণের তামসিক আচরণ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছিল,—জড়, চরিত্রহীন, জীবনের লক্ষ্যপথশূন্য, ভাবহীনহৃদয়, দুষ্কৃতি-কঠোর জনগণের জন্য বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যামৃত যে তখন সমস্ত জাতির মধ্যে ভক্তি ও প্রেমের ভাব বিকশিত করিয়া তাহাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল ইহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তার পর সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন, জড়ভাবাপন্ন নির্জ্জীবিত জাতি পুনরায় যখন ইংরাজরাজ্য-অভ্যুদয়ে পাশ্চাত্যসভ্যতাবিচ্ছুরিত কিরণমালা দেখিল এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল; যাহা কিছু পাশ্চাত্য সভ্যতা আনীত তাহাই সুন্দর, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল, তখনই কবিরা তাহাদিগকে তাহাদিগের ভ্রম দেখাইয়া কখনও করুণ সহানুভূতি, কখনও আদর্শচিত্র ও চরিত্র কখনও গভীর ভাবোচ্ছ্বাসে সত্যের পথে অনুদিন পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ৺ঈশ্বর গুপ্তের খাঁটী দেশীয় ভাবের কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্র-

নাথে পর্য্যন্ত আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কথাটা বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইতেছে।

সামাজিক ভ্রম প্রমাদ এবং সমস্ত কৃত্রিমতা ও যাহা কিছু "মেকি" তাহারই উপর ৺ ঈশ্বরগুপ্ত তীব্রকষাঘাতদ্বারা জাতীয়চরিত্রকে যেমন একদিকে যথার্থ পথে পরিচালিত করিতেছিলেন, অপর দিকে তেমনি খাঁটি বাঙ্গালীত্ব চিত্রিত করিয়া ও নবতর সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া সমস্ত জাতিকে তাহার জাতীয় ভাবে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—ইহা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু কে ওই বঙ্গসাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়া তরুণকিরণে চারিদিক উদ্ভাসিত করিলেন, কে জাতীয় মনে নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন আশঙ্কা জাগ্রত করিয়া দিলেন—কে বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মনে নব বল সঞ্চার করিলেন—তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শুভদিনে মাইকেলের আবির্ভাব হইয়াছিল।

কিন্তু তখনও জড় জাতি সে ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। সহস্র জড়তা ও কুসংস্কারের মধ্যে নাগপাশেবদ্ধ জাতীয়—হৃদয় অবশ্য অসাড় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য আলোক আসিয়া তাহার বহিঃপ্রদেশ কতকটা কিরণরঞ্জিত করিতেছিল বটে, কিন্তু অন্তর্দেশে তখনও ঘোরান্ধকার। হেমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হইল। একদিকে জাতীয় কবি স্বদেশবাসিগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, কখনও ধিক্কৃত করিয়া, কখনও অত্যুজ্জ্বল অতীত গৌরব কল্পনায় প্রত্যয় করাইয়া, কখনও সমস্ত পৃথিবীর তুলনায় আমরা কত হেয়, কত হীন, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার সঙ্গীত দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি দেখিলেন আমরা কত ক্ষুদ্র কত সঙ্কীর্ণ ভাবে জীবন যাপন করিতেছি, ক্ষুদ্রতা ও দৈন্যের মধ্যে ডুবিয়া মহত্ব, বিরাট মনুষ্যত্ব ও অসীমের ভাব ধারণাও করিতে পারি না।—সেই অন্ধ তমিস্রায় কে জাতীয় মনে আশার আলোক ধরিল? কে

বিরাট, সুন্দর, মহান্ চিত্রাবলী চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া মহান্ কল্পনায় উদার সঙ্গীতে হৃদয়দেশ ছাইয়া ফেলিল? এই যে একতা, এই যে জাতীয় সংস্কারের চেষ্টা এই যে জাতীয় ভাবের আন্দোলন,—কে বলিবে ইহা কবিপ্রভাবসম্ভূত কি না?

তাহার পর মনে করো—সমস্ত জাতি যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকচ্ছটায় দিশাহারা—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য—তখন এক দিকে যেমন দীনবন্ধু তাঁহার সুতীব্র রসিকতার আদর্শ লইয়া জাতীয় চরিত্রকে প্রকৃতিস্থ করিলেন, অমনি বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সুন্দর আদর্শচিত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন—এত আলোক, এত সঙ্গীত, এত সৌন্দর্য্য, দুঃস্থ, দুর্ব্বল, সঙ্কীর্ণ জাতি আর কখনও লাভ করে নাই। তিনি এক দিকে জ্ঞানবর্ত্তিকাহস্তে জাতীয় অবনতির ঘোরান্ধকারে ভ্রম-প্রমাদ-কুসংস্কার দলিত ও নিষ্পেষিত করিয়া যেমন পথ করিয়া গিয়াছেন, অপর দিকে তাঁহার অমর কাব্যে প্রতিফলিত মনুষ্যত্বের সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়া সমস্ত জাতিকে বলিয়াছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রতপ্রবুদ্ধ্যত।" সমস্ত জাতিকে সংগঠিত করিয়া, তাহার সম্মুখে নব সত্য ও নব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার হৃদয়ে সত্য ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগ্রত করিয়া তাহাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথও তাঁহার বর্ণিত সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ভিতর দিয়া সমস্ত জাতিকে অসীমের পথে ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন। সেই জন্য তাঁহার রচিত সৌন্দর্য্য মঙ্গলকে কখনও অতিক্রম করে নাই, এবং তাঁহার নাটকীয় চরিত্র প্রবৃত্তির মুখে ভস্মসাৎ হইয়া গেছে এবং নিবৃত্তির পথে জয়যুক্ত হইয়াছে। তাঁহার "ভুবনমনোমোহিনী জনক-জননী-জননী" জন্মভূমির জন্য করুণ সঙ্গীত ধারা স্বদেশীয়গণকে দীনা মাতার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু তাঁহার প্রভাবের কথা আলোচন করিবার সময় আজিও আসে নাই।

ইঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রাচীন ভারতের মহাকবিদিগের কথা আলোচনা করিলে এই কবিপ্রভাব সুস্পষ্ট হইবে। শুভদিনে আদি-কবির করুণ হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমসগঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম।

সেই বিশ্বের ক্রন্দনধ্বনিতভাবঅভিষিক্ত হৃদয় হইতে যে অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহা অনুদিন নরনারীবৃন্দকে চিরকৃতার্থ ও চির-সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। মহর্ষি ব্যাসের রচিত চরিত্রাবলী আমাদের সমক্ষে স্বর্গের আদর্শ, এবং মহিমার ভাস্বর দীপ্তি চির উজ্জ্বল রাখিয়াছে।

আমাদের সমাজের উপর প্রাচীন ভারতের যে প্রভাব তাহা প্রধা-নতঃ এই কবিদ্বয়কে দিয়া।

প্রবৃত্তির পথ অপেক্ষা নিবৃত্তির পথই যে শ্রেয়ঃ—এই আদর্শ, এই ভাব আমাদের কবিরাই সমস্ত জাতির হৃদয়ে চিরবিজড়িত করিয়া দিয়াছেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস বরং শ্রেয়স্কর তথাপি পিতৃসত্য লঙ্ঘিত হইবার নহে; বরং প্রিয়তমা রাজমহিষী ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় তথাপি রাজার প্রধান কর্ত্তব্য যে লোকরঞ্জন তাহাতে যেন ত্রুটী না ঘটে।

এই উজ্জ্বল নিবৃত্তির আদর্শের পার্শ্বে লঙ্কায় প্রবৃত্তিসঙ্কুল মোহময় চিত্র কত ম্লান! সংযম ও নিবৃত্তির পথ ত্যাগ করিয়া কৌরবকুলের কি ভয়ানক অকাল-বিলয়! আমাদের কাব্যে রাজপুত করায়ত্ত সমস্ত রাজ্য ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া সত্যের অন্বেষণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং বর্ণাশ্রমের বিবিধ পর্য্যায়ে সমস্ত গৃহী প্রবৃত্তির পথে সামাজিক শুভ বিনষ্ট না করিয়া অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ নিবৃত্তির পথে আত্মবিকাশ প্রার্থনীয় মনে করে।

আমাদের কাব্যে যাহা শুভ তাহাই সত্য ও সুন্দর বলিয়া চিত্রিত

হইয়াছে। আমাদের প্রেম উচ্ছৃঙ্খল নহে, তাহা অত্যন্ত শান্ত ও সংযত, তাহা কখনও মঙ্গলকে অতিক্রম করে নাই। বরং যে প্রেম গোপনে মঙ্গলকে অতিক্রম করিতে গিয়াছিল, তাহা দেবর্ষির অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়াছে এবং কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের সহায়তায় এবং কন্দর্প ও বসন্তের সহকারিতায় যে প্রেম ফুটিতে চাহিয়াছিল তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে।

আমাদের কাব্যে স্ত্রী চরিত্র বধূত্ব মাতৃত্বের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে এবং পুরুষ-চরিত্র স্বার্থ-বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়া লোকমনোহর হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের কাব্য কোথাও প্রকৃতির পঙ্কিল চিত্রে কলুষিত কিম্বা ভয়ঙ্কর সংগ্রামের চিত্রে রুধিরাক্ত নহে। তথায় এক অপূর্ব্ব পবিত্রতা ও শান্তি বিরাজ করে।

সেইজন্য অন্য কবিদের কাব্যে যেখানে প্রকৃতির সহিত ভীষণ সংগ্রামে রুধিরাক্ত চিত্র, মনুষ্যের ভয়ে প্রকৃতি জড়সড়, প্রকৃতি মনুষ্যের আজ্ঞাধীন আমাদের কাব্যে প্রকৃতি সেথায় সখীরূপে, মাতারূপে চিরকল্যাণময়ী, চিরসান্ত্বনা দায়িনী। বাসন্তীর, তমসার ও মুরলার হৃদয়ও সীতার দুঃখে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি কবিশিশুটীকে পর্য্যন্ত বাদ দিবার যো নাই; এবং তপোবনের হরিণ-হরিণী-তরুলতা বাদ দিলে শকুন্তলা-চিত্র যেন অসম্পূর্ণ হইয়া উঠে। বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে রাধাকৃষ্ণ ও সখীদের সঙ্গে যমুনা, তমালবন, শিখী ও গাভীবৃন্দও চির অমরতা লাভ করি-য়াছে! সুতরাং সৎ-চিৎ-আনন্দ ইহা আমাদের কবিদের কাব্যেই অবিচ্ছিন্ন রহিয়া গেছে।

ভ্রান্ত শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব আমাদিগের চতুর্দ্দিকে কৃত্রিমতার প্রাচীর সৃষ্টি করে, এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক, সরল, সুন্দর ও স্নেহময় প্রভাব হইতে দূরে, অতিদূরে লইয়া যায়; কিন্তু কবি প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের

চিরসখ্যতা স্থাপন করেন। জ্ঞানী ও কবি দু'জনেই বিচ্ছিন্ন সংসারকে একত্র করেন, একজন জ্ঞানের দ্বারা অপর জন প্রেমের দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

আমাদের কবিরা আনন্দের ভিতর দিয়া সত্যও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন এবং তাহারই প্রভাব সমস্ত সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশে ঋষি এবং কবির মধ্যে পার্থক্য ছিল না—ঋষিরা প্রায়ই কবি ছিলেন।

প্রাচীন আর্য্য কবি এই দুঃখ-দৈন্য-পরিপূর্ণ কলুষতাময় সংসারের মাঝেও তপোবনের পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন কাব্য এই তপোবন ছায়ায় পূত, স্নিগ্ধ ও শান্ত; এবং অঙ্কিত চরিত্রাবলী এই তপোবন ছায়ায় শীতল। চন্দ্র যেমন তপ্ত সৌরকর হইতে কেবল তাপটুকু লইয়া তাহাকে স্নিগ্ধতর মধুরতর করিয়া চরাচর আলোকিত করে, কবিরাও তেমনি প্রাচীন ভারতের সমস্ত জ্ঞান কবিতা ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সুন্দরতর, মধুরতর করিয়া আমাদের মনমুগ্ধ করিয়াছেন।

আমাদের প্রাচীন কাব্যের চরিত্রাবলী যেন সশরীরে আমাদের চতুষ্পার্শে ঘেরিয়া আছে, তাহারা আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করে, নিরাশায় আশার আলোক জ্বালিয়া দেয়, দুঃখ দৈন্যে শান্তির অমৃত ধারা সিঞ্চিত করে এবং দূরে মনুষ্যত্বের, স্বর্গের বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়া হৃদয়কে অসীমের পথে লইয়া যায়।

পঙ্কিল সংসারের কলুষতায় যখন আমরা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়ি—তখন প্রাচীন কাব্য আমাদের হৃদয়ে তপোবনের ছায়া এবং নন্দনের মূরতি আনিয়া দেয়—এবং মায়ামোহের ঘন তমসায় পবিত্র যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া চরাচর উদ্ভাষিত করিয়া তুলে।

সর্ব্বশেষে এই প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য্য, ও আনন্দের ভিতর

দিয়া সমস্ত জাতিকে সর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সর্ব্ব মঙ্গলের সার সত্যময় চিন্ময় ভগবানের নিকট উপনীত করিয়াছে।

শ্রীশৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত।

হেমবাবুর কবিতায় ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব।*

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে সুতহিবুকযোগে বঙ্গদেশে পলাশীর ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার শুভ পরিণয় সংসাধিত হইয়াছিল। ইংরাজি বাদ্যের রোলে বরযাত্রিদিগের আনন্দ কোলাহলে ঐ বিবাহের গোলযোগে অভাগিনী মোগল রাজলক্ষ্মী তাঁহার মুকুট চিরদিনের জন্য হারাইলেন। ঐ পরিণয়ের শুভফল স্বরূপ যে নবযুগ বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার উষাকালের ক্ষীণালোকে জনৈক পুরুষবর নয়ন গোচর হন। বঙ্গীয় সাহিত্য ইতিহাসে ইনি পুরাতন ও নূতন যুগের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বলা বাহুল্য ইনি রাজা রামমোহন রায়। ভিন্ন প্রকৃতির দুই সভ্যতার সংঘর্ষে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম সূত্রপাত সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা। ঐ চেষ্টায় বঙ্গসমাজ যে ঘোরতর তর্কবিতর্কে আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহার একদিকে শাস্ত্র মত ও সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতগণ ও অপরদিকে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিশালী অথচ ইংরাজি শিক্ষিত রাজা রামমোহন রায়। ঐ তুমুল সংগ্রামে বঙ্গভাষা উন্নতির প্রথম সোপানে পদার্পণ করিল। এই মহাতর্কে রাজা কেবল

* বাঁকিপুর কবিবর হেমচন্দ্রের স্মৃতি সংরক্ষণী সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ এম্ এ বি এল মহাশয়ের বক্তৃতা।

মাত্র ইংরাজি শিক্ষায় পরিপুষ্ট যুক্তির ও উদার দৃষ্টির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বঙ্গীয় ভাষায় প্রণালীর একান্ত অনুযায়ী। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যখন হারিতেরই দোহাই দিয়া সতীদাহ সমর্থন চেষ্টা করিয়াছিলেন, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "বৃহৎ বংশদ্বয় স্থূল রজ্জু দিয়া বন্ধন করিয়া দগ্ধ করা, বাপুহে, তোমার কোন্ হারিতে লেখা?" এই সমাজ সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়া রাজা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতার নবজ্যোতির উল্লাসে তিনি প্রাচীন ধর্ম্মেরও সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ঐ ধর্ম্ম সংস্কারের ফলে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থার গান ও প্রবন্ধ গুলিতে বঙ্গভাষায় যে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। ঐ গানের কয়েকটী রাজা স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন।

ইংরাজি শাসনারম্ভের শতবর্ষ পরে আর একবার বঙ্গদেশে ঘোরতর সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় বারের সমাজ সংস্কারক মহাত্মা পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁহার মহদনুষ্ঠানে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল দলের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। বাক্‌যুদ্ধে বাঙ্গালী বিশেষ পটু। কিন্তু এই বাক্‌যুদ্ধের স্থায়ী ফলস্বরূপ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে। "ধন্যরে দেশাচার" বলিয়া দেশাচরের প্রতি তাঁহার যে তীব্র কটুক্তি, তাহা ওজোগুণের দেদীপ্যমান উদাহরণ স্বরূপ সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই স্মরণ করিতে পারিবেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শুভমিলনে বঙ্গ সাহিত্য সমাজে যে সকল সুসন্তান প্রসূত হন, তাঁহাদিগকে রচনায় ভাষাগত পার্থক্য অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদিগের একদলের শীর্ষস্থানে পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত। অপর দলের—স্বর্গীয় প্যারিচাঁদ মিত্র মহোদয় ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয় দলই ইংরাজি ভাবের ও ইংরাজি সাহিত্যের

সাহায্যে স্বকীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু একের ভাষা সংস্কৃতানুগামিনী, ও অপরটি প্রাকৃত্যেৎপন্ন যদিও অক্ষয় কুমার ইংরাজি সাহিত্য, ইংরাজি বিজ্ঞান ও ইংরাজি দর্শন হইতে ভাব ও সত্য গ্রহণ করিয়া নিজের সাহিত্য বহুল পরিমাণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার ন্যায় সম্পূর্ণরূপ সংস্কৃতানুবর্ত্তিনী। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ হইতে এই কথার যাথার্থ্য অনুভূত হইবে। প্রীতি সম্বন্ধে একটী ধর্ম্মবিষয়কে প্রবন্ধে অক্ষয় কুমার বলিয়াছিলেন যে জগতে প্রীতি না থাকিলে "কোথায় বা চিত্রিত পুত্তলিকাসদৃশ সহাস্য শিশুমণ্ডলীর নিষ্কলঙ্ক মুখশ্রী, কোথায় বা গুণবতী পুণ্যবতী পতিপ্রাণা প্রিয়তমার পৌর্ণমাসী তুল্য প্রেমোৎফুল্ল সুধানন সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত মধুরালাপ ইত্যাদি।" অপরদিকে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় যে মাসিক পত্রিকা সম্পাদক করিতেন তাহার মধ্যে "ঘরচালন বিদ্যা জেনোফন্ (Xenophon) থেকে ভাঙ্গা" ইত্যাদি শীর্ষক ও এতদ্রূপ ভাষায় রচিত প্রবন্ধ প্রায়ই লক্ষিত হইত। কিন্তু এই উভয় দলের নিকটেই বঙ্গ ভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য বিশেষরূপ ঋণী। উভয় দলই গদ্য রচনার দ্বারা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

পদ্যরচনা সম্বন্ধে এই নবযুগ প্রবর্ত্তক কবি শ্রীমধুসূদন। ইনি ইংরাজি অন্যান্য ইউরোপীয় শিক্ষার ফলে নানা সাহিত্য হইতে বহুমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালিনী মাতৃ ভাষাকে সুশোভিতা করিয়াছেন। বাল্মিকীর রামায়ণ, হোমরের ইলিয়াড, ভার্জ্জিলের ইনিয়াড, ট্যাসোর জেরুজিলাম্ ডেলিভার্ড, অ্যারিয়োষ্টোর অর্ল্যাণ্ডো ফিউরিয়োসো, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি বিবিধ দেশজাত পুষ্প হইতে মধুসংগ্রহ করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব মধুচক্র রচিয়াছেন, তাহাতে গৌড়জন

"আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি।"

মধুসূদনের মৃত্যুকালে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছিলেন "মধুসূদনের ভেরী নীরব হইল। আশীর্ব্বাদ করি হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক!" কিন্তু ইহ জগতে কোন বস্তুই অক্ষয় নহে—আজ সেই বীণা স্তব্ধ হইয়াছে। তুলসী দাস ঠিকই বলিয়াছেন,—

গয়ে বল বিক্রম বেনু দধিচ।
গয়ে জিন্ পারথ ভারত ঠানা॥
জঙ্গ চুরে যো গয়ে দুর্য্যোধন।
চৌদভুবন ছত্র জিন্ তানা॥
বান গয়ে অরু বাল গয়ে।
জিন্‌কে কথরি দশশিষ্ সমানা॥
ধরাকে স্বভাও এই তুলসী।
যো ফরা সো ঝরা, যো বরা সেব বুতানা॥

গিয়াছে বিক্রমবলী, বেণু ও দধিচ চলি,
ভারতের মহাবীর পার্থ নাহি আর।
প্রতিদ্বন্দী দুর্য্যোধন, সেইবা কোথা এখন
যার ছত্র চতুর্দ্দশ ভুবনে বিস্তার।
বাণাসুর গেছে আর বালী কুক্ষি মাঝে যার
বদ্ধ ছিল একদিন রাজা দশানন।
ধরার স্বভাব এই, ফলিলে ঝরিবে সেই
তুলসী কহিছে যাহা জলে, হয় নির্ব্বাপণ।

হেমচন্দ্র পূর্ণ মাত্রায় ইংরেজের শিষ্য। তাঁহার কাব্য ইংরাজি শিক্ষার ফল।*

তাঁহার রচনার মধ্যে কয়েকটী অনুবাদ ও অনেকগুলি ইংরাজি

* হিন্দি অনভিজ্ঞ পাঠকদের জন্য এই কবিতাটীর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইল।

কাব্যের অনুকরণ পণ্ডিতসমাজে বলা বাহুল্য যে তাঁহার "ইন্দ্রের সুধাপান" ড্রাইডেনের (Dryden) "আলেক্‌জাণ্ডারস ফীষ্ট" (Alexanders feast)এর অনুকরণ। তাঁহার "হতাশের আক্ষেপ" "লক্সলী হল" এর (Locksley Hall) ছায়াবলম্বনে লিখিত। তাঁহার "লজ্জাবতী লতা" পড়িলে ওয়ার্ডসওয়ার্থের (Wordsworth) সেন্‌সিটিভ্ প্ল্যান্ট" (Sensitive Plant) মনে পড়ে। তাঁহার "মদন পারিজাত" পাঠে কেনা অভাগিনী "ইলয়সার" (Eloisa) দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে? তাঁহার "চাতক পক্ষীর প্রতি" সেলী (Shelly) বিরচিত স্কাইলার্ক (Skylark)এর, ও "জীবনসঙ্গীত' লংফেলোর (Long-fellow) "সাম অফ্‌লাইফ" (Psalm of life)এর অনুবাদ। তাঁহার "কমলবিলাসী" টেনিসনের (Tennyson) "লোটস ঈটার্স"এর আদর্শে রচিত। তাঁহার "ছায়াময়ী" যে দান্তের (Dante) "ডিভাইনা কমিডিয়া" (Divina Comedia) নামক অদ্বিতীয় কাব্যের আভাষে চিত্রিত তাহা কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। সেক্সপীয়ারের (Shakespeare) প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির চিহ্নস্বরূপ তিনি "টেম্পেষ্ট" (Tempest) ও "রোমিও জুলিয়েট্" (Romeo Juliet) অনুকরণে দুইখানি নাটক রাখিয়া গিয়াছেন। যে কবিতাগুলি স্পষ্টতঃ অনুবাদ বা অনুকরণ নহে তাহারও প্রধান ভাবগুলির জন্য কবি অন্য লোকের নিকট ঋণী। যখন কবি "ভারতবিলাপে" দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে বলিতেছেন :—

"হায়, বসুন্ধরা, তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে
পূরাতে নারিলে মনের আশা।

রূপে অনুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়,
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি এ হেন দশা!
হায়রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার; কেন না গঠিলি
মরুভূমি করে,—অরণ্যে রাখিলি
এ হেন যাতনা হতো না তায়।"

তখন তাঁহার এই বিষাদোচ্ছ্বাস শুনিয়া কেনা বায়রণের

"Italia! Oh Italia thou who hast
"The fatal gift of beauty which became
"A funeral dower of present woes and past,
"On thy sweet brow is sorrow ploughed by shame,
"And annals graved in characters of flame.
"Oh God! that thou wert in thy nakedness,
"Less lovely or more powerful, and coulds't claim
"Thy right, and drive the robbers back, who press
"To shed thy blood, and drink the tears of thy distress."

মনে করিবে, ও উভয়ের মূল "ফেলিসাজা" (Felicaja) কাহার না স্মৃতিপথে উদয় হইবে? "প্যারাডাইস্ লষ্ট্" (Paradise Lost)এর দ্বিতীয় সর্গে যে মন্ত্রসভার শয়তান (Satan) নরকগুলজার করিয়া

ছিলেন, বৃত্রসংহার পড়িলে অনেকেরই তাহার বর্ণনা মনে পড়িবে। তাঁহার "প্রিয়বয়স্যের মৃত্যু"তে অনেকগুলি ভাব যে "গ্রে"র "এলিজি" (Gray's Elegy) হইতে প্রাপ্ত তাহা বলা বাহুল্য।

হেমচন্দ্রের রচনার অধিকাংশ অনুবাদ ও অনুকরণ-মাত্র ও তাহাতে মৌলিকতার অভাব একথা বলিয়া আমরা তাঁহার নিন্দা করিতেছিনা। মনুষ্য কালের সৃষ্টি, স্রষ্টা নহে। যে যুগে হেমচন্দ্রের আবির্ভাব তাহা অনুবাদ ও অনুকরণের যুগ, মৌলিকতার যুগ নহে। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যে যে যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা অনুবাদ ও অনুকরণের যুগ, মৌলিকতার যুগ নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় কুমার দত্তের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এই কালের প্রায় সকল রচনাগুলি অনুবাদ ও অনুকরণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'জীবন-চরিত', 'সীতারবনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস, ও অক্ষয় কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার,' 'ধর্ম্মনীতি' ও 'পদার্থবিদ্যা' হিন্দি, সংস্কৃত যে ইংরাজি হইতে গৃহীত। যদি এ কালের গ্রন্থের মধ্যে কোনটীতে মৌলিকতা থাকে তাহা "আলালের ঘরের দুলালে" আছে। কিন্তু ব্যাভিচারই নিয়ম প্রমাণ করে। এই সকল মহাত্মাদিগের রচনায় মৌলিকতা নাই বলিয়া আমি কাহারও অমর্য্যাদা করিতেছি না। সাহিত্য জীবনে মৌলিকতার যেরূপ আবশ্যক, অনুবাদ ও অনুকরণের তদ্রূপই প্রয়োজন। বলিতে কি অনুবাদ ও অনুকরণ না হইলে মৌলিকতার বিকাশ হইতে পারে না। 'হল্যাণ্ড.এর প্লিনি (Holland's *Pliny*) ও 'নর্থে'র প্লুটার্ক (Norths' *Plutarch*) না হইলে বোধ হয় আমরা 'হুকার' (Hooker) ও 'রজার অ্যাশাম' (Roger Ascham)এর গদ্য ও বোধ হয় 'ফেয়ারি কুইন' (Fairy Queen), 'ম্যাক্‌বেথ' (Macbeth) ও লীয়ের (Lear) দেখিতে পাইতাম না। উপাদান না

থাকিলে গঠন হইতে পারে না। উপাদান অভাবে অত্যন্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিকেও নিষ্কর্ম্মা জীবন যাপন করিয়া, বিস্মৃতি সমুদ্রে বিলীন হইতে হয়। ভাষাই রচনার প্রধান উপাদান। অনুবাদকেরা ভাষা গঠিত করিয়া মৌলিকতার পথ পরিষ্কার দেন। সেই জন্য সাহিত্যজগতে তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন। ফ্রাউড্ (Froud) বলেন মৌলিকতার অভিব্যক্তির জন্য আদর্শেরও আবশ্যক। তিনি বলেন "No single mind in simple contact with the facts of nature could have produced a Pallas, a Medonna or a Lear"—আদর্শ উৎকৃষ্ট হউক বা নিকৃষ্ট হউক তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু আদর্শের অভাবে প্রতিভাও প্রাকৃতিক ঘটনা লইয়া কিছুই করিতে পারে না।—ইউরোপের মধ্যযুগে ধর্ম্মমন্দিরের চিত্রাঙ্কন প্রথা না থাকিলে, Rephaelএর কীর্ত্তি, ও Mysteries and Moralities না থাকিলে সেক্সপীয়রের নাটকের কথা কেহই শুনিত না।

কিন্তু হেমচন্দ্র সাধারণ অনুবাদক ছিলেন না। দেশকাল পাত্রের উপযোগী করিবার ক্ষমতা সামান্য শক্তি নহে। হেমচন্দ্র সে শক্তিতে অমিতবল। তাঁহার অনুকরণ প্রথা এতই সুন্দর ছিল, এবং তিনি পরের দ্রব্য এরূপ আপনার করিয়া লইতে পারিতেন যে তাঁহার হস্ত হইতে বিনির্গত হইলে তাহাতে পরকীয় কোনও চিহ্ন থাকিত না। পরের দ্রব্য আপনার করিয়া লওয়াও সাধারণ বুদ্ধির কার্য্য নহে। সেক্সপীয়রের (Shakespeare) কথা "No true man's apparel fits your thief অবলম্বন করিয়া মেকলে (Macaulay) লিখিয়াছেন, "No true poet's similitude fits your plagiarist হেমবাবু কিরূপে পরকীয় ভাব নিজস্ব করিয়া লইতে পারিতেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ মদন পারিজাতের কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

হাতে সুতো বেঁধে কভু প্রেমে বাঁধা যায় ?
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনি পলায়।
স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়,
না বুঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয়।

হেমবাবুর ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা Grayর "প্রোগ্রেস্ অফ্ (Progrss of Poesy) ছাঁচে ঢালা। কিন্তু এই বাঙ্গালা কবিতার কোন এক অংশ লইয়া দেখিলে কে বলিবে যে উহা ইংরাজি পদ্যের ছায়াপাতে লিখিত। সেক্সপীয়র সম্বন্ধে gray বলিতেছেন ;—

"Far from the Sun and summer gale,
"In thy green lap was Nature's darlinglaid,
"What time, when lucid Avon strayed,
"To him the mighty mother did unveil
"Her awful face ; the dauntless child,
"Stretched forth his little arms and smiled.
"This pencil take, (She said,) whose colours clear
"Richly paint the vernal year :
"Thine too these golden keys, immortal boy !
"This can unlock the gates of joy ;
"Of horror, that, and thrilling fears,
"Or hope the sacred source of sympathetic tears."

কালিদাস ও সেক্সপীয়র সম্বন্ধে হেমবাবু বলিলেন—

যাদুকর-বেশে চমকি ভুবন,
নিজ নিজ দেশে ফিরিল দুজন ;
একজন তার সে বীণার স্বরে ,
মেয়ে করিদূত প্রিয়ামন হরে,

একজন বসি আভনের তীরে
অমৃত বিতরে অমর নরে।

সেক্সপীয়র সম্বন্ধে এ কয়েকটী পংক্তি পড়িয়া কে বলিবে যে ইহা gray হইতে অবলম্বিত। হেমচন্দ্রের কবিতা ইংরাজিভাবে পরিপূর্ণ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে কোথাও সাহেবি গন্ধ নাই। বঙ্কিমবাবুও এ বিষয়ে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার "রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করা"তে ও "প্রস্তরধবলগ্রীবা"য় সাহেবি গন্ধ পাওয়া যায়।

আমাদের বিবেচনায় হেমচন্দ্রের প্রতিভা গীতিকাব্যময়ী, মহাকাব্য-বিষয়িণী নহে। তাঁহার কল্পনাও চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ ছিল না। বিবেক ও কল্পনার পরিপুষ্টি বালকবালিকার দৈহিক বৃদ্ধির অনুরূপ। বালকের দেহ বিলম্বে বর্দ্ধিত হয়, বিলম্বে পরিপক্কতা লাভ করে এবং তাহার হ্রাসের চিহ্নও বিলম্বে লক্ষিত হয়। বালিকার শরীর শীঘ্রই বর্দ্ধিত হয়, পরিপুষ্টি লাভ করে এবং শীঘ্রই বার্দ্ধক্যে পরিণত হয়। কল্পনার হ্রাস বৃদ্ধিও এইরূপ। অল্প বয়সে কল্পনার বৃদ্ধি ও পূর্ণ বিকাশ হয় এবং অল্পদিনেই আবার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কেবল "বেকন্" (Bacon) ও "বার্ক" (Burke) এ ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। সাধারণ বিধি অনুসারে হেমচন্দ্রের কল্পনা হ্রাসের প্রথম লক্ষণ "রাখি-বন্ধনে" প্রকটিত হইল। যে প্রতিভাবলে "ভারতসঙ্গীত" "ভারত বিলাপ" ও "ভারত ভিক্ষা" রচিত হইয়াছিল, "রাখি বন্ধন" সে শক্তি-ক্ষয়ের পরিচায়ক মাত্র। কল্পনার পূর্ব্বপ্রভাব থাকিলে কবি কংগ্রেসকে যে হৃদয়োন্মাদকারিণী মনোহারিণী একতাসূত্রে গ্রথিত মালাদ্বারায় বিভূষিত করিতেন ও যাহার সৌরভে সমগ্র ভারত আমোদিত হইত, তাহা কেবল আমরা কল্পনার বলে অনুভব করিতে পারি।

হেমচন্দ্রের "চিত্তবিকাশ" পড়িলে, ইংরাজি অন্ধ কবিগুরুর সামসন্ আগনিষ্টস্ (Samson Agonistes) সকলেরি মনে উদয় হয়। অন্ধত্বে

নিষ্পেষিত, অর্থকৃচ্ছ্রতায় ক্লিষ্ট, নানারূপ সাংসারিক ক্লেশে উদ্বেজিত হইয়া উভয় কবিই মনকষ্টে বার্দ্ধক্য অতিবাহিত করিয়াছিলেন। উভয় কাব্যই সেই হৃদয়যন্ত্রনার অভিব্যক্তি ও মানসিক দৌর্ব্বল্যের ব্যঞ্জক। হেমবাবুর দারিদ্র্যের কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যিনি উচ্চতম আদালতের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন তিনি যে নিজ ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হয়েন ইহা কেহই বলিতে সাহস করিবেন না। ঐ ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আর্থিক ক্লেশ ও সার ওয়াল্টার স্কটের শেষ অবস্থা ভাবিলে লক্ষ্মী সরস্বতীর চির-বিবাদ মনে পড়ে। সার্ ওয়াল্টার স্কটও ওয়েভার্লী (Waverley) নভেলের দ্বারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের নিঃস্বার্থ পরোপকার ও মুক্তহস্ততার ও স্কটের অধিকতর অর্থ বৃদ্ধির লালসার একই ফল ফলিল। সার ওয়াল্টার স্কট্‌কে ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধ বয়সে ভাড়াটীয়া গাড়ীর ঘোড়ার ন্যায় পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বাটীর সন্নিকটস্থ এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে তিনি যখন সার ওয়াল্টার স্কটের উন্মুক্ত বাতায়নের দিকে দৃষ্টি করিতেন, তখনই দেখিতেন যে একটী হস্ত কলের হস্তের ন্যায় অবিশ্রান্তরূপে ও অবিরতভাবে চলিতেছে। লক্ষ্মী সরস্বতীর চিরবিবাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গোল্‌ড্‌স্মিথকে (Goldsmith) ভ্রমণের সময় বংশী বাজাইয়া দৈনিক আহারের সংগ্রহ করিতে হইত। জন্‌সন্‌কে (Johnson) "র‍্যাসেলাস্" (Rasselas) লিখিয়া তাঁহার মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। স্যাভেজের (Savage) দুর্দ্দশার কথা সকলেরি মনে জাগরূক আছে। বস্তুতঃ জন্‌সনের সমসাময়িক সাহিত্যোপজীবি-গণের জীবনযাপনের কথা মনে হইলে আমাদের দেশে "ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে, মরণং গোমতীতীরে" এই চিরপ্রচলিত বাক্যটী মনে পড়ে। অস্মৎ দেশেও মধুসূদনকে চিকিৎসার ব্যয় ও পথ্যের

অভাবে দাতব্য চিকিৎসালয়ে মরিতে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অমৃতভাষিণী দেবীকে সম্বোধন করিয়া হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"হায় মা ভারতি! চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে
যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে"

পূর্ব্বগামী লেখক-গণের মধ্যে অনেকে যে দারিদ্র্যকবলিত হন নাই তাহার কারণ ধনাঢ্য ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ মাত্র। হ্যালিফ্যাক্স (Halifax) না থাকিলে Addisonএর যে কি দশা হইত তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়হেতুই ভারতচন্দ্রের বৈষয়িক প্রতিপত্তি, রাজা শিবসিংহের প্রসাদেই মিথিলার কবির সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ইউরোপে ঐ চিরবিবাদ ঘুচিয়াছে। কতদিনে এ হতভাগ্যদেশে ভগ্নিদ্বয় ভগ্নি-স্নেহে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবেন তাহা বলিতে আশাও নির্ব্বাক্।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল্,

মধ্যপথ।

দেখিতেছি, আজকাল আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষার বিষম প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষাস্রোত কোথাও বক্তৃতাকারে ভীম গর্জ্জনে পটমণ্ডপ কম্পিত করিতেছে—কোথাও রচনাকারে বড় বড় মাসিক সাহিত্যের অর্দ্ধকলেবর ব্যাপ্ত করিতেছে, কোথাও রঙ্গমঞ্চে বেশপারিপাট্য ও নবতর ভঙ্গীতে দর্শকবৃন্দের কর্ণবধিরকারী করতালি ও বিপুল সাধুবাদ আকর্ষণ করিতেছে।

কিন্তু এই বিপুল স্রোত কোন্ খাতে প্রবাহিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একটা দারুণ সন্দেহ এখনো রহিয়া গিয়াছে। একপক্ষ বলিতেছেন, প্রবৃত্তির পথ ধর—কর্ম্মের পথ ধর—উঠ, জাগ—অস্ত্র চালাও—যুদ্ধ শেখ, ইংরেজের সঙ্গে সমান হও—তবে উন্নতি করিতে পারিবে। অপর পক্ষ বলেন—আরে ও সব ছেলে মানুষী ছাড়িয়া দাও—ছেলেরা ছেলের মত থাক্,—বুড়ারা বুড়ারমত থাক্—আমাদের জাতীয় জীবনে এখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত—ও সব গুলি গোলার পটকা ছোড়া—লাঠি সোঁটার কস্‌রত দেখান ওকি আর আমাদের সাজে? এস আমরা বসিয়া বসিয়া হরিনাম করি—ভগবানের ধ্যান ধারণা করি।

১ম পক্ষের যুবজনোচিত উৎসাহের সঙ্গে আমাদের তেমন সহানুভূতি হয়না—দু চার জন কলেজের ছোক্‌রা যাদের এখনো বালকত্ব ঘোচে নাই, তাদেরই উহাতে আগ্রহ দেখা যায়—তাও ক দিনের জন্য যে পর্য্যন্ত তারা দু চার বার এফ, এ, ও বি, এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ না হয়। পক্ষান্তরের বিজ্ঞজনোচিত কথাটাই আমাদের লাগে ভাল—কেননা উহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতির ঠিক অনুযায়ী! চুপ চাপ বসিয়া থাক, নীরবে শাস্তি ভোগ করিয়া করিয়া ক্রমশঃ কৃশ হও—তার পর একদিন তৈলাভাবে জটা ও বস্ত্রাভাবে বল্কল পরিধান করিয়া জগতের গুরু হইয়া উঠিও—নিজে শান্তি না পাইয়াও পরকে শান্তি সুধারসে অভিষিক্ত করিও। জড়ত্বপ্রাপ্ত তমোগুণান্বিত ব্যক্তির চক্ষে ইহা অপেক্ষা মনোরম আর কি হইতে পারে?

দুর্ভাগ্য বশতঃ সত্ত্বগুণের অতীন্দ্রিয় আলোক ও তমোগুণের একান্ত আলোকাভাব—সাধারণ ব্যক্তির চক্ষে ঠিক একই রকম দেখায়। আমরা ভুলিয়া যাই তমোগুণের অকর্ম্মের মধ্যে শুধু জড়ত্ব থাকে, শান্তি থাকেনা, চেষ্টার অভাব থাকে, পরিপূর্ণতার তৃপ্তি থাকে না।

আমাদের বর্ত্তমান জড়ত্বময়, অবসাদময়, অবস্থায় আমরা ইচ্ছা

করিলেই ধ্যান ধারণা অভ্যাস করিতে পারিনা, সংসারকে দূরে রাখিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি না।

সেজন্য বল চাই, ধৈর্য্য চাই, দৃঢ়তা চাই।

সত্ত্বগুণ ও তমোগুণের বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখিয়া আমাদের মনে হওয়া অসম্ভব নহে যে আমরা আজও ঋষিগণের, ভগবানে আত্মনির্ভর ও সংসারের প্রতি অটল বৈরাগ্য কিয়ৎ পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি। সুতরাং সেই সকল গুণের—যাহারা অভ্যাসের অভাবে অপুষ্ট ও লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে—পুনরায় কিছু কাল চালনা করিলেই তাহারা পূর্ব্বের আকৃতি ও পূর্ব্বের বল সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে। সুতরাং এরূপ স্থলে আমাদের প্রকৃতির চিরানুকূল পন্থা পরিহার করিয়া প্রতিকূল পন্থায় পাদচারণা করিবার কোনই আবশ্যকতা উপলব্ধ হয় না।

কিন্তু ঋষিগণের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রকৃতির সাদৃশ্য শুদ্ধ দুই সম্পূর্ণ বিপরীত গুণের আপাতদৃষ্টির বাহ্য সাদৃশ্য মাত্র। ঋষিগণের সঙ্গে আমাদের বন্ধন বহুদিন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে—আমরা তাঁহাদের ঠিক বিপরীত প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি—তাঁহাদের বাক্যের অর্থবোধ করাই এখন আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সুপুষ্ট সুস্থদেহ পরিণত প্রৌঢ়, চঞ্চল কিশোর বা বলগর্ব্বিত যুবকের মত ছুটাছুটি বা মারামারি করিতে চাহেনা—সে এ সকল কর্ম্মে অপটু বলিয়া নহে, সে ইহা অপেক্ষা উর্দ্ধে উঠিয়াছে বলিয়া—সে তদপেক্ষা বলবত্তরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে বলিয়া—সে প্রবলতর শক্তির বিপুল প্রভাবকে দমন করিতে সক্ষম বলিয়া।

ব্রাহ্মণ যুদ্ধ করিতনা—কিন্তু তাহার ব্রহ্মতেজের সমক্ষে ক্ষত্রিয় গর্ব্ব অবনত হইত, মিথ্যা ভয়ে বা অনুগ্রহপ্রসূত সম্মানভরে নহে—ক্ষত্রিয় অন্তরে অন্তরে জানিত বলিয়া—যে এই নিরীহ সহিষ্ণু ক্ষমাশীল

জাতির মধ্য হইতে প্রয়োজন হইলে পরশুরাম ও দ্রোণাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব হওয়া বিচিত্র নহে।

তমকে অভিভূত করিয়া রজঃ এবং রজস্তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ বিকশিত হয়—উহাদিগকে বাদ দিয়া নহে।

ক্ষত্রিয় যখন ক্ষত্রিয় হয় তখন বৈশ্য ও শূদ্রের গুণ তাহার মধ্যে বিলীন হইয়া থাকে বিলুপ্ত হইয়া যায় না। ব্রাহ্মণ যখন ব্রাহ্মণ হন তখন ক্ষাত্রগুণ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াই হন পরিত্যাগ করিয়া নহে।

সুতরাং ভারতবর্ষের শুভদিনে হিন্দুজাতি সুদীর্ঘ প্লীহা, অবসন্ন চিত্ত ও হতাশ হৃদয় লইয়া জপ করিত না। তাহাদের সবল দেহ সকল কর্ম্মে পটুছিল, গভীর মর্য্যাদাবোধ তাহাদের মস্তককে উন্নত রাখিত এবং অটল নির্ভীকতা তাহাদের উদার বক্ষকে সময়ে অসময়ে দ্রুত কম্পন হইতে রক্ষা করিত।

ভগবানে চিত্তস্থির রাখা অসামান্য বীরত্ব ও অতুল বলবত্তার পরিচায়ক। আমাদের মত দুর্ব্বল চিত্ত ও অন্তঃসারশূন্য শরীর লইয়া ভগবানের ধ্যান ধারণা করিতে যাওয়া বা সংসারের আবর্ত্তময়ী বিলাস-লালসা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রাচীন কালের শিক্ষা প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, কিরূপে এই আর্য্যজাতি বিপুল শান্তি ও অতুল জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষ একদিন জগতের ধর্ম্মগুরুর স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল একথা অস্বীকার করিনা। কিন্তু সেই দুর্লভ উন্নতি তাহার অতুলনীয় শিক্ষা প্রণালীর গুণেই সংসাধিত হইতে পারিয়াছিল এ কথাও বিস্মৃত হইতে পারি না।

সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সেই অতুল শিক্ষা—শরীর, মন ও আত্মার যুগপৎ উন্নতি বিধানের সুন্দর সুব্যবস্থা—জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। সমিৎকাষ্ঠ কুশভার আহরণে, দিবসব্যাপী গোচারণে প্রাতরুত্থানে,

আসনাদি সাধনজনিত উপযুক্ত ব্যায়ামে বিলাসমাত্র পরিহারে, সুকঠোর ইন্দ্রিয় সংযমে শরীর রোগশূন্য এবং দৃঢ়ীভূত—বেদাধ্যয়নে, শাস্ত্রালোচনায় নির্জ্জন ধ্যান ধারণায় চিত্তবৃত্তি বিকশিত—এবং ঈশ্বর চিন্তায় সাধু সঙ্গমে, যোগাভ্যাসে, বিষয় বাসনা পরিহারে আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত হইবার সে প্রণালী আজ কোথায়? শৈশব হইতে এই ত্রিবিধ উন্নতির যাহারা চেষ্টা করিত, সংসারে আসিয়া জীবনব্যাপী পরিশ্রমে যাহারা সেই উন্নতি দৃঢ়ীভূত করিত তাহারাই একদিন ভগবানে আত্মসমর্পন করিয়া নিজেরা শান্তি লাভ করিত এবং জগতকে শান্তি দিতে সক্ষম হইত।

সুতরাং আমাদের এখন সহসা "আঙ্গুর গুচ্ছের অম্লতা" উপলব্ধি করিয়া, সমস্ত আধুনিক জাতির বাল্য চাঞ্চল্য দূরে পরিহার করিয়া নিস্পৃহ সাধু সাজিয়া বসিবার তাদৃশ সুবিধা নাই। প্রকৃত সাধু সাজিবার জন্য জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার প্রয়োজন পাশ্চাত্য লিখন প্রণালীর আমূল সংশোধন আবশ্যক। তমোগুণের ভগ্ন ভিত্তির উপর সাত্ত্বিক মহত্ত্বের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা সুবুদ্ধিসঙ্গত নহে।

অবশ্য আমি মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথামাত্র দূরে পরিহার করিয়া কেবলমাত্র তরবারি পূজা ও প্রতাপাদিত্য উৎসবের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু তাহা বলিয়া ভণ্ড প্রবীন সাজিয়া অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল দেহে পরের বলবীর্য্যকে উপহাস করিয়া বকধার্ম্মিকতা প্রকাশেরও পরিপোষক নহি। প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষাপ্রণালী—উহাই পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র পন্থা—উহা ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই।—ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমরা এক্ষণে যে দুই পন্থার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার এক প্রান্তে "গুণ্ডামী" অপর প্রান্তে "ভণ্ডামী"—তাহার কোথাও মনুষ্যত্ব কোথাও পূর্ণ পরিণতি—নাই। আমাদের "ভাবীঅবতার"কে

সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য অসি, লগুড় বা মালা তিলকের প্রয়োজন নাই, পূর্ণ মনুষ্যত্বেরই প্রয়োজন।

শুদ্ধ শারীরিক বল লইয়া স্পার্টানরা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে নাই, তমোগুণের ভিত্তির উপর পূর্ণ সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া চৈতন্যের প্রেমময় অমৃতময় ধর্ম্ম ভণ্ডামিতে পরিণত হইয়াছে—এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। হিন্দুর স্বাভাবিক লক্ষ্য ব্রহ্ম ও বৈরাগ্যের দিকে, একথা অস্বীকার করি না এবং ঐ পথ ছাড়িয়া বিলাসের পথ জড়ত্বের পথ ধরিলে আমাদের মঙ্গল নাই, একথাও স্বীকার করি; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা রাজসিক উন্নতিমাত্র পরিহার করিয়া সাত্ত্বিক উন্নতি লাভ করিতে পারিব এ কথা বিশ্বাস করি না।

আমাদের শারীরিক ও আধিভৌতিক উন্নতি করিতেই হইবে কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে এই উন্নতি চেষ্টা ব্রহ্মকে অতিক্রম না করে।

আমরা টিকিয়া থাকিলে এককালে জগতের আশ্রয় স্থান হইলেও হইতে পারি, সে জন্য টিকিয়া থাকার ব্যবস্থাটাই সর্ব্বাগ্রে একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

স্বদেশব্রতে উৎসর্গপ্রাণা রমণী।

"অঙ্গনা ভূষণ প্রিয়া স্বদেশ রক্ষণে,
অকুণ্ঠিতা উন্মোচনে গাত্র অলঙ্কার;—
সুকেশিনী শিরশোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে যদি তাহে হয় উপকার।"

প্রাচীন গ্রীস, রোম, কার্থেজ ও ভারতের মহিলা-কুলের অমানুষী বীরত্ব প্রভা স্বদেশের জন্য সতত বহ্নিমুখিনী ছিল। যে দেশের পুরুষগণের ভৈরবকমপ্রচণ্ডদীপ্ত জাতীয় সঙ্গীতের পাশে কোমলকণ্ঠা ঝঙ্কারদীপ্তা রমণী কুলের কোমলদীপ্ত সঙ্গীতলহরী ছুটিয়া বেড়াইত—পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া তেজ ও বীরত্বের সহিত মহাশক্তি নাচিয়া বেড়াইত তখন সে দেশের অধঃপতন হইবে কে বিশ্বাস করিত? সে গ্রীস নাই—আছে মাত্র কয়েকটী ভস্মস্তূপ, সে রোম নাই—এখন তাহার স্থলে কলা-বিদ্যার চরমোৎকর্ষতা বীরত্বের ভৈরবরাগিনীর পার্শ্বে এখন কোমল—প্রাণতোষক সঙ্গীতের ধারা, কার্থেজ ত অনেক দিনই গিয়াছে; আর ভারত—অস্থি কঙ্কালসার নৈরাশ্যেমুহ্যমান শেষ জ্বালাময় পরিণামের আকুলোৎকণ্ঠায় কাতরদৃষ্টি! ভারতের তেজ গিয়াছে। ভুলেও কেহ একবার জাতীয় সঙ্গীত গাহে না—ভারত-রমণী অন্তঃপুর বদ্ধা! ভারতের উন্নতি কোথায়?

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাও অর্দ্ধবলে কখনও উন্নতি দেখিতে পাইবে না—নর নারীর সমবেত চেষ্টা ব্যতিত জাতীয় উন্নতি কখনও সম্ভবে না—ইংলণ্ড ফ্রান্স, জর্ম্মনী, নবোন্নতিশীল আমেরিকা দেখ—পুরুষের পার্শ্বে নারী দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতেছেন—তাই তাহারা উন্নত, সভ্য, শিক্ষিত। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই সম্মিলনের পবিত্র স্বর্গীয় প্রসূত ফল চিরকালই ঘোষণা করিবে। সেই সমস্ত মহান্ আদর্শ আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করা পতিত ভারতের পক্ষে কতকটা স্বর্ণপ্রসূ হইতে পারে আশা করা যায়। নরনারীর উন্নতির যুগসন্ধি স্থলে বিশেষতঃ ভারতীয় নারী জাতির এই উন্নতির প্রথম উষায় এই সম্বন্ধে আলোচনা কুফল প্রসবিনী না কতকটা সুফলপ্রসূ হইতে পারে এবং এবম্প্রকার আলোচনাও বর্ত্তমান সময়োপযোগিনী।

অদ্যকার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোন প্রাচীন তথ্য আলোচনা করিব না

—বা ভারতের কিছু নূতন কথা শুনাইব না। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রধান স্মরনীয়, ঘটনা "বুয়ার-ইংরেজযুদ্ধ"। এই বুয়রইংরাজ যুদ্ধে সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত রমণীরা বিলাসের সুকোমল বাসর ত্যাগ করিয়া ঘোর বিপদাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের গুলি বর্ষণের মধ্যে স্বদেশহিত অনুপ্রাণিতা হইয়া স্বদেশের ও স্বদেশীর জন্য জীবনের মায়া পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া ছিলেন তাহারই দু'চারটা কথা আদর্শরূপে ভারতীয় রমণীবর্গের সম্মুখে দেখাইতে ইচ্ছা করি।

রমণী উৎসাহদাত্রী বলিয়া বুয়ার এত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল—শুধু উৎসাহ দাত্রী নয় সহকর্ম্মিনী ছিল বলিয়াও বটে। ইংরাজ জাতির জগৎ প্রসিদ্ধ খ্যাতি সুধু রমণীর উৎসাহ ও সাহচর্য্য প্রভাবে। ইংরাজ রমণী বিপদে মুহ্যমান ইংরাজ জাতিকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়া হৃদয়ে নূতন বল দিয়াছেন—যুদ্ধে প্রণোদিত করিয়া তুলিয়াছেন। উন্নতিশীলে রক্ষণশীলে অনবরত রণকাণ্ডের অভিনয় করিতেছে কিন্তু বাহিরের গোলযোগে আবার এক প্রাণ হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ ইংরাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে ইংরাজরমণীর সহচর্য্য স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে।

বুয়ারের অব্যর্থ সন্ধানে সহস্র সহস্র ইংরাজ সৈন্য হত আহত হইতেছে, বিদেশে আহত ও মুমূর্ষের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য সহস্র সহস্র রমণী শুশ্রূষাকারিণীর পদে নিযুক্ত হইয়া ট্রান্সভাল যাত্রা করিতেছেন—ইতিহাস চিরকালই রমণীর এই দেবীপ্রাণতার সাক্ষ্য দিবে। তাঁহারা প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া আহত সৈন্যদের সেবা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। কামানের ভৈরব গর্জ্জন বন্দুকের শন্ শন্ গুলি-বৃষ্টির মধ্যে সমস্ত জীবনের বিপদতুচ্ছ করিয়া জীবন্ত স্নেহের মত তাঁহারা মুমূর্ষ বিকার গ্রস্ত সৈনিকের শুষ্ক কণ্ঠ ভিজাইয়া দিতেছেন, শেল-গোলার ভীষণ আঘাতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট সৈন্যগণকে মধুর বচনে প্রফুল্ল করিতেছেন—

ইংরাজ রমণীর এই অতুলনীয় সহৃদয়তা প্রকৃত আদর্শের যোগ্য নয় কি ?

যাঁহারা বিলাসের পুষ্পকোমল শয্যায় হস্তপদ বিস্তার করিয়া সুখস্বপ্নের আবেশময় স্বপ্নে ভাসিয়া যাইতে থাকেন—মৃদুহাস্যাননা সুকোমলাঙ্গী বরাঙ্গনাগণ যাঁহাদের সুকোমল অঙ্গ 'টিপিয়া' দিতে অথবা ব্যজন করিতে সর্ব্বদাই নিযুক্ত পুরুষের স্কন্ধে ভর না দিয়া সে সকল বিলাসিনী "পাদমেকম্ ন গচ্ছতি" বৎ চলিতে অক্ষম—সেই সকল সুখ-নন্দন কাননের সুখময় প্রাণী স্বজাতির সেবা করিবার জন্য রণভূমিতে গমন করিয়া ছিলেন। বিলাসের কোমল স্পর্শের পরিবর্ত্তে তাঁহারা বুক পাতিয়া শত্রুর দুর্দ্দম ভীষণ প্রহার সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুপবিত্র উদার ইংরাজ চরিত্রে তাঁহাদের নরনারীর এইরূপে স্বজাতি প্রীতি উজ্জ্বল রত্নকীরিট স্বরূপ!

লেডি সারা উইলসন্।

লেডি সারা উইলসন্ ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা। এক সময়ে যে ডিউক অব মার্লবারো ইংলণ্ডের রাজা অপেক্ষা প্রতাপশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন এই রমণী সেই ঘরের কন্যা। ইংরাজ সৈন্যের ঘোরতর পরাজয় কালে—যখন উপযুক্ত খাদ্য ও শুশ্রূষা অভাবে সহস্র সহস্র ইংরাজ আহত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইতে-ছিলেন, ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে হাহাকারে—পার্লামেণ্ট মহা ব্যতিব্যস্ত—মন্ত্রীসভা উত্যক্ত ইংলণ্ডবাসিগণ এক চক্ষে অশ্রু অপর চক্ষে প্রতি-হিংসার জলন্ত বহ্নি লইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে ছিলেন। শত শত ইংরাজ মহিলা কুলগৌরব ও পদগৌরব দূরে ফেলিয়া স্বজাতির সেবা করিবার জন্য দক্ষিণ আমেরিকাভিমুখে ছুটিতে ছিলেন—লেডি সারা উইলসন্ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। ইনি স্বেচ্ছায় স্বদেশ সেবাব্রতের গুরু-

তর ভার স্কন্ধে লইয়া ধাত্রী স্বরূপ রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেইখানে যাইয়া ভাগ্য তাড়নায় মেফিকিঙ্গে কর্ণেল বেডেন পাওয়েলের সহিত অব-রুদ্ধ হইতে হইল। ইঁহার এমনি মধুর স্বভাব—যে ইঁহার মিষ্ট মধুর বাক্যগুলি শুনিত সেই সকল যাতনা ভুলিয়া যাইত। অবরুদ্ধ সৈনিক মণ্ডলীর বিষাদান্ধকারাবৃত মুখমণ্ডল ইনি শান্ত মিষ্ট অথচ উৎসাহ দীপ্ত বাক্য বর্ষণে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও হাস্যময় রাখিতেন।

ইঁহার উপর আর একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার নির্দ্দিষ্ট ছিল। রণ-ক্ষেত্রে সংবাদ পত্রের সংবাদদাতার পদ নিতান্ত নিরাপদ নয়—লেডি সারা বিলাতের "ডেলিমেল" পত্রের সংবাদ দাত্রী-পদে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। যে যখন ভীষণ যুদ্ধ হইত লেডি সারা সেখানে উপস্থিত হইয়া সৈন্য দিগকে উৎসাহিত করিতেন তাঁহার এতাদৃশ অমায়িক ব্যবহারে কি সৈনিক কি সেনানী সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। একবার এই তেজস্বিনী রমণী বুয়ার কর্ত্তৃকযুদ্ধে বন্দী হইয়া প্রিটোরিয়ায় নীতা হইয়াছিলেন। তখন ভাবিয়াছিলেন যে হয়ত যুদ্ধাবসান পর্য্যন্ত তাঁহাকে শত্রুর বন্দিনী হইয়া থাকিতে হইবে। এই সময়ে ডিলারী নামক একজন বুয়ার সৈন্যা-ধ্যক্ষ ইংরাজ হস্তে বন্দী হয়েন। ইংরাজেরা ডিলারীকে মুক্তি দিয়া সারাকে উদ্ধার করেন। সৌভাগ্যাঙ্ক লালিতা এই রমণী, অবরুদ্ধাবস্থায় কখন অনশনে অর্দ্ধাশনে ঘাসের রুটী পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছেন কখনও তাঁহাকে কাতর বা অপ্রফুল্ল দেখায় নাই!

লেডি রেণ্ডল্ফ চার্চ্চহিল।

লর্ডরেণ্ডলফ চার্চ্চহিল ইংলণ্ডের আর একজন লর্ডবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার পুত্র উইনষ্টন চার্চ্চহিল বুয়র হস্তে বন্দী হইয়া প্রিটো-রিয়ার কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার পর কিরূপ কৌশলে মুক্তি লাভ করেন—পর্টুগীজদিগের দেলাগোয়া উপসাগর দিয়া পলায়ন

করেন সে সব এ প্রবন্ধের আলোচনা নহে—এবং সে সংবাদ সংবাদ পত্র পাঠকের নিকট অজ্ঞাতও নহে। সারা উইলসন্ বুয়র হস্তে বন্দিনী, উইনষ্টন চার্চ্চহিল ও প্রিটোরিয়ায় আবদ্ধ এই সংবাদ শুনিয়া লেডিরেণ্ডলফ চার্চ্চহিল ইংলণ্ড হইতে আফ্রিকা যাত্রা করেন। আহত সৈনিক পুরুষদের সেবা শুশ্রূষার জন্য তিনি "মেইন" নামক জাহাজ হাস্পাতালে পরিণত করিয়া ছিলেন। এই জাহাজে সমস্ত আহত সৈন্যগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবে। তাহাদিগের বস বাসের জন্য যতপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজন জাহাজে তাহার কোন প্রকারের অভাব ছিল না। আহত দিগের সেবা লেডিরেণ্ডলফ্ চার্চ্চহিলের জীবনে তাৎকালিক প্রধান নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল।

লেডি ফ্লোরা পুরা।

লেডি ফ্লোরা পুরা ডিউক অব্ হ্যামিল্টনের ভগিনী। এবং মেজরপুরের সহধর্ম্মিনী। বহুশত অশ্বতর বুয়র যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল। মেজরপুর এবং লেডিপুর নানা দেশ বিদেশ ঘুরিয়া সেই সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক আফ্রিকায় পাঠাইয়া ছিলেন। লেডিপুর একজন ডিউকের ভগিনী ইংলণ্ডে ডিউক পদ যে-সে পদ নয় এতদ্দেশীয় একজন প্রধান শাসনকর্ত্তার পদের তুল্য—তিনি সৌভাগ্যের ক্রোড়ে পালিত হইয়াও সকল সুখ স্বচ্ছন্দে বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর সহিত আফ্রিকায় গিয়াছিলেন এবং আহত সৈন্যগণের সেবা শুশ্রূষায় মনপ্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন।

এই সকল পুণ্যবতী, স্বদেশসেবা ও স্বজাতিপ্রীতি ব্রতে ব্রতিনী রমণীগণ জগতের আদর্শ-স্থানীয়া। ইঁহাদের অকপট স্বদেশানুরাগ, অকৃত্রিম স্বজাতি প্রীতি, অনন্যমেয় মাতৃস্নেহ ও কারুণ্যের প্রবলতা হতভাগ্য ভারত মহিলা কুলের আদর্শ হইলে তাঁহাদের উন্নতি হইবে না কে বলিল?

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।

জন্মকথা।

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"
মা শুয়ে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে,—
"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে!

ছিলি আমার পুতুল-খেলায়,
ভোরে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি!
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি।

আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালবাসায়,
আমার মায়ের, দিদিমায়ের পরাণে—
পুরাণো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের' পরে
কতকাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে!

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া

তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে!

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস্ আনন্দ স্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি'!

নির্ণিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝিনে রে
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে?
ওই দেহে এই দেহ চুমি'
মায়ের খোকা হয়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে!

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখ্‌তে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে!
জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখ্‌ব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহুদুটির আড়ালে!

———

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। } ১৩১০। { ১০ম সংখ্যা।

জনকপুর।

(ত্রেতাযুগের তীর্থক্ষেত্র)

বর্ত্তমান বর্ষের (১৩১০ সালের) শারদীয় পূজার সময়ে আমি ত্রিহুতের অন্তঃপাতী সুপ্রসিদ্ধ জনকপুর তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলাম। রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী সতীকুলপ্রধানা জানকীসুন্দরীর পিতা শ্রীমৎ রাজর্ষি জনক এই প্রাচীণ ও প্রখ্যাত ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন জন্য লোকপ্রিয়তা এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা "অষ্টসিদ্ধি" অর্জ্জন করতঃ ভূতলে অতুল বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। রাজর্ষি জনক একাধারে মনুষ্যত্ব এবং দেবত্বের সম্পূর্ণ আদর্শ; সেইজন্য তিনি হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে অবতার, উপদেষ্টা, ঋষি, রাজা এবং "অমর অভ্রম" বলিয়া প্রখ্যাত। এই আদর্শ পুরুষের আদর্শ রাজ্যক্ষেত্র নানা কারণে দর্শনের উপযুক্ত।

আমি প্রথমে হাবড়া রেলওয়ে কার্য্যালয়ে মোকামাঘাট নামক ষ্টেশনের টিকিট লইয়াছিলাম। হাবড়া হইতে মোকামাঘাট ষ্টেশন প্রায় দেড় শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী; মধ্যশ্রেণীর রেলগাড়ীর ভাড়া ৫৲ টাকা;

হাবড়ায় অপরাহ্ণ সার্দ্ধ দুই ঘটিকার সময়ে বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিলে রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে মোকামাঘাটে পৌছিতে পারা যায়। মোকামাঘাট ষ্টেশন জাহ্নবী নদীতটে অবস্থিত, সুতরাং এই ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া পথিক দিগকে বাষ্পীয় তরণীযোগে জাহ্নবী পার হইতে হয়। গঙ্গা অতিক্রম করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। অপর পারে পদার্পণ করিয়া পথিকেরা দেখিবেন, আর একটী সম্পূর্ণ নূতন রেলওয়ে লাইন তথায় বর্ত্তমান আছে,তাহার নাম বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টারণ রেলওয়ে (B. N. W. Railway)। ইহার প্রথম ষ্টেশনের নাম সামেরিয়া ; জনকপুর যাইতে হইলে সামেরিয়া ষ্টেশনে "পুপ্‌ড়ি" নামক ষ্টেশনের টিকিট ক্রয় করিতে হয়। পুপ্‌ড়ি"র ইংরাজি নাম জনকপুর রোড্ ষ্টেশন। সামেরিয়া হইতে জনকপুর রোড্ ষ্টেশন প্রায় সার্দ্ধ ছয় ঘণ্টার পথ, মধ্যশ্রেণীর রেলভাড়া দুই টাকা হইতেও কিঞ্চিৎ ন্যূন। হাবড়া ষ্টেশন হইতে পুপ্‌ড়ি পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকটের সহায়তায় বাইশ ঘণ্টায় এবং সপ্তমুদ্রার টিকিটে পথিকেরা অনায়াসে পৌছিতে পারেন। পথিমধ্যে সমস্তীপুর নামক ষ্টেশনে একবার গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহাতে আদৌ বিলম্ব বা অসুবিধা হয় না। ত্রিহুতের যে সকল গ্রাম, নগর ও নগরী অতিক্রম করিয়া বাষ্পীয় শকট তীব্রবেগে গতায়াত করে, তন্মধ্যে দ্বারভাঙ্গা (দ্বারবঙ্গ) নগরী সর্ব্বাপেক্ষা গননীয়া। পথিকেরা ইচ্ছা করিলে এই প্রাচীনা ও প্রসিদ্ধা নগরীর অভ্যন্তরস্থ দর্শনীয় স্থান ও পদার্থ সমূহকে দেখিয়া যাইতে পারেন।

আমরা পুপ্‌ড়ি ষ্টেশনে (Janakpore Road Station) গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া শুনিলাম, ষ্টেশন হইতে জনকপুর তীর্থক্ষেত্র প্রায় দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত সুতরাং আমাদিগকে বাধ্য হইয়া পুপ্‌ড়ি গ্রামে বিশ্রাম লাভ করিতে হইল। দেখিলাম, পুপ্‌ড়ি একটি গণ্ডগ্রাম, এখানে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ডাকঘর, ছোট স্কুল এবং অহিফেণের

কারখানা রহিয়াছে। হাট, বাজার, দোকান প্রভৃতিতে ভদ্রলোকদিগের আহার ও ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্যাদি সুলভে ও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রামে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমরা জনকপুরাভিমুখে গমন করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। দেখা গেল, কুড়িমাইল পথ অতিক্রম করিবার জন্য, এক্কা নাম্নী একপ্রকার গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, পাল্কী ও বলদশকট এই কয়েক রকমের যানের মধ্যে কোনও একটির অনুসন্ধান করিয়া লইতে হয়। আমরা যে সময়ে তদঞ্চলে গিয়াছিলাম, তখন পথে ঘোরতর কর্দ্দম এবং নদীতে জল ছিল, সুতরাং যান ভিন্ন গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। সকল সময়ে যান পাওয়া যায় না, পূর্ব্বে হইতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত এক্কাগাড়ী যায় তাহার পরে আর এক্কা চলে না, সুতরাং যে পর্য্যন্ত এক্কা চলে সে পর্য্যন্ত আমরা এক্কা গাড়ীতে এবং তদনন্তর হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম। আমাদের এক দয়ালু ও সম্ভ্রান্ত বন্ধু আমাদের জন্য অনুগ্রহ করিয়া কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী পথের পরে হাতীর বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুগ্রহ না হইলে পথের ভীষণ কাদা, বন্যাপূর্ণা নদী এবং স্থানে স্থানে কঠোর প্রস্তরময় প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আমরা জনকপুর যাইতে সক্ষম হইতাম না। প্রাতে বেলা প্রায় সার্দ্ধ সপ্তম ঘটিকার সময় এক্কা গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আমরা পঞ্চক্রোশ দূরে মোটিহানি নামক স্থানে উপনীত হইলাম ; এই স্থানে গাড়ী আনাইয়া গাড়োয়ান কহিল "মহাশয়! এই পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজত্বের সীমা, ইহার পরেই নেপাল মহারাজার রাজ্য আরম্ভ। ঐ দেখুন, ঐ স্তম্ভদ্বারা বৃটীশ-রাজ্য এবং নেপাল রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।" আমরা দেখিলাম, কতকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত সুদৃঢ় স্তম্ভ সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া একদিকে বীরকেশরী বৃটিশ সিংহের বিপুল বিভব ও বিক্রমের

এবং অপর দিকে শিবভক্ত প্রাচীন নেপালের বীরত্ব, সাহস, স্বদেশপ্রিয়তা ও স্বধর্ম্মানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই স্থানে আমরা জলযোগ দ্বারা ক্ষুধাশান্তি করিয়া পুনরায় এক্কায় আরোহণ পূর্ব্বক এক ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী যমুনীয়া নাম্নী ক্ষুদ্রা তটিনীতটে উপস্থিত হইলাম। এই নদীর তটে আমাদের হাতি ছিল, আমরা 'এক্কাখানি' বিদায় দিয়া হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নদী পার হইলাম। তদনন্তর কিঞ্চিদধিক চারিক্রোশ পথ হস্তী পৃষ্ঠেই অতিক্রম করিয়াছিলাম; জনকপুর ক্ষেত্রে পৌছিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছিল। রাত্রিতে কিছুই দেখা হয় নাই; এক্কা ও হাতীর দোলনে সমুচয় দেহ নিতান্ত ক্লান্ত বোধ হওয়ায় আমরা সুনিদ্রা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

রজনী প্রভাত না হইতে হইতে জনকপুর ক্ষেত্রের নানাস্থান হইতে দলে দলে ভক্ত হিন্দুরা "জয় সীতা" "জয় সীতা" রবে দিকদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। যাঁহার আলয়ে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি কহিলেন "ইহা জনকপুর ক্ষেত্র বটে কিন্তু এখানে রাজর্ষি জনক অথবা মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ সম্মান নাই, এখানে সতী সাধ্বী মা জানকীরই বিশিষ্ট সম্মান ও বিশিষ্ট পূজা হইয়া থাকে।" আমরাও ভাবিয়া দেখিলাম, জনকের কন্যা বলিয়া সীতার প্রখ্যাতি নহে কিন্তু সীতার পিতা বলিয়া জনক রাজার অমরত্ব। যদি এখানে সীতা-সতীর জন্ম না হইত, যদি এখানে হরধনু ভঙ্গ করিয়া রঘুকুলভূষণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতা সুন্দরীর পাণিগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে জনকের নাম বোধ হয় এতদিনে বিস্মৃতি সাগরের তরঙ্গে বিলীন হইয়া যাইত। চিন্তা করিতে করিতে কবি কৃত্তিবাসের কবিতা স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল—

যে স্থানেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন।
সে স্থানে হইল শুদ্ধ মিথিলা ভুবন॥

সীতাদেবী জন্মিলেন জনকের ঘরে।
ধনুভঙ্গ পণে তাঁরে শ্রীরাম বিয়া করে॥
অযোনিসম্ভবা ইনি জন্মিলেন চাষে।
জনকের ঘরে জন্ম মিথিলার দেশে॥
শিয়লে হইল জন্ম নাম রাখে সীতা।
পরমা সুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা॥
লক্ষ্মীর রূপের কিবা কি দিব তুলন।
যাঁর রূপে ভুলিলেন দেব নারায়ণ॥

ভক্তাধিক ভক্ত হিন্দুদিগের সুমধুর "জয় সীতা" "জয় সীতা" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বিমানবিহারী বিহঙ্গ বর্গের বিচিত্র ও বিনোদ কাকলী লহরী মিশ্রিত হইয়া গগনমণ্ডল পর্য্যন্ত মধুময় হইয়া উঠিল। সেই সুখময় সময়ে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, জনকপুর ক্ষেত্রের চারিদিকে অনন্ত মহাবন! যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল বন আর বন ভিন্ন কিছুই দেখিলাম না। এই মহারণ্য নেপালপর্য্যন্ত প্রসারিত, অরণ্যের অভ্যন্তরে বিবিধ প্রকারের শার্দ্দূল, মাতঙ্গ, ভল্লুক, সর্প এবং নানজাতীয় নর ঘাতী শ্বাপদের অভাব নাই। বলা বাহুল্য, জনকপুর ক্ষেত্র নেপালের মহারাজের রাজ্যভুক্ত এবং তাঁহারই শাসনাধীন।

দুইটি নদীর মধ্যদেশে জনকপুর ক্ষেত্র অবস্থিত, একটি নদীর নাম—বাঘমতী, অপরটির নাম--কমলেশ্বরী। জনকপুর দেখিতে নগর বা নগরী নহে, অধিক কি বাঙ্গালা দেশের একটা গণ্ডগ্রামের ও তুল্য নহে। এখানে অল্পসংখ্যক লোকের বসতি কিন্তু তীর্থস্থান বলিয়া প্রতিদিন বহুলোকের সমাগম হয়, এজন্য স্থানটি সতত "গুল্‌জার" থাকে। অধিবাসীগণ নেপালী এবং বেহারী; বেহারী দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ধানুক, কুর্ম্মী, কেওট, আমাৎ, কাহার, মাল্লা, ধীবর, দোশাদ, হালালখোর, মুশাহর, বরহী, ধনকার, বরেই (বারুই), তিলি, তাঁতোয়া, পাশী,

কান্, পেহেরী, কশেরা, বাভণ, কলাল, কালোয়ার, কায়স্থ, ছত্রী, রাজপুত এবং লহেরী এই কয়েক জাতি বাস করে। এতদ্ভিন্ন "জনকপুরী" নামে এক হিন্দু জাতি আছে, ইহাদের জল অস্পৃশ্য। কেন ইহারা অধম ও অস্পৃশ্য বলিয়া পরিচিত তাহা জানা যায় না; অনেকে অনুমান করেন ইহাদের আদি পুরুষ "কলু" জাতীয় ছিল। এই তীর্থক্ষেত্র শ্রীরামচন্দ্রের, রাজর্ষি জনকের, জানকীর এবং তদ্ভিন্ন লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান প্রভৃতির মূর্ত্তি ও মন্দির দেখা যায়। ইংরাজী পয়সা এখানে চলে বটে কিন্তু তাহা এতদ্দেশে প্রচলিত "ঢেউয়া" নামক পয়সার দরে বিনিময় করিয়া লইতে হয়। এখানকার মুচীরা "হাজারী" নামে পরিচিত। আমাদের দেশের অনেকস্থানে (বোধহয় অধিকাংশ স্থানে) পুত্রবধূরা শ্বশুরের সহিত কথোপকথন করে না, এখানে সে প্রথার বিপরীত দেখিলাম, এখানে বৌ শ্বশুরের সহিত কন্যা ও পিতার মত কথা কয়।

জনকপুরের মহারণ্য হইতে নানাবর্ণের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিহঙ্গ সমূহ যখন দলে দলে উড়িয়া আসিয়া গ্রামে প্রবেশ করে এবং আকাশকে ঢাকিয়া ফেলে তখন সেই দৃশ্য দেখিতে বড়ই মনোরম বলিয়া বোধহয়। এখানে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে নানাজাতীয় পক্ষী প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই তীর্থক্ষেত্রে বিহঙ্গবধ বা বিহঙ্গ শিকার একেবারে নিষিদ্ধ। অনেক সাধু বহুসংখ্যক পাখি প্রতিপালন করিয়া থাকেন। গৈরিকবসনধারী রামায়ৎ সন্ন্যাসী অথবা শুভ্রবসনধারী বৈষ্ণব সাধুর সংখ্যাও এখানে কম নহে, আমরা ৫২টি কুটীরে সাধুর আশ্রম দেখিয়াছিলাম, এই সকল আশ্রমের অধিনায়কের নাম শ্রীমৎ বাবা নারায়ণ দাস; ইনি সমগ্র ত্রিহুত প্রদেশে সুপরিচিত। অগ্রহায়ণ মাসে মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন, এজন্য অগ্রহায়ণ রামের বিবাহোপলক্ষে এখানে মহা ধুমধাম হয়। চৈত্রমাসে

রামনবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে। এই দুই পর্ব্বের সময় ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে গৃহী ও উদাসীগণ দলে দলে জনকপুর ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন। নানাদেশ হইতে হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ বিবিধ উপহার প্রেরণ করিয়া থাকেন।

আমরা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এমন নিবিড় বন খুব কম দেখা যায়। জনকপুর গ্রাম হইতে প্রায় ৭ মাইল পথ বনে বনে চলিয়া গেলে পথিকেরা "ধনুখা" নামক স্থানে উপনীত হইতে পারেন, এই স্থানে সীতার সয়ম্বর হইয়াছিল এবং এই স্থানেই রাম কর্ত্তৃক হরধনুভঙ্গ ও সীতার বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বনের মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও সীতার মূর্ত্তি ও মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই বনমধ্যে "ধনুখা" নামক স্থানে আজি পর্য্যন্ত এক মহাপ্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত ধনু দৃষ্ট হইয়া থাকে; পথপ্রদর্শকেরা কহিয়া থাকেন "ইহাই ভগবান হরের ধনু, এই ধনু শ্রীরামের হস্তে ভগ্ন হইয়াছিল"।

আমরা জনকপুর ক্ষেত্রে শাকলদ্বিপী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় করিয়া জানিলাম, সে অঞ্চলে সূর্য্যাস্ত হইয়া গেলে (অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে) কোনও হিন্দুজাতি শাকলদ্বিপী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে না। অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম, তথাকার লোকের মধ্যে পুরাকাল হইতে প্রবাদ আছে যে, শাকলদ্বিপী ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যপুত্র সুতরাং সূর্য্য বর্ত্তমানেই ইহাদের ব্রাহ্মণত্ব, সূর্য্য অস্তগমনে ইহাদের ব্রাহ্মণত্ব লোপ হয়। অধিক কি বাদল হইলে যদি সূর্য্য অদৃশ্য থাকে তাহা হইলেও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা নমস্য বা প্রণম্য বলিয়া গণ্য হয় না। কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস!!

আমরা জনকপুর হইতে পুনরায় পুপ্‌ড়ি গ্রামে প্রত্যাগমন করিলাম। আসিবার সময় পথিমধ্যে দেখিলাম, একদল ব্রাহ্মণ অন্যদিক হইতে ঐ গ্রামের দিকে আগমন করিতেছিলেন। তাঁহাদের ধুতি, চাদর, জামা, ছাতা, পাগড়ী, জুতা প্রভৃতি লোহিত বর্ণের, এমন কি

তাঁহাদের সহিত সে সময়ে যাহা কিছু ছিল তাহা সমুদয়ই লোহিত—সকলি লালে লাল! কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমাদের সঙ্গের লোকদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, লোকেরা কহিল "এদেশে হিন্দু জাতির মধ্যে, বিশেষতঃ মৈথিলী ব্রাহ্মণবর্গ মধ্যে নিয়ম আছে যে, বিবাহের একমাস পূর্ব্ব হইতে এবং বিবাহের একমাস পর পর্য্যন্ত, কখন কখন একবৎসর পর পর্য্যন্ত, বর ও কন্যা লাল পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। বোধহয় এই ব্রাহ্মণেরা সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছে। এদেশে ইহাও নিয়ম আছে যে, ঘটকেরা বিবাহযোগ্য পাত্র বা পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে গেলে ও লোহিত বর্ণের পরিচ্ছদ পরে কিন্তু তাহাদের পাগড়ী শুভ্র থাকে।" এই কথা কহিয়া আমাদের সঙ্গীরা কহিল" আপনারা কখনও কি সৌরাট্‌গ্রামে গিয়াছেন? এই গ্রাম দ্বারভাঙ্গা হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "সেখানে কি হয়?" লোকেরা কহিল "অতি পুরাকাল হইতে ঐ গ্রামে (সৌরাঠে) কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড ময়দান আছে, সেই ময়দানের উপরে বহুসংখ্যক আম্র বৃক্ষ, বট বৃক্ষ, এবং পাকুড় গাছ দেখিতে পাইবেন। এই সমুদয় বৃক্ষতলে এবং একটা প্রকাণ্ড পুকুরের ধারে ত্রিহুতের মৈথিলী ব্রাহ্মণ-বিবাহ-সভা। এই সভায় মৈথিলী ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণের সংশ্রব নাই। যাহাদের কন্যা বা পুত্রের বিবাহ হয় নাই তাহারা এস্থলে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন এই কয়েক মাসে দলে দলে আগমন করিয়া থাকে, ঐ কয়েক মাসের প্রতিদিন সভায় অধিবেশন হয়। বরের বা কন্যার পিতা সভার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বরের ও কন্যার গোত্র কুল নাম বয়স রূপ অবস্থা ইত্যাদির বর্ণনা করেন; পাঁজিয়াড়েরা তাহা বড় বড় খাতায় লিখিয়া লয়। পাঁজিয়াড়গণও ব্রাহ্মণ; পাঁজিয়াড় অর্থে ঘটক। তদনন্তর ফিজ্ গ্রহণ করিয়া পাঁজিয়াড়গণ বর কন্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করে, অনুসন্ধান

সন্তোষজনক হইলে বিবাহ স্থির হয় এবং মহাদেবের মন্দিরে উভয় পক্ষ হইতে শপথের উপর যুক্তি স্থির হয়। চুক্তি ভঙ্গ হইলে, জাতি হইতে "পতিত" হইবার আশঙ্কা আছে। বিবাহ এখানে হয় না, বিবাহক্রিয়া কন্যার পিতার গৃহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সভা মধ্যে কেহ কেহ কুমারী কন্যাকে অথবা কুমার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আগমন করেন। অবিবাহিত বর কখন বা স্বয়ং আসিয়া আবেদন করেন।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "এ সভা কত দিনের?" সঙ্গীরা কহিল "বোধহয় পঞ্চশত বৎসর হইতেও অধিক পুরাতন।" আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, একথা সম্পূর্ণ সত্য। যে কোন মৈথিলী ব্রাহ্মণকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনিই কহিয়াছেন "হাঁ অতি প্রাচীন কাল হইতে সৌরাঠে আমাদের এরূপ এক বিরাট বিবাহসভা আছে।" পৃথিবীতে আর কোনও দেশে, বোধহয়, বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ সমিতি নাই।

আমরা কলিকাতা অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় মিথিলার আরও অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। সে সকল স্থানের বিবরণ বর্ত্তমান প্রস্তাবে সন্নিবিষ্ট করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। সুবিধা হইলে প্রস্তাবান্তরে তাহার বর্ণনা করিব।

সমাপ্ত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

জেবউন্নিসা।

গত বৈশাখের 'ভারতী'তে 'হিন্দু মুসলমান ও বঙ্গ-সাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক হিন্দুদিগের মুসলমান বিদ্বেষের নানা কথার অবতারণা করিয়া স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রকে জেবউন্নিসার উদার চরিত্র বিকৃত করিয়া চিত্রিত

করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'ধর্ম্মালোচনা, কাব্যালোচনা, কোরাণপাঠ এবং ঈশ্বর প্রেমের কবিতা রচনাই সংসারে যাহার একমাত্র কার্য্য ছিল, স্বয়ং অওরঙ্গজেব প্রত্যহ অবসরক্ষণ যাঁহার নিকট কোরাণ শ্রবণে এবং ধর্ম্মতর্কে অতিবাহিত করিতেন, রাজদরবারে ধর্ম্মবিষয়ে কোন কূটতর্ক উত্থিত হইলে মীমাংসার্থ যাঁহার নিকট ফকির ও দরবেশগণ সমবেত হইতেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয়া জেবউন্নিসাকে গভীর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া, তাঁহার পবিত্রমুখ হইতে হইতে নির্গত করা হইয়াছে—"জাহান্নামও মানি নাই, বেহস্ত ও মানি নাই, খোদাও জানিতাম না, দীন ও জানিতাম না।"—হায় ভাগ্য! লেখকের উক্তি সমর্থনের কিছুই নাই, কেবল কতকগুলি বাক্যজাল বিস্তার করিয়া পাঠকগণের মন গলাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা অদ্য জেবউন্নিসার তথাকথিত উদার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, ভরসা করি ভারতীর লেখক মহোদয় বিরক্ত হইবেন না।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পাঁচটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যার মধ্যে জেবউন্নিসাই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা। আলমগীরনামার লেখক মহাম্মদ কামিজ বলেন যে, ১০৪৮ হিঃ ১০ই সওয়াল তারিখে জেবউন্নিসার জন্ম হয়। তিনি অদ্বিতীয়া সুন্দরী, অসামান্যা রসিকা এবং অতিশয় চতুরা ছিলেন। তাঁহার দেহযষ্টিখানি কিছু লম্বা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল মানানসই এবং মুখ খানি গোল ছিল। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত শান্ত এবং মনোমুগ্ধকারিণী ছিল। রং ফর্শা চক্ষুযুগল কৃষ্ণতারকাবিশিষ্ট ও বৃহৎ এবং চিকুরদাম ঘন কৃষ্ণবর্ণ ছিল।

তৎকালীন ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে সৌন্দর্য্য ও কোমলতার আদর্শ, সুশিক্ষিতা এবং অনুপম রূপলাবণ্যবতী কামিনী বলিয়াছেন। জেবউন্নিসা অতি সুন্দর পদ্য রচনা করিতে পারিতেন, তিনি পারশীতে যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন, পারশী পণ্ডিতগণ তাহার বিশেষ প্রশংসা

করিয়া থাকেন। পাঠকগণের তৃপ্তির নিমিত্ত আমরা এস্থলে তাঁহার দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

হরকম্ দর আমদ্ দর জাঁহা—
আখির ব মতলব হা রসিদ।
জীর শুদ জেবুন্নিসা সা উরা
খরিদারে ন সুদ॥

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে, কিন্তু হতভাগিনী জেবউন্নিসা পৃথিবীতে আসিয়া, স্বামীসুখে বঞ্চিতা হইয়া কেবলই তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।

গুফতাম আজ এশ্‌কে বুঁতা আয় দিল চেহোমেল কর দাই।
গুফতমারা হাসেলে জুজনালা হায়ে হারনিস্ত॥

একদা কৌতুক করিয়া আমি মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—রে মন! তুই কাহাকে ভালবাসিস্? মন বলিল আমি অশ্রুকে ভালবাসি, কাঁদিবার জন্যই আমি তোমাকে ভালবাসি।

জেবউন্নিসা পারশী ও আরবীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং বাবরী (Babri), নষ্টলীক্ (Nastlik), নক্ষ (Naskh) প্রভৃতি বিবিধ লিপিকার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন। তিনি অতি যত্নের সহিত কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন এবং পরে 'হাফিজা' উপাধি পাইলে, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে ত্রিশ হাজার আসরফি পুরস্কার প্রদান করেন।

সম্রাটের উপর কন্যার বিশেষ আধিপত্য ছিল,—তিনিও কন্যাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি চারিলক্ষ টাকা আয়ের একটী জায়গীর কন্যাকে ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। জেবউন্নিসার প্রকাণ্ড পুস্ত-

কালয় ছিল, তিনি নানাস্থান হইতে উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল সংগ্রহ করিয়া লোক দ্বারা নকল করাইয়া লইতেন।

কাশ্মীর তাঁহার লিপিকার্য্যের প্রধান স্থান ছিল, তথায় তিনি কাগজ প্রস্তুত করাইতেন। পুস্তকাদি রচনা ও অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি নকলের জন্য একটী কার্য্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। দিল্লীর প্রসিদ্ধ মোল্লা সফিউদ্দীনকে, জেবুল তফ্‌সির নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সম্পাদনের নিমিত্ত তিনি কাশ্মীরে প্রেরণ করেন। মানটাখাল-উল-লাবল-গ্রন্থ কর্ত্তা বলেন যে, তিনি বিদুষী ছিলেন বলিয়া শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেন এবং প্রতিভাবান কবিদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেন। কেহ উৎকৃষ্ট কবিতা কিম্বা পুস্তকাদি লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলে তিনি তাঁহাদের গুণের সম্যক আদর করিতেন এবং নানারূপ পুরস্কারে পরিতুষ্ট করিতেন।

জেবউন্নিসা বিবাহ করেন নাই, মৃত্যু পর্য্যন্ত কুমারী অবস্থাতেই কাটাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানাজনে নানা কথা বলেন। দশ হাজারী মনসব্‌দার লাহোরের শাসনকর্ত্তা অকিল খাঁর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। জেবউন্নিসার প্রেমকাহিনী বিশেষতঃ লাহোরের শাসনকর্ত্তা সম্বন্ধীয় বহুতর প্রণয়কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

একদা একদল কুলবধূ লইয়া জেবউন্নিসা তাঁহার উদ্যান বাটিকা পরিদর্শন করিতে যান। সেই সময়ে এই উদ্যান নির্ম্মিত হইতেছিল, তখনো নির্ম্মান কার্য্য সমাধা হয় নাই। অকিল খাঁ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তথায় গমন করেন কিন্তু কোন প্রকারেই সাহাজাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া, তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া কুলি সাজিলেন এবং মস্তকে এক হাঁড়ী চূণ সুরকি লইয়া মিস্ত্রিকে দিবার জন্য উপরে উঠিলেন। উপরে মিস্ত্রিদের পার্শ্বেই অন্যান্য যুবতীগণের সহিত তাঁহাকে পাশা খেলায়

ব্যাপৃতা দেখিতে পাইলেন। কিন্তু যখন অকিল দেখিলেন যে সম্রাট-দুহিতার দৃষ্টিপথের প্রতি পড়িতেছে না, তখন তিনি বলিলেন,—'আমি তোমার সন্ধানে পৃথিবী খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।' তৎপর মিস্ত্রিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'মিস্ত্রি, চূণ লও।'

জেবউন্নিসা তাঁহাকে ছদ্মবেশে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করিলেন কিন্তু কথা গোপনে রাখিবার জন্য হাস্য দমন করিয়া উত্তর দিলেন,—'তুমি বায়ুতে পরিবর্ত্তিত হইলেও আমার কেশাগ্রভাগ স্পর্শ করিতে পারিবে না। তৎপর তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'৬, ৫, ২, ৬।' পাশা খেলিবার সময় যখন যে চালের প্রয়োজন হয়, তখন খেলোয়াররা সেই চালের নাম করিয়া পাশা ফেলে। তাই সম্রাট্‌নন্দিনী বলিলেন,—'৬, ৫, ২, ৬।'*

অকিল খাঁর সম্বন্ধে আর একটী রহস্যকর গল্প উল্লেখ না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না। তাঁহার উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত শেষ হইলে, তিনি একটী প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন করতঃ তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও লাহোরের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেন। জেবউন্নিসা তাঁহার ভৃত্যবর্গকে বলিয়া দিয়াছিলেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তাহাই দিবে। এই সংবাদ পাইয়া অকিল খাঁ একখানা কাগজে 'ছামবোসা বেছান খিথাহান' (আমি একখানি লুচি চাই) এই কথা কয়টি লিখিয়া সাহাজাদার নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ঐ কথাকয়টির গূঢ় অর্থ, আমি একটি চুম্বন চাই! সাহাজাদা ঐ কাগজেরই অপর পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইলেন,—'অজখত চাখি মদর টালাব!' অর্থাৎ বাবুর্চিখানা হইতে লও। (২)

অন্য একজন ঐতিহাসিক বলেন যে, জেবউন্নিসার অন্য একজন

(১) Muntakal ul-Labal,—Khafi Khan.
(২) Ibid.

প্রণয়াস্পদ স্ত্রীবেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া প্রাণ হারায়। সে সময়ে প্রণয়ী, প্রণয়িণীর সহিত আলাপ করিতে রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে, স্বয়ং সম্রাট সেই সময় প্রাসাদে ছিলেন। সম্রাট্ নানা কার্য্যে বহুতর গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একজন গুপ্তচর নাগরের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করে। তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যার গৃহে গমন করেন, কিন্তু কন্যা তৎসংবাদ পূর্ব্বেই অবগত হইয়া প্রিয়তমকে স্নানের জল রাখিবার বৃহৎ ডেকের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। সম্রাট্, কন্যার চাতুরী ধরিতে পারিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, আমি রাত্রে গরম জলে স্নান করিব। জলশুদ্ধ এই ডেক্ এখনই আমার সাক্ষাতে উনুনের উপর চাপাও। সম্রাট আজ্ঞা তখনই পালিত হইল, হতভাগ্য প্রেমিক-যুবক জীয়ন্তে দগ্ধ হইল। ডাঃ বর্ণিয়ার এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

শিবাজী কেন বন্দী হন এবং কেমন করিয়াই বা পলায়ন করিতে সক্ষম হন, তাহার যথার্থ বিবরণ, সম্রটের অনুগৃহীত ঐতিহাসিকগণ গোপন করিলেও, অন্যান্য নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, জেবউন্নিসাই শিবাজীর অবরোধের একমাত্র কারণ এবং তাঁহারই সাহায্যে তিনি উরঙ্গজেবের লৌহ কারাগার হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হন। একজন ঐতিহাসিক বলেন যে, উরঙ্গজেবের কন্যা পর্দ্দার মধ্য হইতে শিবজীর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কান্তিবিশিষ্ট দেহ দেখিয়া তাঁহার পক্ষপাতিনী হন এবং তাঁহার সহিত বিবাহের কথা সম্রাটকে জানান কিন্তু সম্রাট কন্যাকে তিরস্কার করিয়া অতি অবজ্ঞার সহিত সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এই হইতেই শিবাজীকে কঠিন প্রহরী বেষ্টিত করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। অবশেষে তিনি সাহাজাদার সাহায্যে পলায়নে সক্ষম হন। সাহাজাদা,—কানওয়ার খাঁ সিং, প্রহরীবর্গ ও শিবাজীর কল্পিত ব্যারামের চিকিৎসায়

নিযুক্ত ডাক্তারের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার পলায়নের পথ সহজ ও অনায়াসসাধ্য করিয়া দেন।

উরঙ্গজেব শিবাজীর পলায়নের সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হন কিন্তু যখন তিনি গুপ্তচরের নিকট সমস্ত রহস্য জানিলেন তখন তাঁহার আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি চারিলক্ষ টাকার জায়গীর ও অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য বাজাপ্ত করিয়া কন্যাকে বন্দিনী করতঃ সেলিমগড় দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। মন্দির-ই-আনমুগিরের লেখক তাঁহাকে বন্দিনী করিবার কারণ লিখিয়াছিলেন যে, জেবউন্নিসা যুবরাজ আকবরের সহিত পিতা উরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা সত্য নহে। এই অপরাধে রাজ-প্রাসাদের অপর কতিপয় স্ত্রীলোক অপরাধিনী হইয়াছিল। জেবউন্নিসার অবরোধের কারণ আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখিলাম, তাহাই সত্য। শিবাজীর মৃত্যুর পর তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন। (৩)

মুলতানের পথে পুরাতন আনারকালিবাজারের দক্ষিণে চৌবুরজি নামে যে বাড়ীটী আছে, তাহাই জেবউন্নিসার উদ্যানের প্রথম প্রবেশ দ্বার। এই বাড়ী নির্ম্মাণ সমাধা হইলে, জেবউন্নিসা মায়াবাই নাম্নী তাঁহার এক বিশ্বস্তা বাঁদী-কন্যাকে তাহা দান করেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে এই বাড়ী নির্ম্মিত হয়।

একজন ঐতিহাসিক বলেন যে, উদ্যানের এই বাড়ীটি সমাধা হইবার কালে, সাহাজাদা প্রত্যহ কার্য্য পরিদর্শন করিতে যাইতেন। যাইবার সময় পথে তিনি শুনিতেন, লোকে বলাবলি করে যে, সাহাজাদা, মায়াবাইর বাগান দেখিতে যাইতেছেন। তিনি ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন, উদ্যান-দ্বারে অবতরণ করিলে যে আমাকে আজ প্রথমে সুখী করিতে পারিবে, তাহাকেই এই বাড়ী দান করিব।

(৩) Colome Dow's History of Hindustan.

সাহাজাদা উদ্যানে উপনীতা হইয়া, ফটকের নিকট যান হইতে অবতরণ করিতেই মায়াবাই আসিয়া তাঁহার জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিল এবং তাঁহার দীর্ঘজীবন, অতুল ঐশ্বর্য্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া নানারূপ প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। সাহাজাদা তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাঁদীকন্যা মায়াবাইকেই বাড়ী দান করিলেন! ফটকের উপর নিম্নলিখিত পার্শী বয়েৎটি লিখিত আছে,—

'ব্যাগাস্ট মেয়ারাহমৎ ইন্ বাগবার মায়াবাই।
জেলুকুট্ সাহেব-ই-জেবিন্দ্ বেগাম-ই-দাওরাণ॥'

সদাশয় এবং সুবিখ্যাত রমণীরত্ন জেবুন্নিসা কর্ত্তৃক এই উদ্যান মায়াবাইকে প্রদত্ত হইয়াছে।

জেবউন্নিসা আর একটী প্রকাণ্ড উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। ইহার নাম 'বাগ জেবান্নেছা বেগান' এবং পূর্ব্বোক্ত বাগানটীর দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম নোয়াকোট। সাহাজাদা তথায় বহুতর গৃহ, হাওয়া ঘর, জলাশয়, নির্ঝরিণী এবং উদ্যানের মধ্যস্থলে নিজের জন্য একটী প্রকাণ্ড গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং প্রকাশ করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর যেন তাঁহাকে এই ঘরে সমাধিস্থ করা হয়।

দিল্লীতে বেলা ১১টা ১৩ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ তখন সুগন্ধ দ্রব্যে আবৃত করিয়া 'জেহান-আরা-বেগাম' উদ্যানে রক্ষিত হয়। এই উদ্যানের নাম সচরাচর লোকে 'বাগটিস্ হাজারি' বলিয়া জানিত। কালের কঠোর কুঠারাঘাতে বর্ত্তমান সময়ে তাহার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে।

জেবউন্নিসার মৃত্যুর সময় সম্রাট্ বিথানপুরে ছিলেন। কন্যার মৃত্যুসংবাদ অবগত হইলে, সম্রাট তখনই আদেশ করেন যে, তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে মৃতদেহ অতি সমারোহের সহিত তাঁহার জীবিতকালে নির্ম্মিত উদ্যানে লইয়া গিয়া তন্মধ্যস্থিত গৃহে সমাধিস্থ করিতে হইবে। এই

গৃহ মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত এবং বহুমূল্যবান প্রস্তর দ্বারা সুশোভিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে কেবল প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই উদ্যানের অন্যান্য গৃহগুলিও মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু এখন তাহার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

সাহারা।

আমার সে প্রথম যৌবন-চাঞ্চল্যের পূর্ণ
কোলাহলে মুখর সকল অঙ্গ; স্রোতস্বতী
পুলকচঞ্চলা উদ্দাম তরঙ্গ বক্ষে ল'য়ে
চলিত ছুটিয়া ঘিরি'ঘিরি' সর্ব্বদেহ মোর
ধমনীর মত। প্রিয়-সখী প্রকৃতি আমার,
আপনার স্নেহ-সুকোমল করে শত শত
আভরণে দিতেন সাজায় যৌবন প্রদীপ্ত
তনুখানি। জোছনা দুকুলে যবে আবরিয়া
দেহ, পরিয়া চাঁদের টিপ সমুদ্র দর্পণে
দেখিতাম সৌন্দর্য্য আপন মুগধ বিহ্বল,
মনে হ'ত এ জগতে আছে শুধু হাসি আর
গান, শুধু প্রেম, শুধু কাছে আসা আসি, শুধু
স্বপ্ন—সৌন্দর্য্যের মোহন সৃজন। নিশান্তের
শুকতারা যবে স্পর্শম্লান কুসুমের মত
আমার কুণ্ডল হ'তে পড়িত খসিয়া, মুগ্ধ
পিক গাহিয়া উঠিত তার বিদায় কাহিনী।

শিহরিয়া ফুল ফুল দেখিত চাহিয়া তারে
মোর বক্ষ হ'তে; স্বভাব-চঞ্চল প্রভাতের
লুব্ধ সমীরণ আসিত ছুটিয়া কোথা হ'তে
চুম্বনের তরে; আনন্দের শত কোলাহল
উঠিত চৌদিকে। আদরে প্রকৃতিরাণী মোর
নীলিম ললাটে দিতেন পরায়ে বালার্ক
সিন্দুরবিন্দু; আনন্দের অশ্রুজলে মুখানি
আমার ধীরে সিক্ত করি দিতেন মুছায়ে। সে
সেসময় কোথা হ'তে কবি, প্রকৃতির দুরন্ত
সন্তান আমার মুখের পানে চেয়ে, হাসিত,
গাহিত কত অপূর্ব্ব রাগিণী। মুগ্ধ মানব
জীবনের শত কাজ ফেলে আপন হৃদয়
দিয়া শুনিত সে গাথা। মধ্যাহ্নে আবার যবে
জড়ায়ে সুচারু অঙ্গ উজ্জ্বল বসনে দীপ্ত
রূপ রাশি ল'য়ে মহারাণী রাজরাজেশ্বরী
বেশে বসিতাম মহিমা-মণ্ডিত, শত ক্ষুদ্র
নর আমারি সুখের তরে সুখদুঃখ করি
বিসর্জ্জন, শত কর্ম্ম মাঝে বাঁধিত আপনা,
অবসাদে সন্ধ্যায় যখন চূর্ণ কেশরাশি
দিয়া আবরিয়া নগ্নদেহ বসিতাম একা—
আপনার সৌন্দর্য্যেরে ল'য়ে, দেখিতাম শুধু
মিলনের সুখস্বপ্ন; অতৃপ্তি বিরহ দুঃখ
আমার সে স্বপ্নরাজ্য হ'তে তাহাদের চির
নির্ব্বাসন। এম্‌নি করিয়া কত শত সুখ—
চিত্র উঠিত উদ্ভাসি। কোথা কোন দিক হ'তে

আমি প্রকৃতি সুন্দরী অসম্বৃতা মোরে
সহস্র চুম্বন পাশে ফেলিতেন বাঁধি। লাজ
ভয়ে কপোল আমার হইত রঞ্জিত। ধীরে
অতি ধীরে আনন্দ আবেশে মুদিতাম আঁখি।
মহারাণী আমি; ষড় ঋতু নম্র-সচিবের
মত সেবিত আমায় ফল ফুলে। কতদূর
দূরান্তর হতে আসিত স্তাবক বৃন্দ; আমি
শুধু সোহাগে গলিয়া তাহাদের লইতাম
পূজা; মনে হ'ত এ জগতে যাহা কিছু সব
আমারি সেবার তরে হয়েছে সৃজন। শুধু
পূজা, শুধু সুখ, আর কিছু নাই।
কেন তুমি
এলে? কেন ঐ দেবতার রূপরাশী ল'য়ে
দাঁড়ালে সমুখে! কি কুক্ষণে তোমার আলোক
-রশ্মি-রেখা পড়িল হৃদয়ে বক্ষে; নিদাঘের
তাপদগ্ধ বল্লরীর মত সুখ আশা মোর
গেল শুকাইয়া, সকল ঐশ্বর্য্য শুধু তব
নিমেষের আমাদের তরে কোথায় ভাসিয়া
গেল উদ্দাম প্রপাত বক্ষে কুসুমের মত।
সুখের বিলাসক্ষেত্র হৃদয় আমার আজি
মরুভূমি; অনন্ত অসীম শূন্য ব্যাপি দীর্ঘ
দিবানিশি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ক্রন্দনের
সাথে মিশাইছে উত্তপ্ত নিশ্বাস। রৌদ্র তপ্ত
শৈলশ্রেণী পঞ্জরের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
উঠে স্মৃতির দংশনে। পরাণের অন্তস্থল

হ'তে হু হু করি উঠে দীর্ঘশ্বাস স্ফুলিঙ্গের প্রায়
দহে তারে যে করে পরশ। কেন তুমি এলে ?
কেন কাছে এলে ? কেন না রহিলে দূরে দূরে
তোমারে বাসিয়া ভাল চাহিয়া চাহিয়া তোমা
পানে জীবনের দীর্ঘ স্বপ্ন দিতাম কাটায়ে।
তোমারে পাইব কাছে এত আশা—এত আশা
ছিলনা আমার। পোড়া রূপ, তারি আকর্ষণে
শুধু এসেছিলে নিকটে আমার। যে অগাধ
ভালবাসা ছিল এ হৃদয়ে কাল রূপ পেয়ে
দেখিলে না তায়। ক্রীড়নকে শিশুর আদর
প্রায় তাহারি আদর করে দুদিনের তরে
অবহেলে দলে চলে গেলে রেখে গেলে শুধু
শুধু মরুভূমি, সুখস্মৃতি-অতীতের ভগ্ন অবশেষ।

আমাদের দারিদ্র্য।

মানবজাতির যত প্রকার দুর্ভাগ্য আছে, তন্মধ্যে দারিদ্র্যই সর্ব্ব-প্রধান। ইহার নিমিত্ত মনুষ্য শৈশবে শিক্ষায় বঞ্চিত, যৌবনে সংসারে অকৃতকার্য্য, প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে পুণ্য এবং শান্তি বিরহিত হইয়া কষ্টে জীবনলীলা সাঙ্গ করিতে বাধ্যহয়। রোগে অকাল মৃত্যু,দুর্ভিক্ষে অনাহারে ও অনিয়মে স্বাস্থ্যনাশ, অন্ন ও অর্থচিন্তায় শরীরক্ষয়, শান্তির অভাবে সর্ব্বদা মনের বিষাদ, কেবল দারিদ্র্যজন্যই ঘটিয়া থাকে। মানব-

জাতির মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক ইহার হস্ত হইতে মুক্ত, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই ইহার কশাঘাত সহ্য করিয়া আসিতেছেন।

কি জন্য মানবভাগ্য এরূপ বিচিত্র হইয়াছে, চিন্তা করিলে বিস্ময়া-পন্ন হইতে হয়। দারিদ্র্য কি মনুষ্যের ঐশ্বরিক শাস্তি নহে ? এক ভাগ লোক ইহা হইতে মুক্ত থাকায় তাহাদিগের জীবন যেরূপ সার্থক বোধ হয়,অপর ভাগের জীবন সেইরূপ অনর্থক বিবেচিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত ভাগ যেন কেবল অনিয়মিত শ্রম করিবার এবং কষ্টে জীবনধারণ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেক বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক লোক আছেন, কিন্তু অর্থই বিদ্যা ও ধর্ম্মের পুরস্কার নহে। সুতরাং তাঁহাদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় না ; চিরকালই তাঁহারা অভাব পীড়ায় পীড়িত থাকিয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন।

দারিদ্র্যের কারণ কি ? প্রকৃতি কি সকলের প্রতি সমান দয়াবতী হইতে পারেন না ? এই সংসার রঙ্গভূমিতে কিয়ৎকালের জন্য জীবনা-ভিনয় করিতে আসিয়া সকলেই কি সমভাবে জীবনোপায় লাভ করিতে পারে না ? এতৎসম্বন্ধে সকলের শক্তি ও ভাগ্য সমান না হইল কেন ? এখানে একটী মাত্র উত্তর দ্বারা ইহার মীমাংসা হইতে পারে। ইহা জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল। পূর্ব্বজন্মে ধনবান হইয়া যে ব্যক্তি অধিকৃত ধনের সদ্ব্যবহার না করিয়া অপব্যবহার করিয়াছে, বা অন্যায় মতে ধনোপার্জ্জন করিয়াছে তাহাকে সেই কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্মান্তরে দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

কিন্তু এই উত্তর সকলের পক্ষে সন্তোষজনক নহে, জানি। কর্ম্মফল ভোগজন্য জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়, ইহা সত্য বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে না। যদিও তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে, কিন্তু সাধারণের মনে ন্যায়-

বোধ অদ্যাপি সম্পূর্ণ বিকশিত না হওয়ায় দারিদ্র্যের অন্যবিধ কারণানুসন্ধান প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। কেহ বলিবেন, দেশের অনুর্ব্বরতা কোন কোন জাতীয় মনুষ্যের দারিদ্র্যের কারণ। প্রকৃতি সকল দেশের প্রতি সমান অনুকূল নহেন। এজন্য কোন কোন দেশে জলবায়ুর প্রতিকূলতায় অনুর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়া মানবজাতির দারিদ্র্যের কারণ হইয়াছে। সে সকল স্থানে মনুষ্য শ্রম করিয়াও পর্য্যাপ্ত ধন লাভ করিতে পারে না। যে যে দেশে মরুভূমি আছে, সেই সেই দেশেই এইরূপ। আফ্রিকার মধ্যভাগ, আরব দেশের কিয়দংশ, রুসিয়াদেশের অংশবিশেষ এইরূপে মানবজাতির দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যজাত অসভ্যতার কারণ হইয়াছে।

দারিদ্র্যের অন্য কারণ মনুষ্যের শ্রমবিমুখতা। শ্রম কর, তাহা হইলে ধনবান হইতে পারিবে, ইহা একটী প্রচলিত কথা। কিন্তু এ কথা সত্য নহে। শ্রম করিলেই যদি ধনবান হওয়া যাইত, তাহা হইলে সকল দেশের শ্রমজীবী ও কৃষকগণ দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করিত না। প্রাই দেখা যায় যে এই দুই শ্রেণীর লোক পৃথিবীর মধ্যে সাধারণত দারিদ্র্যগ্রস্থ। তাহারা শ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা কষ্টে তাহাদিগের দিনপাত হয়। যাহারা সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অতিরিক্ত ধনের অধিকারী হয়, তাহাদিগকেই ধনী বলা যায়। ধনীর এই লক্ষণানুসারে কৃষক ও শ্রমজীবীগণকেই সাধারণত নির্ধন বা দরিদ্র দেখা যায়। তাহারা খাইয়া পরিয়া প্রায়ই কিছুই বাঁচাইতে পারে না। অনেকের পর্য্যাপ্তরূপে ভরণপোষণও হইয়া উঠে না।

কিন্তু মানবসমাজে কেবল যে শ্রমজীবী ও কৃষকগণই যে দারিদ্র্যগ্রস্ত, আর কোন শ্রেণীর লোক নহে, তাহাও নহে। সেবকগণের মধ্যে যাহারা নিম্নপদস্থ, তাহারাও এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া

থাকে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, দারিদ্র্যের কারণ স্বরূপে মনুষ্যের অযথা শক্তি-পরিচালনা এবং ধনের অন্যায় ব্যবহার উল্লেখ করিতে হয়। ধনবান্‌গণ ন্যায়মতে হউক, বা অন্যায় মতে হউক, যেরূপেই ধনবান্ হইয়া থাকেন না কেন, তাঁহারা প্রায়ই ধনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা শ্রমজীবীদিগের শ্রমের মূল্য এবং প্রজাদিগের করাবধারণে প্রায়ই ন্যায়বিমুখ। এক শ্রেণীর লোক জন্মাবধি দারিদ্র্য হেতু কৃষক, শ্রমজীবী, অথবা সেবক হইতে বাধ্য থাকায় ধনবানগণ তাহাদিগের অবস্থায় সুযোগ গ্রহণ পূর্ব্বক ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়াছেন। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট কর, বেতন ও শ্রমের মূল্যের হার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে; সকল কর্ম্মেই ধনবান্ দিগের যেরূপ ধনী থাকিবার সুযোগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, নির্ধনদিগের তাহা নাই। এই অন্যায়াচরণই মানবজাতির একাংশ লোকের দারিদ্র্যের যেরূপ প্রত্যক্ষ ও অবিসংবাদিত কারণ, এরূপ আর কিছুই নহে।

শক্তিহীনতাকে দারিদ্র্যের কারণ বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্যের সকল শক্তিই ন্যায়াধীন নহে। বর্ত্তমান কালে মানবজাতির মধ্যে যাহার যতদূর শক্তি, সে সেই পরিমাণে ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত শঠতা, ধূর্ত্ততা মিথ্যাচরণ ইত্যাদি বহু প্রকার অবৈধ উপায় অবলম্বিত হয়। যাহারা ঐ সকল উপায়াবলম্বনে অসমর্থ, তাহারা প্রায়ই দরিদ্র থাকিয়া যায়।

আবার অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জনের পোষকতায় ইহাও উক্ত হইয়া থাকে যে ধন যোগ্যতার পুরস্কার, সংসারের কার্য্যে যে যেরূপ যোগ্য, সে সেইরূপ ধনাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে আর অন্যায় কি? কিন্তু যোগ্যতা ও অযোগ্যতা কাহাকে বলা যায়? কৃষক, শ্রমজীবী ও নিম্নপদস্থ সেবকদিগের মধ্যে কি সকলেই অযোগ্য, কেহই যোগ্য নহে? বলা যাইতে পারে যে এই কয়েক শ্রেণীর লোক ব্যতীত আর সকল

শ্রেণীর লোকেরই শক্তি অধিক বলিয়া তাহারা অধিক পুরস্কার পায়। কিন্তু তাহা হউক, তাঁহারা না হয় ইহাদিগের অপেক্ষা অধিক ধনবান্ হউন, কিন্তু ইহারা এককালীন দারিদ্র্যগ্রস্ত হইবে কি জন্য? তাহারা না হয় বার্ষিক সহস্র সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করুন, কিন্তু ইহারা বার্ষিক শত মুদ্রাও কি জন্য সঞ্চয় করিতে পারিবে না? তাহাদিগের কি সঞ্চয়ের কোন প্রয়োজন নাই? সচ্ছন্দে ভরণপোষণ হওয়াও কি তাহাদিগের ভাগ্যে হইতে নাই? শক্তিশালী ধনবানদিগের বিবেচনার ত্রুটীতেই কি এই অন্যায়াচরণ ঘটিতেছে না?

ঈশ্বরের এই বিশ্বলীলা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ব্যাপারে পরিপূর্ণ। কেন যে সৃষ্টিতে এত দুঃখ বর্ত্তমান, তাহা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠা যায় না। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা মনে করিয়া থাকেন যে দুঃখ ব্যতীত সুখের উপাদেয়তা বোধ হয় না, সুখলাভার্থ শক্তি নিয়োজিত হয় না, এই জন্যই এত দুঃখের সৃষ্টি। অধিকন্তু দুঃখ পাপীর দণ্ড, সুখ পুণ্যবানের পুরস্কার বিধান জন্য। কিন্তু প্রথম তত্ত্বটী যেরূপ সহজে বুঝা যায়, শেষোক্তটী সেরূপ নহে। মনুষ্যের পাপপুণ্য বিচারে অত্যন্ত জটিল। ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পাপ হয়, মনুষ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও পাপ হয়। ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিলে পুণ্য হয়, মনুষ্যের নিয়ম পালন করিলেও পুণ্য হয়। এ জন্য দেখা যায় যে উভয় প্রকার নিয়ম লইয়াই নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। যে নিয়মে শরীর পালন করিতে হয়, যে নিয়মে জীবনযাপন করিতে হয়, যে নিয়মে অপত্যোৎপাদন ও অপত্য পালন করিতে হয়, সে নিয়ম ঐশ্বরিক। যে নিয়মে পানভোজনাদি করিতে হয়, যে নিয়মে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইতে হয়, যে নিয়মে ধনোপার্জ্জন ও ধন ব্যবহার করিতে হয়, যে নিয়মে ধনের উত্তরাধিকার নির্ণয় ও শ্রম পরিচালিত হয়, সে নিয়ম মানব কৃত। শরীরপালনের নিমিত্ত রৌদ্র বৃষ্টি শিশিরাদি হইতে আত্মরক্ষা করা

আবশ্যক; এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পীড়িত হইতে হয়। কিন্তু ইহাকে কেহ পাপ মনে করে না। জীবনধারণার্থ বহুপ্রকার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, অপত্যোৎপাদন করিলে তাহার পালন আবশ্যক, কিন্তু এ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মনুষ্য পাপী হয় না। কিন্তু বিবাহ না করিয়া ব্যভিচারী হইলে মনুষ্য পাপী হয়; শঠতা বা মিথ্যাচারণ দ্বারা ধনের অধিকার লাভ করিলে পাপ হয়; প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে পাপ হয়। আবার এই সকল মনুষ্যকৃত নিয়মাবলীর পালন দ্বারা মনুষ্য পুণ্যবান্ হয়, কিন্তু ঐশ্বরিক নিয়ম পালন করিয়া তাহা হয় না। আবার মনুষ্যকৃত নিয়মগুলিকে ঐশ্বরিক বলাও হইয়া থাকে।

এইরূপে আমাদিগের পাপপুণ্য বিচার বিচিত্র হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং পুণ্যের ফল দুঃখভোগ, এবং পাপের ফল সুখভোগ দেখিয়া আমরা ধর্ম্মেরই নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। মনুষ্যের সুখদুঃখবোধও বিচিত্র। দারিদ্র্যে বহু কষ্টের উৎপত্তি হইতে থাকিলেও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ অন্যায় পথে ধনোপার্জ্জন বা তন্নিমিত্ত কোন পাপাচরণ করিতে পারে না। অধার্ম্মিকগণের তন্নিমিত্ত কোন প্রকার পাপাচরণেই অপ্রবৃত্তি নাই। পাপের ফলে যখন নিশ্চিত সুখভোগ, এবং পুণ্যের ফলে নিশ্চিত দুঃখভোগ প্রত্যক্ষ হয়, তখন আর কোন ধর্ম্মের কথাই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এইরূপে জগতে নিয়ত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরোধ চলিতেছে। ধর্ম্মের স্বপক্ষ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মফলের শৃঙ্খলা অর্থাৎ পুণ্যের ফল মোক্ষ এবং পাপের ফল নরকাদি ভীষণ যন্ত্রণা বুঝাইবার জন্য ইহলোক ও পরলোকের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সহস্র প্রকার যুক্তি দ্বারাও, পুণ্যের আশু ফল দুঃখভোগ হইলেও গৌণ ফল সুখভোগ এবং পাপের আশু ফল সুখভোগ হইলেও গৌণফল দুঃখভোগ, এই বৃত্তান্তটী মনুষ্যের বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিয়া যাঁহারা

সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের দ্বারা ধর্ম্মরক্ষার উপায় আর কি হইতে পারে ?

ধনের অসদ্ব্যবহারই পৃথিবীতে মানবজাতির দারিদ্র্যের যেরূপ বলবৎ কারণ,—এরূপ আর কিছুই নহে। ধন কি জন্য, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়া উহার সদ্ব্যবহার নিরূপণ করিতে হয়। ধনের কারণ মনুষ্যের জীবন ধারণার্থে আহারে প্রয়োজন ; খাদ্যদ্রব্যাদির সংস্থাপন ধন ব্যতীত হইতে পারে না। সচ্ছন্দতার নিমিত্তেও ধনের প্রয়োজন কিন্তু খাদ্য-দ্রব্যে ও সচ্ছন্দতাদায়ক সামগ্রীতে বিলাস সুখ ভোগের ইচ্ছা কি জন্য ? কত ধন যে এই নিমিত্ত অপব্যয়িত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। মনুষ্য বিলাসী না হইয়া যদি এই সকল অপব্যয় না করে, তাহা হইলে বহুধন উদ্বৃত্ত হয়। এই উদ্বৃত্ত ধন ও ধনবান দিগের ব্যয়াতিরিক্ত ধন ন্যায়মতে দারিদ্র্য ভঞ্জনার্থ নিয়োজিত হওয়াই উচিত। তাহা হইলেই ধনের যথার্থ সদ্ব্যবহার হয়। অতএব ধনের সদ্ব্যবহার দ্বারা দারিদ্র্য-ভঞ্জনের নিমিত্ত কি কি অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ধন মনুষ্যের জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহের জন্য। এক দিকে খাদ্যদ্রব্যাদির এবং অন্যদিকে সচ্ছন্দতাদায়ক দ্রব্যাদির প্রয়োজন। কিন্তু অবস্থা-ভেদ নিমিত্ত ঐ সকলপ্রকার দ্রব্যাদির প্রয়োজন সকলের পক্ষে সমান বোধ হইয়া থাকে না। যে খাদ্য খাইয়া কৃষক ও শ্রমজীবী প্রভৃতি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ, সে খাদ্য দ্বারা ধনবান লোক দিগের জীবন সচ্ছন্দে যাপিত হয় না ; যেরূপ বাসস্থান ও দ্রব্যাদি হইলে পূর্ব্বোক্ত লোকদিগের সচ্ছন্দতা সম্পন্ন হয়,শেষোক্ত লোকদিগের পক্ষে তাহা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। কিন্তু এরূপ ভেদজ্ঞান হওয়ার কারণ অভ্যাস ব্যতীতআর কিছুই নহে। অতএব সমতার জন্য অভ্যাস কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হওয়া যে আবশ্যক, তাহা অবশ্যই বলিতে হয়। ইহাতে ধনবানগণের অনিচ্ছা

হইলে দারিদ্র্যভঞ্জনের উপায় হয় না। কেন না এই অভ্যাস সংশোধন ব্যতীত দরিদ্রদিগের দারিদ্র্যভঞ্জন জন্য যে ধনের সংস্থান আবশ্যক, তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ?

পুণ্যের প্রতি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ আছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অভ্যাস সংশোধনে অসমর্থ বলিয়াই সকলের পক্ষে পুণ্যসঞ্চয় ঘটনা হয় না। অনেক সময়ে পুণ্যের পুরস্কার এ জগতে দৃষ্ট হয় না ; সুতরাং কেবল অনুরাগ বশত যৎকিঞ্চিৎ যাহা হইতে পারে, সেইপ্রকার পুণ্য কার্য্যই সাধারণত দুই একটা হইতে দেখা যায়। মনুষ্যের দারিদ্র্যভঞ্জনের উপায় করিতে হইলে এই প্রবৃত্তির সংশোধন প্রার্থনীয়। কেবল পুরস্কারের লোভে পতিত না হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞান দ্বারা চালিত হইলে ইহাতে আর কোন বাধা থাকে না। স্বজাতীয় প্রাণীগণের দারিদ্র্যভঞ্জন আবশ্যক ; অতএব তাহাতে কোন লাভ থাকুক বা না থাকুক, তজ্জন্য অভ্যাস ও প্রবৃত্তি সংশোধন করিতে আপত্তি কি ? কর্ত্তব্যবোধ থাকিলে সকলেরই ইহা সুসাধ্য হয়। আমাদিগের দেশে ধর্ম্মানুরোধে লোকের পুণ্যানুরাগ যত অধিক, পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ নহে। কিন্তু বিদেশীয় লোকের সংস্রবে পতিত হইয়া ও বিদেশীয় রীতিনীতির অনুকরণে বাধ্য হওয়ায় প্রায় লোকেরই ঐ অনুরাগ হ্রাস হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে বিদেশীয় লোকদিগের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়াই হউক, অথবা তাহাদিগের উপর প্রাধান্য স্থাপনের অভিলাষ করিয়াই হউক, দেশীয় লোকের দারিদ্র্যভঞ্জনার্থ দেশীয় ধনবানদিগের যে কিছু আগ্রহ দেখা যায়, তাহাও অনেক স্থানে স্বার্থকলুষে কলুষিত ; সুতরাং দরিদ্রগণের তাহাতে বিশেষ কিছু উপকার নাই। কেবল স্বজাতির দারিদ্র্যভঞ্জন লক্ষ্য হইলে এত দিনে তাহা অবশ্যই সুবিধা হইত।

দান দারিদ্র্যভঞ্জনের একটী উপায় বটে, কিন্তু সকল স্থলে উহা

কার্য্যকারী হইতে পারে না। যে সকল লোক কারণ বশতঃ শ্রমে অক্ষম ও কার্য্যের অনুপযোগী, তাহাদিগের পক্ষে দান দারিদ্র্যভঞ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় বটে। কিন্তু শ্রমে সক্ষম ও কার্য্যের উপযুক্ত লোকদিগের পক্ষে শ্রমের মূল্য ও বেতনাদির বৃদ্ধিকরণই যথার্থ উপায়। শ্রমজীবী-দিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা হেতু শ্রমের মূল্য হ্রাস হইতে দেখা যায়। যেখানে শ্রমের প্রয়োজন অধিক, কিন্তু শ্রমজীবীর সংখ্যা অল্প, সেখানে শ্রমের মূল্য স্বভাবতঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্বিপরীত স্থলে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। নিম্ন সেবকদিগের পক্ষেই এই নিয়ম প্রবল দেখা যায়। অতএব কি শ্রমের মূল্যাবধারণ, কি বেতনাবধারণ, উভ-য়েই রাজহস্তক্ষেপের প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত কখনই প্রতিযোগিতা স্থলে অন্যরূপ আশা করা যায় না। দেশের রাজা ও অবস্থাবিশেষে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের উচিত যে তাঁহারা যতদূর সক্ষম হন, স্থানেস্থানে শ্রমের মূল্য ও ভৃত্যের উপযুক্ত বেতন নির্ণয় করিয়া দেন। তাহা হইলে সাধারণ লোকে অবশ্যই তদনুসারে চলিতে বাধ্য হইবে। সাধারণ শ্রমজীবী ও ভৃত্যগণের আয় নিরূপণ কালে ইহা বিবেচনা করা উচিত যে সকলেরই ভরণপোষণ নির্ব্বাহান্তে বার্ষিক শতমুদ্রা বা কিয়ৎ পরিমাণে তদধিক সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য।

ধনবান লোকদিগের চেষ্টায় এইরূপ নিয়ম প্রবল হইলে দেখা যাইবে যে যাহারা, ধনবান ও নির্ধন এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী, তাহাদিগের বহু অর্থের প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত তাহাদিগের অবস্থার হীনতা অপরিহার্য্য। এ জন্য তাহাদিগের প্রথমোক্ত উপায়ের প্রতি মনোযোগী হইয়া অভ্যাস সংশোধন করা আবশ্যক। ভৃত্য দ্বারা যে যে কার্য্য সম্পাদন করান আবশ্যক, সে সকল কার্য্য তাঁহারা স্বয়ং নির্ব্বাহ করিলে কোন ক্ষতি নাই। কঠোরতায় অভ্যস্ত হইলে শ্রম বাহুল্য ঘটিতে পারে, কিন্তু মান নষ্ট হইল এরূপ মনে করা উচিত নহে। অধিকন্তু তাঁহারা অধিকতর

যোগ্যতা লাভ করিলে অধিকতর আয়বান্ হইতে পারেন, তহাতে তাঁহা-দিগের আর আপত্তি কি?

নিম্নপদস্থ রাজসেবকগণের বেতন যে বর্দ্ধিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এরূপ হইলে রাজকার্য্য অধিকতর বিশুদ্ধ ভাবে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। এক্ষণে যেরূপ ঐ শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হইয়া থাকে, তখন আর তাহা হইতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি থাকিবে না। ইহা কি স্বাভাবিক নিয়ম নহে? নিরাপদে থাকিতে পারিলে কে আর আপদ্ কামনা করে? কিন্তু দেশের রাজা ও ধনাঢ্য সম্প্রদায় আপনাদিগের আয় অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট হইলে আর এরূপ উপায় অবলম্বিত হওয়ার আশা করা যায় না।

কিন্তু শ্রমজীবী ও সেবক বর্গের সম্বন্ধে যে উপায় দ্বারা দারিদ্র্যভঞ্জন হইতে পারে, কৃষক, শিল্পী ও বণিকদিগের সম্বন্ধে তাহা কোন উপায়ই নহে। ভূমির উৎপন্ন যাহাদিগের জীবনযাত্রার একমাত্র ভরসা, তাহারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি এবং আপনাদিগের শ্রমের উপর নির্ভর করিতেই বাধ্য। কিন্তু তাহা হইলেই যে যথেষ্ট হয়, তাহাও নহে; ভূমির সত্বা-ধিকারীগণের সহিত উৎপন্ন ভোগের সুনিয়ম ব্যতীত ইহাদিগের দারিদ্র্য ভঞ্জন হইতে পারে না। কোন স্থলে নূতন প্রণালীতে করাবধারণ, এবং কোন স্থলে কর-ক্ষমা ব্যতীত ঐ সুনিয়ম অবধারিত হইবার নহে। অত-এব এজন্য অনেক অনুসন্ধান ও সুবিচার আবশ্যক; কেবল চক্ষু মুদিয়া কর গ্রহণের চেষ্টায় থাকিলে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না।

আবশ্যক শিল্পের উন্নতি সিদ্ধ এবং অনাবশ্যক শিল্পকার্য্য রহিত হইলে শিল্পী ও বণিকদিগের উপকার হইতে পারে; কিন্তু প্রতিযোগিতা হ্রাস না হইলে ইঁহাদিগের দারিদ্র্য ভঞ্জন হইতে পারে না। এজন্য বিদেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য লক্ষ্যস্থল। এক হিসাবে বিদেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যে

হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারই নাই; তবে স্বদেশীয় ও স্বজাতির হিত কাম্য হইলে সে সকলে হস্তক্ষেপ আবশ্যক, নতুবা প্রতিযোগীতায় পরাস্ত হইয়া দারিদ্র্যগ্রস্ত হওয়া নিবারণ করা যায় না। এ নিমিত্ত দেশীয় ও বিদেশীয় গণের মধ্যে যাহাতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত না হয়, তাহা করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক নিয়ম স্থাপনের প্রয়োজন।

আমরা দারিদ্র্যভঞ্জনের কতিপয় উপায় স্থূলভাবে বর্ণন করিলাম। আশা করি, পাঠকগণের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তিগণ অন্যান্য উপায়ের বর্ণনা দ্বারা দরিদ্র সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করিবেন। পার্থীব বহু প্রকার দুঃখভোগ দারিদ্র্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য আমরা ইহাকে সামাজিক অনিষ্ট মনে করি। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে জাতীয় দারিদ্র্যভঞ্জনের উপায় জাতীয় ধনবৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এইরূপে তাঁহারা ধনীসম্প্রদায়ের ধনের অসদ্ব্যবহারের প্রসঙ্গ বিস্মৃত হইয়া যান। বস্তুতঃ জাতীয় ধনবৃদ্ধিতে সাম্প্রদায়িক দারিদ্র্যভঞ্জনের কোন উপায় হয় না, কেবল সম্প্রদায়বিশেষের তুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহাতে যে মানবসমাজের বিশেষ উপকার সিদ্ধ হয় না, তাহা না বুঝা অন্যায়।

ধনবানগণের প্রভুত্ব ও যথেচ্ছাচার নিমিত্ত সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি এক ভাগ লোকে ভাগ্যহীন হইয়া রহিয়াছে। শক্তির প্রতিকূলতাবশত তাহারা কোন কালেই মস্তকোত্তলন করিতে সমর্থ হয় নাই; কেবল এদেশের ব্রাহ্মণগণ এই নিয়মের অন্তর্গত নহেন। তাঁহারা ঘোর দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করিয়াও সে কালে ধনীদিগের দ্বারাও পূজিত হইতেন, এবং এখনও স্থলবিশেষে হইয়া থাকেন। দারিদ্র্যগ্রস্ত লোক যে সমাজে মস্তকোত্তলন করিয়া থাকিতে পারে, ইহা আর্য্যসমাজ ব্যতীত আর কোন স্থলে লক্ষিত হয় না। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোক যে অন্য কোন দেশের সমাজে ছিলেন না

তাহা বলা যায় না। গ্রীস দেশে এরূপ অনেক লোক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহারা জ্ঞানের তেজে যথার্থই এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ সদৃশ ছিলেন। তাঁহারাও দারিদ্র্যদুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া আধ্যাত্মিক মুক্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানপ্রভাবে আধ্যাত্মিক ভাবে মুক্ত, তাঁহারা এইরূপই নির্ধন হইয়াও ধনীদিগের অপেক্ষাও উন্নত সুখের অধিকারী সন্দেহ নাই।

সুখদুঃখের সূক্ষ্ম গণনায় এইরূপে দারিদ্র্যে কোন ক্ষতি নাই, বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু মানবজাতির সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে একভাগের দারিদ্র্যজন্য ধনী সম্প্রদায়কে উপদেশ দিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না। মানবজাতির হিতার্থ ইহা প্রয়োজনীয় বোধ হইয়া থাকে। ধনের একরূপ কুহকিনী শক্তি আছে; তদ্বারা জ্ঞানমাহাত্ম্যের অনেক বিপর্য্যয় সাধিত হয়। মোহাচ্ছন্ন মানবগণ ঐ বিপর্য্যয় কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ নহে। উহাতে ধনের প্রয়োজন জীবনধারণ ও সচ্ছন্দতাবিধান মাত্র নহে; প্রভুত্ব, সুযশঃ, কৃতিত্ব, সৌভাগ্য, ইত্যাদি বহু প্রকার পার্থিব ইষ্ট ধনদ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া প্রায় লোকেই ধন লোলুপ। অনেকের বিবেচনায় ধর্ম্মও ধনের আয়ত্তাধীন। ব্রাহ্মণের তপোবৃত্তি রহিত হইয়া এ কালে যে দেবদেবীর পূজায় অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, ইহাও ধনের কুহক মাত্র। যেরূপে হউক, দারিদ্র্য মুক্ত হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া এ কালে ব্রাহ্মণগণ পতিত হইয়াছেন, সুতরাং জ্ঞানমাহাত্ম্যও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতে আর তপস্যা নাই, ব্রহ্মতেজ নাই, ধনজাত নীচতার উপরেও ব্রাহ্মণের কঠোরতার প্রভাব নাই, সুতরাং দারিদ্র্যভঞ্জনের উপায় ধনীদিগেকে আর কে শিক্ষা দিবে?

শ্রী—

বারানসীধাম।

ওঙ্কার।

এ ভব ভবনে কেন নিত্য হাহাকার—
মঙ্গল ও অমঙ্গল এ কথা সকল
কেন তব বিশ্বে বিভো শুনি অনিবার!
তুমি যদি বিশ্বময় কিবা অমঙ্গল!

বেদেতে ওঙ্কার রূপে হতেছ ধ্বনীত
উছলিছে চন্দ্রালোকে পবিত্র ওঙ্কার
ওঙ্কার সবিতারূপে জগতে পূজিত
সতত ওঙ্কার বিশ্বে হ'তেছে ঝঙ্কার।

কিগাহে সাগর সদা করি কলকল!
গাহিছে বিভল প্রাণে পবিত্র ওঙ্কার
ওঙ্কার পাখিরা কণ্ঠে ঝরে অবিরল
জ্ঞানী শুধু বুঝে এই গুঢ় সমাচার।
নাহি হেথা অমঙ্গল সকলি ওঙ্কার
দাও বল সাধি কার্য্য বিভো গো তোমার!

শ্রীনগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনী।

দ্বিতীয় বর্ষ। | ১৩১০। | ১১ম সংখ্যা।

মহৎ জীবন।

(স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের এম. ডি., ডি. এল. সি. আই. ই.)

ডাক্তার সরকারে তিরোধনের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থই বুঝি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইল। ইহা কিন্তু রাজার কর্ম্ম নহে; স্বয়ং বিধাতার এ কর্ম্ম। কি উদ্দেশ্যে তিনি ইহা সম্পাদন করিয়াছেন তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তাঁহারই কুঠারে বঙ্গ আজ অঙ্গহীন। সে কুঠার বড় তীক্ষ্ণ—তাহার আঘাতে যাহা ছিন্ন হয় তাহা আর রক্ষিত হয় না। বিশ্বনাথ বৈদ্যরূপে যদি কখনও ইহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন তাহা হইলেও বোধ হয় যাহা ছিল তাহা আর হইবে না।

কিন্তু বিধাতা কি দয়া করিয়া এই অঙ্গহীন বঙ্গের দুরবস্থা মোচনে আবার যত্নবান হইবেন? আমাদের দ্বারা ত ইহার প্রতীকার হইবে না। ক্ষুদ্রকীটাণুকীট আমরা বিধাতৃদণ্ডের প্রতীকার কেমন করিয়া করিব! তিনি যাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন তাঁহাকে ত আর ফিরিয়া পাইব না। যে মহাপুরুষের গৃহে পদার্পণে পীড়িতের আর্ত্তনাদ মন্দীভূত হইয়া যাইত—দুরন্ত কাল ভীত ও

কুণ্ঠিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইত ; যাঁহার অসীম জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যানুশীলন দেখিয়া সুদূর সাগরপারস্থ পাশ্চাত্য সুধীবর্গ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই পূতচরিত আর্য্যসন্তান আজ অমরধামে পরম পিতার ক্রোড়ে সোহাগের শিশুটীর ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে কোথায় পাইব ? এক উপায়, তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হওয়া। তাহা হইলে, তাঁহাকে পাইব কি না বলিতে পারি না, তবে মনে হয় তাঁহার পবিত্র আত্মাকে সুখী করিতে পারিব। মহেন্দ্রলাল স্বর্গে থাকিয়া আমাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলে আমরা বিধাতার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি। তাঁহার জীবিতকালে আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী হইয়াছিলাম। সে ঋণ পরিশোধ করিবার শক্তি বা সামর্থ্য আমাদের নাই। তবে তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিলে আমরা পরম পিতার করুণা পাইব।

৺মহেন্দ্রলালের জীবনী লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার জীবনের কথা সকলেই অবগত আছেন। তবে প্রতিভা, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণে ভূষিত হইয়া তিনি মনুষ্য-সমাজে দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলিতেছি। তিনি আশৈশব যেরূপ ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। সট্‌ক্লিফ্‌-প্রমুখ অধ্যাপকগণ মহেন্দ্রলালের প্রতিভায় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মহাত্মা সট্‌ক্লিফ্‌ তাঁহাকে এতই ভাল বাসিতেন যে মহেন্দ্রলাল যখন বিজ্ঞান শিক্ষার্থ মেডিকেল কলেজে যাইতে চাহিয়াছিলেন তখন তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। ওরূপ ছাত্রকে তিনি নিজে না শিখাইয়া কোথায়, কাহার কাছে পাঠাইবেন ? সট্‌ক্লিফ্‌ তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। কিন্তু যখন মহেন্দ্রলাল কিছুতেই স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করিলেন না তখন অধ্যাপক মহাশয় সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। ছাত্রের উপর অধ্যাপকের এরূপ স্নেহের দৃষ্টান্ত বড় বিরল।

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন কালে মহেন্দ্রলাল অধ্যাপকদিগের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। যথাকালে এম, ডি উপাধিতে ভূষিত হইয়া তিনি দক্ষতা সহকারে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রবিশারদ্‌ হইলেও সাহিত্য, বিজ্ঞানাদিতে তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চ্চাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ছিল। তৎসাধনার্থ তিনি অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন—তথাপি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। এরূপ অলোকসামান্য অধ্যাবসায়, অদম্য উদ্যম, প্রকৃত আন্তরিকতা, গভীর কর্ত্তব্যজ্ঞান, অসাধারণ তেজস্বিতা—এদেশে একরূপ অতুলনীয়।

মহেন্দ্রলাল লব্ধপ্রতিষ্ঠ এলোপ্যাথ ছিলেন—হোমিওপ্যাথি বিষনয়নে দেখিতেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথির অসারতা প্রতিপন্ন করিবার মানসে তিনি উহার আলোচনা করিতে গিয়া উহার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিলেন। কালে হোমিওপ্যাথি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিল। তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিলে সেই প্রাচীন কথাটী মনে হয় :—

"Saul the greatest of persecutor became Paul the greatest of the disciples."

হোমিওপ্যাথির উন্নতিকল্পে তিনি কি কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। যদি তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষ হোমিওপ্যাথির প্রচারে যত্নবান না হইতেন তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গে আজ উহার এত সমাদর হইত না। সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি কেবল বঙ্গে বা ভারতবর্ষে ছিল না ; তাঁহার যশঃসৌরভ বায়ুবাহিত কুসুম-সুবাসের ন্যায় আজ সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত।

স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, অর্থলালসা শূন্যতা প্রভৃতি চিকিৎসোচিত গুণ তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল। চিকিৎসকের কার্য্য কি গুরুতর, কিরূপ হইলে

জীবন মরণের দায়িত্বের ভার গ্রহণ করিতে পারা যায়, ডাক্তার সরকার তাহা যেমন বুঝিয়াছিলেন তেমন সকলে বুঝেন না। চিকিৎসকরূপে তিনি দয়াবতার ছিলেন। কেহ কেহ, জানি না কেন, কি উদ্দেশ্য-পরিচালিত হইয়া তাঁহার সে গুণ অস্বীকার করিতেন। আজ সেইজন্য সর্ব্ব সমক্ষে মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে তাঁহার সম্বন্ধে ওরূপ নিন্দাবাদ মহাপুরুষের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার গৃহে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছি। প্রতিদিন প্রাতে শত শত রোগী তথায় অতি যত্ন সহকারে বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইত। আশা করি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র, আমার অগ্রজতুল্য অমৃতলাল পিতার সেই অতুলনীয় কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

মহেন্দ্রলাল বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনের পীড়ায় স্বয়ং পীড়িত বোধ করিতেন; এবং আপন শরীরের ভগ্নাবস্থাবশত যখন চিকিৎসার্থ বাহিরে গমন করা একরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন তখনও বন্ধুবান্ধবের বাটীতে চিকিৎসার্থ গমন করিতেন। সুস্থাবস্থায় অনেক দীনদুঃখীর গৃহে তিনি দয়াবতার রূপে আবির্ভূত হইতেন; এবং পীড়িতকে রোগমুক্ত করিয়া নির্ম্মল আনন্দ ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা করিতেন না। চিকিৎসা কার্য্যে তাঁহার আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি দেখিয়া মনে হয় তিনি মনুষ্যরূপে দেবকার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন এবং সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তৎসাধন পূর্ব্বক এখন দেবলোকে গমন করিলেন।

বিজ্ঞান সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ডাক্তার সরকার বাঙ্গালায় বিজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। ঘনান্ধকারে অকস্মাৎ বিদ্যুদ্দীপ্তি হইলে পথভ্রান্ত পথিক যেমন পথ চিনিয়া লয়, তেমনি এই অসাধারণ পুরুষ-প্রদত্ত বিজ্ঞানালোক পাইয়া অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গসন্তান উন্নতির পথ দেখিতে পাইল। বিজ্ঞান সভা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। উহা তাঁহার

সকল কার্য্যের সার কার্য্য। উক্ত সভার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধন তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। তজ্জন্য তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত নৈরাশ্য প্রতিপদে তাঁহার এ মহৎ কার্য্যের প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই উদ্যোগী পুরুষসিংহ স্থির, ধীর ও অবিচলিত ভাবে সকল বিপত্তি অতিক্রম করিয়া উদ্যমহীন সহানুভূতিশূন্য বাঙ্গালায় বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুবেরের ধন-ভাণ্ডারের অধিকারী হইলে দরিদ্র যত সুখী হয় বিজ্ঞান সভার উন্নতিতে বিজ্ঞানভিক্ষু মহেন্দ্রলাল তদপেক্ষা সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় তাঁহার বিজ্ঞান সভার সম্যক উন্নতি হইবার পূর্ব্বেই তিনি অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদরূপ মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবার পূর্ব্বে মহামতি গ্রাণলিভ সার্প যেরূপ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন ডাক্তার সরকারের ও সেইরূপ হইল। কিন্তু সার্প স্বর্গে থাকিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য ও সহকারিগণকে তিনি যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহারই বলে তাঁহার মহাব্রতের উদ্‌যাপন হইল। আমরাও আশা করি মহাত্মা মহেন্দ্রলালের এই মহাব্রত উদ্‌যাপনার্থ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী প্রাণপণে উদ্যোগী হইবেন। বিজ্ঞানসভার উন্নতি দেখিলে উহার প্রতিষ্ঠাতার স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তি হইবে।

মহেন্দ্রলাল ধর্ম্মপ্রাণ ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। ধর্ম্মে তাঁহার প্রবল আন্তরিকতা ছিল—বাহ্য আড়ম্বর দেখাইতে তিনি জানিতেন না। তাঁহার ন্যায় প্রকৃতার্থে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সংসারের অতি দুর্লভ। যিনি সত্যের সেবক, কর্ত্তব্যের পালক, দয়ার অবতার পুরুষকারের প্রতিমূর্ত্তি, বিদ্যার আকর, জ্ঞানের অবতার—তিনি যদি অধার্ম্মিক হন তবে বোধ হয় পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই। যখন তিনি জীবনের প্রান্তে আসিয়া পড়িলেন, দুরন্ত রোগ যখন তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিল তখন তিনি যে সকল সঙ্গীত

রচনা করিয়াছিলেন * তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

(১)

আমার বলিয়া মনে করি যাহা, দেখি সে সবই তোমার।
কি দিয়া তবে পূজিব হে আমি কি আছে বল আমার।
তোমারি এ ধন, দেহ প্রাণমন, সঁপিনু শ্রীপদে করহে গ্রহণ ;—
বারিধি হইতে বারিদ যেমন ঢালে তাহে বারিধারা।
অন্য কোন ধন, নাহি প্রয়োজন, স্মৃতিপথে জেগে থেক অনুক্ষণ।
একমাত্র তুমি হৃদয়ের ধন, নিত্য সত্য নির্ব্বিকার ;
তব আবির্ভাব থাকিলে স্মরণে, কি ভয় ভাবনা বিপদে মরণে,
রেখ দাসে স্থান দিয়ে ও চরণে, এই ভিক্ষা বার বার।

(২)

ভয় করো না রে মন, দেখ শমন আগমন
শত্রু নয় সে পরম বন্ধু কর তারে আলিঙ্গন ॥
এসেছে প্রভুর আজ্ঞায়, লয়ে যেতে তোমায়,
করিতে তোমার সব দুঃখ জ্বালা বিমোচন।
বাঁধা আছ ভূমণ্ডলে, কঠিন মায়া শৃঙ্খলে।
এসেছে সে কাটিতে ঐ দারুণ বন্ধন ;
দেহ পিঞ্জরের দ্বার করি উন্মোচন,
দিতে তোমার সুখময় অনন্ত জীবন।
পাইয়া নবজীবন, দেখিবে তুমি তখন
পেয়েছিলে যে সব দুঃখ যায় নাই বিফলে ;
সে সব দুঃখ হয়ে আছে নিত্য সুখের কারণ,
নহে কভু নহে কভু অনর্থক পীড়ন।

যে ভাবে তিনি কালের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত ধার্ম্মিকের পক্ষেই সম্ভব। তিনি নির্ভীকচিত্তে শয্যায় উপবিষ্ট থাকিয়া সহাস্য-

* তাঁহার রচিত দুই একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হইল

বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখের কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই—তিনি যেন সুরলোকস্থ সুখস্বপ্নে বিলীন হইয়া গেলেন।

শেষ কথা। মহেন্দ্রলালের স্মৃতিরক্ষার জন্য আমাদিগের কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। তবে যাহাতে তাঁহার আত্মার পরিতুষ্টি হয় তাহা আমাদিগের প্রাণপণে করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলিবেন তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির প্রস্তরমূর্ত্তি থাকা উচিত। আমি বলি তাহার প্রয়োজন নাই। সকল হৃদয়েই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তিনি যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে আমাদের হয়ত তৃপ্তি হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহার পবিত্র আত্মার তাহাতে তৃপ্তি হইবে না। তিনি যে কার্য্য করিতে জগতে আসিয়াছিলেন তাহার সিদ্ধিতেই তাঁহার পবিত্র আত্মা সুখী হইবে। যদি এই বিস্তীর্ণ মহানগরীতে এবং অপরাপর স্থানে বড় বড় হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়, যদি বিজ্ঞান সভায় সম্যক উন্নতি সাধিত হয় তবে, মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, মহাত্মা মহেন্দ্রলালের আত্মার আনন্দের অবধি থাকিবে না।

শ্রীহরনাথ বসু।

ভাষা ও ভাব।

ভাস্কর যেমন কোন মূর্ত্তির গঠনের পূর্ব্বে মূর্ত্তির কল্পনা মনোমধ্যে কল্পিত করিয়া প্রস্তর বা অন্য কোন নির্ম্মাণ-যোগ্য দ্রব্যে সেই মনোময়ী মূর্ত্তির বহিরবয়ব মাত্র প্রকটিত করে, সাহিত্যে প্রত্যেক সুলেখক মাত্রই

আপনার কল্পনাকে সেইরূপ ভাষার বহিরাবরণে পাঠকসমক্ষে উপস্থিত করেন। যে যেরূপ কৃতী শিল্পী, যে যেরূপ সুনিপুণ ভাস্কর, তাহার কল্পনার এই বহিরাবরণ তত উৎকৃষ্ট হয়—যে যেরূপ সুনিপুণ লেখক তাহার কল্পনা ভাষায় তদ্রূপ উজ্জ্বলরূপে ব্যক্ত হয়। কি ভাস্কর্য্য, কি চিত্রকার্য্য, কি স্থাপত্য কি কাব্য নাটকাদি সকল প্রকার শিল্প কলারই এইরূপ এক বহিরঙ্গ আছে—যাহার অভিব্যক্তির সাফল্য প্রতিভার তারতম্যানুসারে হইয়া থাকে। এইরূপ সকল প্রকার শিল্পীই স্ব স্ব শিল্প-কলায় এক আদর্শ রাখিয়া যান—ইহা তাঁহাদের শিল্পের ছাঁচ। এরূপ রচনা ও ভাষা ভাবের ছাঁচ প্রত্যেক সুলেখকের অর্থাৎ যাঁহাদের লেখা সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে—যাঁহাদের সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়—তাঁহাদের প্রত্যেকের এরূপ একটী স্বাতন্ত্র্য, এরূপ একটী বিশেষত্ব আছে—যদ্দ্বারা তাঁহাদের রচনা সহজেই রসগ্রাহী পাঠকের নিকট ধরা পড়ে—ইহা তাঁহাদের রচনা কৌশল—তাঁহাদের style।

প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরা অনেকেই এরূপ রচনা-রসিক (stylist)। তাঁহারা ভাষার সর্ব্ববিধ শৈথিল্য অতি সাবধানে দূরে পরিহার করেন। কাজে কাজেই প্রথম হইতেই তাঁহাদের রচনার এরূপ একটী ঝঙ্কার, এরূপ একটী নৈসর্গিক অবলীলা বর্ণনা ভঙ্গি এরূপ এক সুনিহিত শব্দ-যোজন-কৌশল আছে যাহা অতি প্রীতিকর, সুমোহন, সুশ্রাব্য। কাহারও রচনা 'জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্যা'—আগ্নেয় গিরির অনলস্রাব, পাঠকের মনও সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিময় করিয়া তোলে—উদ্দীপনী সমর তুরীর মত তাঁহাদের রচনাপাঠে হৃদয় বীরমদে নৃত্য করিতে থাকে। এরূপ রচনা বায়রণ, নবীনচন্দ্র,হেমচন্দ্রের। কাহারও রচনা গম্ভীর, ওজস্বী,মেঘমন্দ্রবৎ এক একটি কথায় যেন শিরা, উপশিরা কাঁপাইয়া তোলে—এরূপ রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের। কাহারও রচনা গভীরতায় অতল সমুদ্রবৎ,—অগাধ, অপার, অনন্তমেয়—অনন্তের কোন্ গুহাতলে পাঠককে লীন করিয়া

দেয় বুঝিতে পারা যায় না—সামান্য বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতির কোন গভীরতম রহস্যতলে পাঠকের মনকে নিক্ষিপ্ত করে—যেন সমাধি-মগ্ন যোগীবর—যেন তুষারমগ্ন হিমালয়—যেন গৌরীশৃঙ্গে তপোমগ্ন মহাদেব—বহিঃ-প্রকৃতিও তাঁহাদের সমাধির বিশ্ববিলোপি গভীরত্বে নির্ব্বাক্, নিশ্চল, 'নিষ্কম্পমিব প্রদীপং'—তাঁহাদের ধ্যানের গভীরতায় বিভোর তন্ময় হইয়া পড়ে—যেমন বাল্মিকী, যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, যেমন বিহারীলাল ও ইঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে, যেমন কালীপ্রসন্ন। কাহারও রচনা মহাসাগরগর্ভের ন্যায় অতল, নিদাঘের সান্ধ্য পয়োদ রাশির ন্যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ, বসন্তের প্রজাপতির ন্যায় সজীব, বহুরূপীর ন্যায় বিবিধবেশধারী। ইঁহাদের প্রতিভা সর্ব্বত্র হইতেই বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্য, বর্ণ-বিন্যাস হরণ করিয়াছে—পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি ইঁহাদের প্রতিভার মূলতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পরাস্ত হয়—এরূপ রচনা ব্যাসের, সেক্ষপীয়ের, হোমরের। কেহ কেহ আবার বাসন্তীকুসুমবৎ প্রফুল্ল, সুগন্ধি, সুকুমার, রতির নিশ্বাসবৎ, অপর্য্যাপ্ত ভাবকুসুম বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন—তাঁহাদের চিত্রশালা বিস্তীর্ণ, মনোরম, অভিলষিতদর্শন,—সে চিত্রশালায় ইন্দ্র ধনুর বিচিত্র বর্ণমাধুরী আছে অথচ অশনি নিনাদ নাই—প্রচুর বল আছে অথচ সৌকুমার্য্যের অভাব নাই—যেন কন্দর্পের পুষ্পশর, যেন সরস্বতীর সুখকুঞ্জ—এরূপ রচনা বাণভট্টের শেলীর এরূপ, রচনা রবীন্দ্র-নাথের। কাহারও রচনা জীবনের পরপারের রহস্য নির্ণয়ে কুতূহলী, পরলোকনিমগ্ন-নেত্র, অতীন্দ্রিয়-বিষয়-নিরত সুতরাং ভাষাও তদ্রূপ weird, অস্পষ্ট—যেমন কোলরিজ্ 'ম্যারিনারে' যেমন সাদি 'থ্যালেক' বা 'কেহেমা'য়, যেমন কবিগুরু ড্যান্টে, যেমন ব্রাউনিং দম্পতী।

প্রধান প্রধান শিল্পীর রচনায় ভাষা এরূপ ভাবানুযায়ী, সাহিত্যের প্রায় অধিকাংশ অমর গণের রচনা এরূপ বিস্ময়কর—তাঁহাদের ভাব ও ভাষার মধ্যে খুঁৎ বাহির করা দুষ্কর। ইঁহাদের বীণা কখনও ক্রন্দন-

শীল, কখনও মেঘমন্দ্রবৎ, কখনও সকরুণ কখনও উদ্দীপনাপূর্ণ, কখনও বিলাস-আবেগে তরঙ্গিত কিন্তু সর্ব্বত্রই ভাবানুযায়ী ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত একতানে বাঁধা। মিল্টন ও মধুসূদন প্রভৃতি এ কথার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। নন্দন কাননে আদিম মানবদম্পতীর সুখৈশ্বর্য্য দর্শনে হিংসাতুর ঈশ্বরবিরোধী শয়তানের বিবেকের বৃশ্চিক দংশন যেমন স্বাভাবিক অনুযোগপূর্ণ, পরস্পরের সাহচর্য্যে বিভোর কৃতজ্ঞ আদম ও ইভের সারল্য ও সুখের বর্ণনা যেরূপ সুখে তরঙ্গিত, মোলক্ ও বীএলজিবাব্ প্রভৃতি পতিত স্বর্গীয় দূতদিগের ঈশ্বরবিরুদ্ধে উত্তেজনা যেরূপ তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক, অজ্ঞাতপাপ প্রথমসৃষ্ট মানবদম্পতীর সূর্যোদয়দর্শনে স্রষ্টার কৃপায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের স্তব যেরূপ সরল ভক্তিরসাপ্লুত কবির নিজের অন্ধত্বের দুঃখ যেরূপ হৃদয়দ্রাবী—সর্ব্বত্রই সুন্দর, ভাবানুযায়ী। পক্ষান্তরে, বীরবাহু শোকাতুর শূরশ্রেষ্ঠ রাবণের 'শোকঝটিকা' যেরূপ গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের ক্রন্দন যেরূপ পাষাণভেদী, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অন্যায় সময়ে নিহতপ্রায় মহারথী ইন্দ্রজিতের ক্রোধ এরূপ ন্যায়সঙ্গত বীররসপূর্ণ, সরমার নিকট সীতাদেবীর তপোবন-বাস-কাহিনীর বর্ণনায় এরূপ সারল্য ও পতিপ্রাণতা অভিব্যক্ত—এইসব স্থলে সর্ব্বত্রই এরূপ ভাষা ও ভাবের আশ্চর্য্য ঐক্য ও পরিপূর্ণতা। কে না পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা শতবার পাঠ করিয়াছেন আর কেইবা শতবার পাঠেও এ সব বর্ণনার অলৌকিক মাধুর্য্যে মুগ্ধ হন নাই? এই মনোমোহন বিস্ময়কর মাধুর্য্যের মূলে উভয় কবির অনন্যসাধারণ ভাষার ও ভাবের আশ্চর্য্য ঐক্য ও সম্পূর্ণতা। মিল্টনের কোন বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন * যে উক্ত কবির ভাষা বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে "যে ছন্দের তরঙ্গিত গতি ও পূর্ণতা, যতিস্থাপনায় অদ্ভুত সাফল্য, শব্দের নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ নিপুণতা, অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কা-

* Rev Stopfard Brooke,

রের সার্থক প্রয়োগ মিল্টনীয় ভাষার সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান ও অনুকারিবর্গের নৈরাশ্যস্থল। মিল্টনের পূর্ব্বে দুই একজন ও পরবর্ত্তী অনেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন কিন্তু এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার সমকক্ষ মিলিল কই? যে সব কথা উক্ত মহাকবির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইল মধুসূদনের সম্বন্ধেও তাহা বেশ খাটে। এ কথার সপক্ষে তাঁহাদের রচনা হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করা নিরর্থক—উক্ত মহাকবিদের কাব্য পাঠকদের এ কথা অবিদিত নাই। এ সম্পর্কে ব্রুক্ সাহেব আর একটী কথা বলিয়াছেন যে, যে ভাষায় ব্যক্ত ভাব ব্যতীত অন্যান্য নানাভাব মনে উদিত হয় উহা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ভাষার লক্ষণ মিল্টনে ইহা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। উক্ত কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে more is meant than meets the ear*। উৎকৃষ্ট রচনায় এই আর একটী শ্রেষ্ঠগুণ।

কেহ কেহ আবার ভাব হইতে ভাষার প্রাধান্য দিয়া থাকেন। অনেকেই ইহার মধ্যে সুকবি কিন্তু একদেশদর্শি বলিয়া তাঁহাদের রচনা সমগ্রতা ও পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। একথা গদ্য হইতে পদ্য রচনার সম্বন্ধে সমধিক প্রযুজ্য ইংরাজী সাহিত্যে পোপের অক্ষম অনুকারকেরা যে ধরণের কবিতার আমদানী করেন—যাহা mechanical বা Hayley School বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাদের কবিতা ইংরাজ পাঠকের নিকট ক্রমে এজন্য অপ্রসিদ্ধ ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিতেছিল। কারণ একেত পোপের শব্দ যোজন কৌশল, ছন্দঃ ও মিলের সৌন্দর্য্য ও সমগ্রতা তাঁহার কবিতাকে শ্রুতি মধুর করিয়া প্রগাঢ় ভাবের অভাব দুঃখ কতক দূর করিয়াছিল তাঁহার পরবর্ত্তী অনুকারকদের সে গুণ আদৌ ছিল না। তাঁহারা কেবল মিলের (Rhyme) ঝোঁকে নিতান্ত অসহায় ভাবে দিগ্বিদিক হারাইয়া ফিরিতেন গুরুর ছন্দের সৌন্দর্য্য লাভ করা দূরের কথা ভাবেরও কিছুমাত্র সমাবেশ থাকিত না। সুতরাং

যখন কাউপার প্রভৃতি কবিগণ বাগ্‌দেবীর চরণকমল হইতে এই লৌহ-নিগড় ভগ্ন করিয়া সাহিত্যাকাশে উদিত হইলেন তখন ইংরাজ পাঠকেরা তাই তাঁহাদের এত সাদরে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। কাউপারের ভাষার শৈথিল্য ও রূঢ়তা এইজন্যই তাহারা মার্জ্জনা করিয়াছিল। আমাদের দেশের ও অনেকগুলি কবির ভাষা শিল্পের চরম। জয়দেব, বাণভট্ট, শ্রীহর্ষ, মাঘ, গোবিন্দদাস ভারতচন্দ্র ও আমাদের আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের কাব্য ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। ইহাদের প্রত্যেকেরই ভাষার সৌন্দর্য্য বিস্ময়কর। তবে এ ভাষা শিল্পের সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রভেদ ও যথেষ্ট আছে। অন্তর ও বহি প্রকৃতির যথা-যথ বর্ণনা, ভাবোৎকর্ষ ও. প্রগাঢ়তা, কল্পনার সুদূরগামিতা যাহা শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ—তাহা ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অল্পই পরি-লক্ষিত হয়। অতএব কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে যদি উক্ত সমূহ গুণরাজি গণনীয় হয় তবে কেবল ভাষার উৎকর্ষে তাঁহাদের অধিক উচ্চস্থান দিতে কোন সমদর্শী সমালোচকই সাহস করিবেন না। এটা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে জয়দেব ও ভারতচন্দ্রের ন্যায় কোন দেশের কোন কবি কাব্যোচিত ভাষাকে এমন চরমোৎকর্ষে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু এই ভাষা ছাড়া তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপা-দান কোথায়? এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

———

প্রাচীন জাপান।

আজ জগতের সমস্ত লোকে বিস্ময়চকিত নেত্রে জাপান ও রুষিয়ার সমর লীলার প্রতি চাহিয়া আছে, এসিয়া ও ইউরোপের শক্তিপরীক্ষায় এবার কোন পক্ষ জয়লাভ করে তাহাই দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। রুষিয়ার তুলনায় জাপান ক্ষুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইলেও জাপা-নের শক্তি রুষিয়ার অপেক্ষা ন্যূন নহে, এখনও তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, রুষরুক্ষ জাপানবাসীর পরাক্রম এখনও খর্ব্ব করিতে পারে নাই, কখনও যে পারিবে তাহা বোধ হয় না। ইহার একমাত্র কারণ রুষিয়ার গর্ব্ব রুষিয়ার বীরত্ব, রুষিয়ার শিক্ষা, দীক্ষা আধুনিক; জাপান অপেক্ষা বহু শতাব্দী পরে রুষিয়াবাসী অস্ত্র ধারণ করিতে শিখিয়াছে। যাঁহারা বলেন অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে জাপান উন্নত হইয়াছে, তাঁহারা যদি জানিতেন জাপানের সভ্যতা, জাপানের যুদ্ধপ্রথা, জাপানের সমাজ প্রণালী অতি প্রাচীন কাল হইতে কিরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তবে কেহই জাপানকে অর্দ্ধশতাব্দীর সভ্য বলিতে পারি-তেন না। এসিয়া ও ইউরোপের শক্তি পরীক্ষায় কোন্ পক্ষ চূর্ণ হইবে তাহা বলা যায় না কিন্তু যদি জাপান ও চীন সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তবে সমগ্র ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে পরাজিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

জাপান ইউরোপের ন্যায় অল্পদিনের সভ্য নহে—সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জাপানবাসী সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়াছে। যখন ইউরোপীয় সভ্যতার পথপ্রদর্শক মিশরবাসীগণ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, যখন প্রবল পরাক্রান্ত গ্রীক, পারসিক, রোমানদিগের সাম্রাজ্য অজ্ঞাত ভবিতব্যতার গর্ভে নিহিত ছিল, সেই সময়ে জাপানবাসী এরূপ

তীক্ষ্ণধার অস্ত্র প্রস্তুত করিতেন যে তাহার দ্বারা আঘাত করিবামাত্র একটা লৌহযষ্টি দ্বিখণ্ড হইয়া যাইত অথচ, ঐ অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার অবিকৃত থাকিত। বলিতে পারি না এই অস্ত্রনির্ম্মাণ কৌশল কোন অসভ্য মনুষ্যের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে কি না। তাই জাপানের এত তেজ, যে আধুনিক সভ্যতাভিমানী রুষঋক্ষের ভ্রুকুটীভঙ্গিকে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস বালক জাপান প্রবীণ রুষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন Japan is the rising sun of Asia—কিন্তু যাঁহারা জাপানের প্রাচীনত্ব জানেন তাঁহারা এ কথা বলিবেন না। এসিয়ার নিকট ইউরোপ বালক, এসিয়ার নিকট ইউরোপ সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে—যখন এসিয়ার অন্তর্গত টায়ার নগরে বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল সেই সময়ে ইউরোপীয়েরা বন্যপশুর অপেক্ষা অধিক সভ্য অথবা অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল না। আজ কপটতার সাহায্যে এসিয়ার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া ইউরোপ সমৃদ্ধিশালী, সভ্যতাভিমানী,—এসিয়াবাসীকে কুলী নামে অভিহিত করিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। বস্তুত ইহা বালচাপল্য ভিন্ন আর কিছুই নহে—কপটতা, প্রতারণা, চাতুরী প্রভৃতি পাপানুষ্ঠানের সাহায্যে ইউরোপবাসী যে পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, ইতিহাসই তাহার জলন্ত প্রমাণ। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে, সূর্য্যকরতপ্ত বালুকার ন্যায় ইউরোপীয় সভ্যতা এসিয়ার বিদ্যা, এসিয়ার অর্থ, এসিয়ার সামর্থ্য হইতে উৎপন্ন—সুতরাং একদিন না একদিন বৃদ্ধ এসিয়ার কৌশলে বালক ইউরোপের বাল-চাতুরী ভাঙ্গিবে। অধুনা সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে কি না কে বলিতে পারে? যে জাপান বালক বলিয়া ইউরোপীয়দিগের চক্ষে বিবেচিত হইতেছে—সে জাপান ইউরোপীয় দিগের শিক্ষাগুরু পারস্য, গ্রীস, আসিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, তাতার

প্রভৃতি প্রাচীন জাতিরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে সভ্যরূপে জগতের চক্ষে বিচরণ করিতেছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের অধিবাসীরা বন্যজন্তুর অধিক সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না কিন্তু দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জাপান সুসভ্য। নতুবা অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে একটা জাতির হঠাৎ এতটা উন্নতি হইতে পারে না। প্রাচীন জাপানের অধিবাসীর আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এই সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই একটী দীর্ঘ দ্বীপপুঞ্জের দ্বারা সংগঠিত। ঐ সকল দ্বীপপুঞ্জ আবার নানা অংশে বিভক্ত। প্রকৃত জাপান (Japan proper) ঐ সকল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত আছে। জাপান দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সমস্ত দৈর্ঘ্যে একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা গমন করিয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির শিখরদেশ তুষারাবৃত থাকে। আবার কতকগুলি আগ্নেয় পর্ব্বতও আছে—সেই সকল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও সর্ব্বদাই ঘটে। নিয়ান দ্বীপস্থিত ফুসি নামক অগ্নেয়গিরি ১২,৪৫০ ফিট উচ্চ এবং সিরোজামার উচ্চতা ৮ হাজার ফিট। অবশিষ্ট ভূভাগ সমতল না হইলেও নিতান্ত বন্ধুর নহে। জাপানের অধিকাংশ পাহাড়ের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

জাপানে প্রায়ই ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ ভূমিকম্পে নুগা ফামা (Nuga fama) নগরটী বসিয়া যায় এবং ভূগর্ভ হইতে প্রবল অনলরাশি উত্থিত হইয়া ঐ নগরের অবশিষ্টাংশ ভস্মীভূত করে। ঐ ব্যাপার সংঘটিত হইবার পূর্ব্ব কয়েক দিন হইতে নুগাফামায় ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। তাহার পর প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। ঝটিকার বেগে সমুদ্রবারি এরূপ উচ্চে উত্থিত হয় যে তাহার উত্তাল তরঙ্গমালা নগর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত গৃহই ভূমিসাৎ করে এবং সমস্ত পদার্থই ভাসাইয়া লইয়া যায়। প্রবল তরঙ্গবেগে নগরবাসী সমস্ত ব্যক্তিই ভাসিয়া গিয়া সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিল।

বিগত ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে আর একবার ভূমিকম্প হইয়াছিল। তাহাতে যে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত সংঘটিত হয় যে, তাহাহতে প্রায় সমস্ত নগর ধ্বংস হইয়া যায়। ঐ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রাজভবন এবং লক্ষ লক্ষ নগরবাসী একেবারে প্রোথিত হইয়াছিল।

এই ভূমিকম্পের ব্যাপার প্রাচীনকালে জাপানের দেবোপাসক বা পুরোহিতেরা দেবতাদিগের অসন্তোষ হইতে সংঘটিত হয় বলিয়া প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে হয় দেবতারা নতুবা দেব-প্রেরিত দৈত্য এইরূপে জাপানবাসীদিগের দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। আবার অনেক জাপানবাসী মনে করিত যে সয়তান বা দৈত্য মহামারী দুর্ভিক্ষ দৈব বিপত্তির একমাত্র কারণ।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা জাপান শব্দের নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে জাপান (Japan) এবং জাপন (Japon) হিফোঁ অথবা নিপ্পন এবং হিপ্পন হইতে এই নামের উৎপত্তি এইরূপ মনে করেন। চীন দেশের বণিকেরা জিপন (Zippon) অথবা সিপন (Sippon) নামে অভিহিত করিতেন। কিন্তু অবশিষ্ট চীনবাসিরা ইহাতে Ge-pwen অথবা Ge-puen নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ইউরোপীয়গণ জাপানের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। গ্রীক্ সাম্রাজ্যের অবনতি কালে টলিমি নামক জনৈক ভূতত্ত্ববিৎ সাতার দ্বীপের (Satyr Isles) উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগিজেরা প্রথমে এই দ্বীপের কথা জানিতে পারেন। যৎকালে আল্‌ফোন্‌জো পূর্ব্বোপদ্বীপে পোর্ত্তুগিজ রাজপ্রতিনিধি ছিলেন সেই সময় আন্‌টোনিও, ডা মোট্টা, ফ্রান্সিস ও জে মোটো এবং আণ্টোনিও পিন্সোলা নামক তিন পোর্ত্তুগিজ শ্যাম প্রদেশ হইতে চীন রাজ্যের দিকে গমন করেন। পথিমধ্যে তাঁহারা জাপান দ্বীপ পুঞ্জ প্রাপ্ত হন।

ধর্ম্ম বিস্তারের ব্যপদেশে রাজত্ব বিস্তার ইউরোপীয়দিগের একটা কৌশলের মধ্যে পরিগণিত। রোমানেরা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার এক শতাব্দীর মধ্যে তাহাদিগের দ্বারা প্রথমেই এই কৌশলের উদ্ভাবনা হইয়াছিল। তাহার পর ইউরোপীয় অন্যান্য জাতিরা এই কৌশল শিক্ষা করিয়া রাজ্যবৃদ্ধির উপায় বুঝিতে পারে। এই যে আজ ইউরোপ জগতে একাধিপত্য বিস্তার করিতেছে, মিশনরিগণ তাহাদিগের এই রাজ্যবিস্তার কার্য্যে প্রধান সহায়। কোন স্থানের সন্ধান পাইলে দয়াময় খৃষ্টভক্তেরা সেই স্থানের অধিবাসী দিগের উদ্ধার সাধন করিবার ব্যপদেশে সেই স্থানে উপস্থিত হন। সেই দেশের অধিবাসীরা অবশ্য বর্ব্বর ও অসভ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কাজেই ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত তাহাদিগকে কোন রূপেই সভ্য করা যাইবে না, তাহাদিগের উন্নতি কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না, জগতের চক্ষে এইরূপ প্রতিভাত করিবার জন্য সেই দেশের লোকচরিত্র, সামাজিক আচার ব্যবহার, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব কোন স্থানে খনি প্রভৃতি আছে কিনা, কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে ঐ স্থানটী শীঘ্রই করায়ত্ত করিতে পারা যায় তাহার সন্ধান অবগত হইবার জন্য এই সকল খৃষ্টদূত সেই স্থানে গমন করে এবং কিছু দিনের মধ্যে সেই দেশের অধিবাসীদিগের স্বাধীনতা আপনাদিগের রাজরূপী রাক্ষসের করাল কবলে ফেলিয়া দিবার সহায়তা করে।

জাপানেও পোর্ত্তুগীজেরা সেই প্রথাবলম্বন করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মজ্ঞানাঞ্জন শলাকা সহযোগে অজ্ঞান তিমিরান্ধ জাপানবাসী-দিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিবার জন্য, খৃষ্টের উদারনীতি প্রচারের দ্বারা নিগৃহীত ব্যক্তিদিগের আরও নিগ্রহভোগ সহ্য করিতে শিক্ষাপ্রদান অথচ আপনারাই সেই নিগ্রহকারীরূপে দণ্ডায়মান হইবার জন্য কয়েকজন মিশনরি জাপানে প্রেরিত হইলেন।

মিশনরিরা জাপানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জাপান দ্বীপপুঞ্জের

উপকূল নিতান্ত বন্ধুর হইলেও ঐ স্থানে এমন অনেক পদার্থ উৎপন্ন হয় যাহার দ্বারা পোর্ত্তুগিজ জাতির ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে। তাঁহারা দেখিলেন জাপান দ্বীপপুঞ্জের ভূমি বড়ই উর্ব্বর—তাহাতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হয়, এমন কি জাপানের পর্ব্বত শ্রেণীও উর্ব্বরতা বিহীন নহে। ঐ সকল পর্ব্বতে ইউরোপীয়দিগের আহারোপযোগী বহুবিধ চতুষ্পদ জন্তু এবং সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জাপানের নদীগুলির স্রোত খরতর তাহাতে দেশের মধ্যে অন্তর্বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে। কতকগুলি নদী জাপানের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া এরূপ তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছে যে সেই সকল নদীর এক পার হইতে পর-পারে উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই দুরূহ। সুতরাং সহজে সেই সকল নদী উত্তীর্ণ হইয়া নদীর পর-পারস্থিত অরাতিকুল আক্রমণ করা যায় না। কেবল তাহাই নহে তীব্রবেগবশত ঐ সকল নদী সেতু প্রস্তুত পূর্ব্বক পার হওয়াও অসম্ভব। জাপান সাম্রাজ্যের মধ্যে উজিঙ্গবা, উমি, এবং অস্কাগবা নামক তিনটি এইরূপ খরস্রোত-সমন্বিতা নদী আছে। প্রথমোক্ত নদীটি উজিন নামে অভিহিত—উহার স্রোত এরূপ প্রখর যে ঐ নদীতে সেতু নির্ম্মিত হইতে পারে না। যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে উমি নদীটী নাকি এক রাত্রির মধ্যে উৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হয়। আস্কাগজে নদীটী অত্যন্ত গভীর এবং ঐ নদী গর্ভে আবার সঞ্চলনশীল চর মধ্যে মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। পদ্মানদীতে এইরূপ সঞ্চরণশীল চরের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। যাহা হউক যে কারণে এ পর্য্যন্ত পদ্মানদীর উপরে সেতু প্রস্তুত হইতে পারিল না সেই কারণেই জাপানের এই নদীতে সেতু নির্ম্মিত হইতে পারে নাই।

জাপানে অনেকগুলি হ্রদ পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ওইট্জ উমি (Oitz Oomi or Omi) নামক হ্রদটী প্রধান। এই হ্রদটীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ২০ মাইল। বহুসংখ্যক নদীর সমবায়ে এই হ্রদটী উৎপন্ন হইয়াছে। হ্রদের দক্ষিণ পশ্চিম হইতে একটী স্রোত উমি নদী দিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এই নদী তীরে মিয়াকো নগর অবস্থিত। এই নদী চক্রগতি অবলম্বন পূর্ব্বক ওসাকা নগরের নিকট একটী উপসাগর প্রস্তুত করিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। ভূমিকম্পের প্রাবল্যবশত জাপানে অনেকগুলি হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে।

জাপানের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মিশনরি বা খৃষ্টদূতদিগের বড়ই প্রীতি জন্মিল, তাহারা ঐস্থানে ব্যবসায়োপযোগী আরও কোন্ কোন্ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তাহা পরিদর্শনে মনোযোগ করিলেন। দেখিলেন জাপানের অরণ্যসমূহে যথেষ্ট পরিমাণে সকল প্রকার হস্তী প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল হস্তী বড়ই সুন্দর এবং উহারা অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। উহাদিগের দন্তও অত্যন্ত মূল্যবান্। কেবল যে জাপানের অরণ্যমধ্যেই এই সকল হস্তী পাওয়া যায়, তাহা নহে, জাপানবাসীরা বন্যহস্তী পোষণ ও তাহাদিগের বংশবৃদ্ধির উপায়বিধান করে। মিশনরীরা আরও দেখিলেন প্রচুর পরিমাণে মৎস্যপ্রাপ্তি ব্যতীত জাপানের সমুদ্র সমূহে যথেষ্ট এসবাপ্রেস নামক একপ্রকার সুগন্ধ পদার্থ পাওয়া যায়। জাপানবাসীরা ঐ সকল বস্তুকে তিমি মৎস্যের মল বলিয়া অভিহিত করে। এতদ্ব্যতীত সমুদ্রমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লোহিত এবং শুভ্র প্রবাল, বহুমূল্য শুক্তি এবং বহুবিধ সামুদ্রবৃক্ষ ও বিবিধ শম্বুকের খোলা প্রাপ্ত হওয়া যায়, বলা বাহুল্য শম্বুকের খোলা জাপানবাসীরা উপেক্ষা করিত।

এই সকল পদার্থ ব্যতীত জাপানের সর্ব্ববিধ খনি দেখিয়া মিশনরীদিগের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহারা দেখিলেন ঐ দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণের খনি আছে। খনি ব্যতীত সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকারাশির

হইতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষত মিফন (Mephon) দ্বীপে স্বর্ণের উৎপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সম্রাটের দৃষ্টি সর্ব্বদা স্বর্ণের প্রতি আকৃষ্ট থাকায় তাঁহার অনুমতি ব্যতীত এই স্বর্ণ কেহ ব্যবহার করিতে পারে না। সম্রাট স্বয়ং রৌপ্য ৩ ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অবশিষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্য সমস্ত সাম্রাজ্যে অন্যান্য রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা ব্যবহার করেন। চীন এবং অন্যান্য জাতি যে লোলদৃষ্টিতে জাপান অধিকারে ব্যতিব্যস্ত জাপানের অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যই তাহার কারণ।

স্বর্ণ ব্যতীত রৌপ্য, তাম্র, দস্তা লৌহ এবং অন্যান্য বহুবিধ ধাতু দ্রব্যের খনি আছে, তবে স্বর্ণের ন্যায় ঐ সকল ধাতু অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। নিফনের উত্তর দিকস্থিত কাটামি নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য পাওয়া যায়। জাপানে অনেক প্রকার তাম্রের উৎপত্তি হয়, কয়েক প্রকার তাম্র এত উৎকৃষ্ট যে তাহাতে যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। অন্যান্য প্রকার তাম্র কিছু অপরিষ্কৃত এবং তাহার মূল্য সুলভ। কয়েক প্রকার তাম্র হইতে ধাতু পরিষ্কারকেরা (refiners) প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ বাহির করিয়া লয়। প্রাচীনকালে এই সকল তাম্র অন্যত্র রপ্তানী হইত। জাপানসাম্রাজ্যের মধ্যে অতি প্রাচীনকালে যে ৫টী রাজকীয় প্রধান নগরী ছিল, তাহার মধ্যে সাফসি নামক নগরে ঐ সকল তাম্র পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইত। তাম্র সকল পরিষ্কৃত হওয়ার পর এক একটী বাক্সে আবদ্ধ করা হইত। এক একটী বাক্সে ১২৫ পাউণ্ড—প্রায় ১॥ মণ—ওজনের তাম্রের দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঐ সকল বাক্স ওলন্দাজদিগকে বিক্রয় করা হইত। ওলন্দাজ বণিকেরা পৃথিবীর নানাস্থানে সেই সকল তাম্র প্রেরণ করিতেন।

জাপানে দস্তা অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে টংকিং হইতে যে দস্তা প্রেরিত হয়, তাহা অত্যন্ত শুভ্র, দেখিতে ঠিক রৌপ্যের ন্যায় এবং তাহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক। সিমাসাকা, বিগমেন, এবং বটসিউ ব্যতীত জাপানে অন্যত্র বড় একটা লৌহ পাওয়া যায় না। তাম্র অপেক্ষা লৌহের উৎপত্তি অল্প বলিয়া লৌহ-পাত্র বা লৌহনির্ম্মিত পদার্থ তাম্রনির্ম্মিত পদার্থ অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। জাপানবাসীরা ইস্পাতনির্ম্মিত সূক্ষ্মধার অস্ত্রশস্ত্র করিতে অতি প্রাচীনকাল হইতে বড়ই সুপটু। প্রাচীনকালে জাপানের ন্যায় তীক্ষ্ণ অস্ত্র পৃথিবীর কোন স্থানে প্রস্তুত হইত না। কিন্তু জাপান-বাসীরা এই সকল সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র অন্যত্র প্রেরণ করিত না। যদি কেহ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা অন্য কোন কারণে জাপান নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র অন্যত্র প্রেরণ করিত তবে রাজার বিধানানুসারে তাহাকে সর্ব্বা-পেক্ষা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। শুনিতে পাওয়া যায় যে জাপান নির্ম্মিত সিমেটার নামক অস্ত্রের দ্বারা এক আঘাতেই একটা লোহার বার বা গরাদে কাটা যাইত। কিন্তু তাহাতে সেই অস্ত্রের ধার একটু মাত্র পড়িত না। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে জাপানের প্রাচীন অধিবাসীরা কিরূপ শিল্পকুশল ও বুদ্ধিমান ছিল। পাছে আপনাদিগের নির্ম্মিত অস্ত্র শত্রুপক্ষের হস্তগত হইলে পরিশেষে সেই অস্ত্রেই আপনাদিগের ধ্বংস সাধিত হয়, এই আশঙ্কায় বোধ হয় জাপানরাজ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া উহার রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিলেন।

যে সকল ধাতু জাপানে উৎপন্ন হইত না জাপানবাসীরা সেই সকল ধাতুদ্রব্য চীনদেশ এবং অন্যান্য স্থান হইতে আমদানি করিতেন। রসাঞ্জন, পারদ, সোহাগা প্রভৃতি পদার্থ অন্যত্র হইতে জাপানে আম-দানি হইত। প্রাচীন জাপানবাসীরা প্রধানতঃ পারদের দ্বারা বহুবিধ

ঔষধি প্রস্তুত করিতেন। * এই নিমিত্ত দূরবর্ত্তী নানাস্থান হইতে তাঁহাদিগকে পারদ আনিতে হইত। বলা বাহুল্য জাপানের সমুদ্রবারি হইতে প্রভূত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। লোকে জল জাল দিয়া লবণ করিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জাপানে ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক, ভূকম্পনের প্রাবল্যে জাপানবাসীরা মনে করিত উহা দৈব নিগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মন্দ দেবতার কোপ দৃষ্টিতে ভূমিকম্প, মহামারী প্রভৃতি দর্শনে বনজাবা পুরোহিতেরা বলিতেন যে, শান্তি দিবার জন্য মন্দ দেবতা বা evil diety ঐ সকল অমঙ্গলকর কার্য্য সাধন করেন। এইরূপ দৈব নিবারণ মানসে করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে দেবোদ্দেশে নরবলি প্রদত্ত হইত। কিন্তু অতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কাহাকেও বলি দেওয়া হইত না। তা ছাড়া জাপানবাসীরা মনে করিত যে দেবমন্দির প্রভৃতি স্থানে ভূমিকম্পাদি দৈবনিগ্রহ হইতে

* ভারতবর্ষেও বহুদিন হইতে পারদের দ্বারা সমস্ত রোগের ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, রসেন্দ্রচিন্তামণি, ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত প্রভৃতি প্রধান কবিরাজী গ্রন্থের প্রচার কতদিন হইতে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। হয় ত তিব্বৎ দেশ হইতে প্রথমে ভারতবর্ষে রসায়ণ বা পারদঘটিত তান্ত্রিক ঔষধের প্রচার হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে উহা জাপানে প্রচারিত হয়। অনেকে অনুমান করেন তিব্বতই তন্ত্রোক্ত শিবের বাসস্থান এবং ঐ স্থান হইতেই ভারতে তান্ত্রিক ঔষধের প্রচলন হইয়াছে। যখন জাপানে পারদ উৎপন্ন হয় না অথচ প্রাচীন জাপানের অধিবাসীরা পারদের দ্বারা প্রায় সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতেন তখন অবশ্য অন্য কোন স্থান হইতে তাহারা ইহার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে বৌদ্ধ সময়ের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সহিত জাপানবাসী সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিল। পরন্তু যাঁহারা তন্ত্র ও তান্ত্রিক ঔষধের আধুনিকতা সপ্রমাণ করিবার জন্য অগ্রসর তাঁহারাও এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

পারে না। * এ নিমিত্ত গোতা (Gotho) সিকুবুসীমা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপ দুইটীতে বহু উৎকৃষ্ট দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শেষোক্ত দ্বীপের একটি মন্দির অত্যুচ্চ এবং বড়ই আড়ম্বর পূর্ণ। প্রাচীন জাপানবাসীরা দেবতা এবং মন্দিরগুলিকে বড়ই ভক্তির চক্ষে দেখিত এবং প্রাণপণে সেগুলিকে রক্ষা করিত। মিয়াকে নগরের নিকটে ও পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী সুন্দর দেবমন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে অন্যান্য দেবমন্দির পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে জাপানীদের মধ্যে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন ছিল। মিশনরিরা আপনাদিগের বুদ্ধি বৈপরীত্য-বশতই হউক অথবা লোকের চক্ষে জাপানের অধিবাসীদিগকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তই হউক মূর্ত্তিপূজাকে পৌত্তলিকতা বা heathenism নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যাহারা মিশনরিদিগের প্রদর্শিত আত্মোন্নতির একমাত্র উপায় যিশুখৃষ্টের মর্ম্মগ্রহণে অক্ষম অথবা খৃষ্টান নহে, খৃষ্টদূতেরা তাহাদিগকে হিদেন অর্থাৎ যথার্থ ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞ অর্থাৎ প্রকারান্তরে পশু এই সুমিষ্ট ও সগৌরব আখ্যা প্রদান করিয়া তাহাদিগের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। যখন জগতের সকল জাতি অপেক্ষা জ্ঞানগৌরবে শ্রেষ্ঠচরিত্র ভারতবাসীরাও খৃষ্টদূতদিগের চক্ষে পৌত্তলিক বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছেন তখন জাপানের ন্যায় দুর্গম স্থানের অধিবাসীদিগের প্রতি খৃষ্টদূতেরা যে অসভ্য, বর্ব্বর, পৌত্তলিক কুসংস্কারাপন্ন প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিবেন না ইহা কখনই সম্ভব নহে। আবার তাঁহারা একথাও বলিয়াছেন যে পৌত্তলিক হইলেও জাপানবাসীরা বিশ্বাস করিত যে পৃথিবী অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, যে সকল দেবতাকে তাহারা

* এদেশেও ৺কাশীধাম সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ এবং বিশ্বাস আছে যে কাশীধামে কখনও ভূমিকম্প হয় না।

পূজা করে তাহা একসময় সকলেই মনুষ্য ছিল। ঐ সকল মনুষ্য সহস্র সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন। তাহার পর তাঁহারা ধর্ম্মবলে বলবান হইয়াছিলেন। *

ভারতবাসীদিগের ন্যায় জাপানবাসীরা বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে (১) জিন্টো (xinto) নামক সম্প্রদায় তাঁহাদিগের আপন প্রাচীন দেবতাদিগকে (পূর্ব্বপুরুষ) (?) পূজা করিত। (২) সিউটো (Siutto) সম্প্রদায় তাহাদিগের দার্শনিক বা নৈতিক দিগের উপাসক ছিলেন। বড্‌জো (Bodzo) নামক সম্প্রদায় চীনদেশ, শ্যামদেশ এবং ভারতবর্ষীয় দেবমূর্ত্তির উপাসনা করিতেন। ফো (Fo) নামক দেবতা তাহাদিগের উপাস্য ছিলেন। এই সকল জাতি সূর্য্য, চন্দ্রাদিগ্রহ এবং অন্যান্য নক্ষত্রাদিও উপাসনা করিত। বলা বাহুল্য আর্য্যজাতিও সূর্য্যচন্দ্রাদি নবগ্রহ এবং কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের পূজা করিয়া থাকেন। ইহাতে মিশনরি মহোদয়দিগের বর্ণনায় নির্ভর করিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। তাঁহারা লিখিয়াছেন, "যে দেবতায় যাহার আস্থা হইত সে তাহাই পূজা করিতে পারিত। ইহাতে রাজনিয়ম অথবা পিতামাতার কোন শাসন চলিত না। এক পরিবারের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী বিভিন্ন দেবতার উপাসক এবং তাহাদিগের পুত্রকন্যারা আবার অন্য দেবতার উপাসনা করে। *

* আর্য্যদিগের পৌরাণিক কালের রাম, কৃষ্ণ, ব্যাস, মর্কেণ্ডেয়, বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ প্রভৃতি মনুষ্যগণও দেবতার ন্যায় আজিও এ দেশে পূজিত হইয়া থাকেন। বুদ্ধদেব, নানক, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মনুষ্য হইলেও লোকে অবতার বলিয়া তাঁহাদিগকে পূজা করে। জাপানে যে অবতারবাদ প্রচলিত ছিল ইহাই তাহার দৃষ্টান্ত।

বলা বাহুল্য অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে মিশনরী অথবা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা ঐরূপ ভ্রান্তমত পোষণ করেন। বৈষ্ণব, শাক্ত এবং শৈব হইলেই যে তাহার পুত্রকে অথবা তাহার পত্নীকে সেই দেবতার উপাসক হইতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। আবার পক্ষান্তরে পঞ্চ দেবতার উপাসনা হিন্দু মাত্রকেই করিতে হয়। কেবল বুঝিবার বৈপরীত্যবশত

জিন্টো সম্প্রদায় আমিদা (Amida) এবং জাকা (xaca) নামক দুইটী দেবতার উপাসনা করিত। আমিদা সম্বন্ধে জাপানবাসীদের প্রকাশিত বিবরণ এইরূপ:—বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমিদা আবির্ভূত হন। তিনি দুই সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন। লোকশিক্ষাবিধানার্থ বহু কষ্ট সহ্য করিবার পর তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্ম-লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। জাকা সম্বন্ধে প্রাচীন জাপানবাসীরা বলিতেন যে ৮ হাজার বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ২।৩ হাজার বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। জীবিতকালের মধ্যে তাহাকেও নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তিনি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ঐ সকল পুস্তক তাঁহার একটা মন্দিরে পরিদৃষ্ট হইত। অবশেষে তিনি একটা গুহার মধ্যে অবস্থিত হন এবং ঐ গুহার মুখ বন্ধ করিয়া আত্মলীলার অবসান করেন।

আমিদার পুত্র ক্যানো ও (Cano) জাপানবাসীদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। মিয়াকো নগরের নিকটে তাঁহার একটা মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই মন্দির মধ্যে তাঁহার সহস্র সহস্র মূর্ত্তি সংস্থাপিত দেখা যায়। মন্দিরটা চতুষ্কোণবিশিষ্ট। প্রত্যেক দিকে ৫ হাজার করিয়া মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি অতি উৎকৃষ্ট ভাবে খোদাই করা।

জাপানবাসীদিগের আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে বিশ্বাস

আপনাদিগের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহার দর্শনে ইউরোপীয়েরা এই দেশের অধিবাসী-দিগের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ করিয়া থাকেন। ইহা যে তাঁহাদিগের ঘোরতর ভ্রান্তি তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ কোন একটা জাতির বা সমাজের গূঢ় তথ্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাহাদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে মন্তব্য প্রকাশ ধৃষ্টতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। অথচ এহেন মিশনরী ও ঐতিহাসিককুল এদেশের সম্বন্ধে ইতিহাস প্রণয়ণ করিতেছেন। সুতরাং ভারতবাসী, জপোনবাসী এবং চীনদেশবাসীরা সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে বর্ব্বর বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে।

ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাঁহাদিগের ধারণা ছিল যে এ জীবনের পাপপুণ্যের ফলভোগ অপর জীবনে হইবে। ভারতবাসীদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে জাপানবাসীদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস যে একরূপই ছিল ইহাই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

উল্লিখিত দুইটী দেবতা ব্যতীত প্রাচীন জাপানবাসীরা কাম্বাডক্সি (Cambadoxi or Cambedoxi) নামে আর একটী দেবতার উপাসনা করিতেন। তবে তাঁহার অভ্যুদয় বহু পরবর্ত্তী সময়ে হইয়াছিল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। জাপানবাসীদের মতে তিনি প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সাফসি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনে অনেক পাপকার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষমতাবলে নক্ষত্রদিগকে ভূতলে আনয়ন করিতে এবং ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারিতেন। তাঁহার অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে জাপানবাসীরা অনেক কথাই বলিয়া থাকেন। জাপানে লিপি এবং অক্ষরের ব্যবহার তাঁহার দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে জাপানে বহুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। অবশেষে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়ায় তিনি জীবনে বীতরাগ হইয়া একটী কবর খনন করিতে বলেন এবং জীবিত অবস্থায় তাহার মধ্যে গমন করেন। তিনি প্রকাশ করেন, তাহার বহুবৎসর তন্মধ্যে অবস্থিতির পরে, জাপানে একটী অদ্ভুত চিকিৎসকের আবির্ভাব হইবে এবং সেই সময় তিনি সেই কবর হইতে বহির্গত হইবেন। অনেক জাপানবাসী ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে জাপানবাসীদিগের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা তাঁহাদিগের পাঁচটী নিয়ম বা সামাজিক বিধি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। (১) কোন প্রাণী বধ অথবা কোন নিহত জন্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। (২) চুরি করিও না। (৩) অপর ব্যক্তির শয্যা অপরিস্কার করিও না। (৪) মিথ্যা কথা

বলিও না। (৫) মদ্যপান করিও না। ইহা হইতে জাপানবাসীদিগের মহত্ত্ব সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা বলেন যে আমিদার উৎপীড়ন ভয়ে জাপানবাসীরা এই সকল কার্য্যে নিবৃত্ত ছিলেন। কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভয় অথবা বিবেচনা যে কারণেই হউক জাপানবাসীরা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় পশুমাংসভক্ষণ পূর্ব্বক জঠরানল নির্ব্বাপিত করিতেন না অথবা চুরি অথবা দস্যুতা, মিথ্যা কথা বা প্রতারণার দ্বারা আপনাদিগের স্বার্থসাধনে সচেষ্ট ছিলেন না এবং মদ্যপানের দ্বারা বর্ব্বরতার প্রশ্রয় প্রদানে ঘৃণাবোধ করিতেন ইহা ধ্রুবসত্য। ইহাতে আত্মমত প্রবল রাখিবার জন্য আপনাদিগের অবলম্বিত কার্য্যাবলীর উৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা যে সকল কূট যুক্তিই প্রদান করুন না কেন সে সকল যে নিতান্ত অসার এবং ভ্রমাত্মক এবং জগতের অন্যান্য জাতির মনে প্রাচ্য জাতিদিগের সম্বন্ধে অন্যরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করাই যে ঐ সকল যুক্তির অবতারণার একমাত্র কারণ ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইতে পারে।

জাপানের সর্ব্বত্রই সৌধ পরিশোভিত। ইহাতে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা বলেন যে কেবল জাপান কেন প্রাচ্যদেশের এমন নগর রাজধানী নাই যে স্থানে অধিক সংখ্যার অট্টালিকা পরিদৃষ্ট হয় না। এমন কি প্রাচ্য প্রান্তর, পর্ব্বত এবং মরুভূমি পর্য্যন্তও সৌধ পরিব্যাপ্ত। এই সকল বাটীতে বহুবিধ লোক এবং নানাবিধ সাধুসন্ন্যাসী বাস করিয়া থাকে।

প্রাচীনকালে মিয়াকো নগরে ৬০টী দেবমন্দির ছিল। ঐ সকল দেবমন্দিরে ৪ সহস্রের অধিক দেবমূর্ত্তি দেখা যাইত। মিয়াকো নগরের প্রধান দেবমন্দিরটী আমূল প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহা একটী উচ্চ

পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক দিকে অবতরণ করিবার জন্য ৫০টী করিয়া প্রস্তর সোপান আছে।

মিয়াকো হইতে জারা নগরে যাইতে সময় লাগে। ঐ স্থানের মঠ এবং দেবমন্দিরগুলি বড়ই সুদৃশ্য এবং কারুকার্য্যবিশিষ্ট। দেবমন্দিরগুলিতে তামের কারুকার্য্য খচিত রহিয়াছে। একটী মন্দির যে সিংহাসনে দেবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাহার উচ্চতা ৭০ ফিট বা অন্যূন ৪৭ হাত উচ্চ এবং প্রস্থ ৮০ ফিট বা ৫৩ হাতের ও অধিক। ১৪ জন লোকে সেই সিংহাসনে বসিতে পারে। যাহা হউক প্রাচীনকালে জাপানের সর্ব্বত্র দেবমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইত। দেবমূর্ত্তিসমূহ বিভিন্ন প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট—স্বর্ণ দীপের আলোকে এবং সুগন্ধি ধূপ ধূনার দ্বারা ঐ সকল দেবমূর্ত্তির পূজা হইত।

দেবমূর্ত্তিসমূহের বাৎসরিক উৎসব এবং মৃতব্যক্তিদিগের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে জাপানবাসীরা নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক করিতে ভাল বাসিত। এই সকল উৎসব ক্রিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের প্রচলিত প্রথার ন্যায় অনুষ্ঠিত হইত। বলা বাহুল্য খৃষ্টদূতদিগের মহিমায় এবং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদিগের বর্ণনা ও কূটযুক্তি কৌশলে ঐ সকল প্রথা বর্ব্বরোচিত বলিয়া প্রতিপন্ন। খৃষ্টীয় ১৫৫২ সালে পোর্ত্তুগিজ বণিকেরা জাপান দ্বীপপুঞ্জের সন্ধান পান, এবং ঐ স্থানে অধিবাসীদিগের বর্ব্বরতা দর্শনে তাহাদের মনে বড়ই করুণার সঞ্চার হয়। বলা বাহুল্য তাহারা অচিরে অন্ধকারাচ্ছন্ন জাপানে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রচলনের নিমিত্ত কৃত সংকল্প হন এবং জাপান বাসীদিগের কুসংস্কার দূরীভূত করিবার জন্য কয়েকজন জেসুট বা পাদরী জাপানে প্রেরণ করেন। মা কাউ হইতে ফ্রান্সিস জেভিয়র নামে এক পাদরী প্রথমে জাপানে গমন করিয়া সেখানকার শিক্ষিত অধিবাসিদিগের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করেন।

অনতিকাল মধ্যে খৃষ্টদূতদিগের কার্য্যে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা জাপানের অন্ধ খঞ্জ অনাথদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতির দ্বারা জাপানবাসীদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষীয় ইতর জাতীয় ও অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ন্যায় জাপানবাসীরা দলে দলে দলে খৃষ্টীয় আলোক পাইয়া ক্রীশ্চান হইতে লাগিল। ৫০ বৎসরের মধ্যে জাপানের বহু দেবমন্দির ভূমিসাৎ এবং তৎপরিবর্ত্তে অনেকগুলি গির্জ্জা সংস্থাপিত হইল। সমস্ত জাপান হইতে মূর্ত্তিপূজার অন্তর্দ্ধান হইবার উপক্রম করিল। সমস্ত জাপান খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে উন্মুখ হইয়া উঠিল।*

এইরূপ অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে জাপানের চিরপ্রচলিত প্রথার অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে লোকের শান্তি ভঙ্গের উপক্রম হইল। তখন লোকের চক্ষু ফুটিল, সকলে মিশনরীদিগের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। জাপানবাসীরা জানিতে পারিল খৃষ্টীয় আলোক বিস্তারের ব্যপদেশে খ্রীষ্টদূতগণ জাপানরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্পেনদেশের অধিপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মিশনরিরা তাঁহাকে জাপানের অধীশ্বর করিবার চেষ্টায় আছেন। অবশ্য মিশনরীদিগের উপর যে দোষের আরোপ হইয়াছিল তাহার কতটা সত্য তাহা বলা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান চীন বিভ্রাট প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয় যে পাদরীরা ইউরোপীয় নৃপতি বৃন্দের রাজ্য বিস্তারের দূত ব্যতীত আর

* অবশ্য জাপানের অবস্থা ঐ সময়ে কিরূপ হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। খ্রীষ্টান মিশনরীদিগের সহায়ে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা অবশ্য সেই সময়ের অবস্থা ঐ রূপেই প্রকাশ করিয়াছেন। "Their idols all demolished, their temples turned into churches, and the whole realm submitted to the Pope's authority." —কথাগুলি, যে সমস্ত সত্য তাহা বোধ হয় না। যাহা হউক ৫০ বৎসরের মধ্যে জাপান সাম্রাজ্যের যে পাদরী সাহেবদিগের মাহাত্মে একটা মহাধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল

কিছুই নহে ধর্ম্ম বিস্তারের ব্যপদেশে রাজত্ব বিস্তার করেন বলিয়া পাদরী দিগের সর্ব্বত্র সাতখুন মাপ। পাদরীদিগের এত মান—এবং উহাঁদিগের সর্ব্বত্র জয়।

যাহা হউক পাদরীদিগের কার্য্য কলাপ দর্শনে জাপানবাসীদিগে চক্ষু ফুটিল, তাঁহারা মিশনরীদিগের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার নিতন্ত বিরক্ত হইল। তখন রাজাদেশে মিশরীদিগকে হত্যা করা হই- তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠীত গির্জ্জাগুলি জাপানবাসীরা ধ্বংস করিয়া ফেলিল। কেবল তাহাই নহে। যে সকল জাপানবাসী খৃষ্টান হইয়াছিলেন তাহাদিগের বিনাশ কার্য্যও সেই সঙ্গে সাধিত হইল। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়। তদবধি বৈদেশিকদিগের প্রতি বিশেষত ইউরোপীয় খৃষ্টান দিগের প্রতি জাপান বাসীর ঘোরতর অবিশ্বাস হয়। রাজবিধানে বৈদেশিক মাত্রেরই জাপানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। জাপান সম্রাট কঠোর আদেশ করেন যে কোন বৈদেশিক জাপানে গমন করিলেই তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

এই পাদরি এবং খৃষ্টান হত্যা ব্যাপার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন যে পাছে জাপানের অধিবাসীরা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসে এই আশঙ্কায় একটা মিথ্যা কলঙ্কের আরোপ করিয়া জাপান সম্রাট মিশনরিদিগের হত্যা সাধন করিলেন। কথাটা কতদূর সম্ভবপর তাহা বিচার সাপেক্ষ। অধিক কথা না বলিয়া এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বিনা অপরাধে যদি এই পাদ্রী হত্যা ব্যাপার সম্পাদিত হইত তাহা হইলে ইউরোপীয় জাতিনিচয় কখনই জাপানে সম্রাটকে এই গর্হিত এবং নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দান করিতেন না। পোর্ত্তুগিজেরা ঐ সময়ে ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের প্রতি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খ্রীষ্টদূতদিগের সেই সকল অমানুষিক বর্ব্বর প্রথানুমোদিত অত্যাচারের কথা পাঠ করিলে অতি বড় পাষণ্ডের হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হয়। জাপানে যে খৃষ্টদূতেরা সেরূপ পাশবলীলা সম্পাদন করেন নাই তাহারই বা প্রমাণ কি? মোট কথা মিশনরিরা তথায় ধর্ম্মপ্রচারের ব্যাপদেশে স্পেন রাজ্যের রাজ্যবিস্তারোদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন, জাপানবাসীরা পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়ায় জাপান সাম্রাজ্য ইউরোপীয় সভ্যতাবিস্তারপ্রয়াসী আত্মোদরপরায়ণ খৃষ্টানদিগের করকবলিত হইতে পারিল না। নতুবা এতদিনে দেখিতাম ইউরোপীয় জাতির বিজয় বৈজয়ন্তি জাপানসাম্রাজ্যের উপর উড্ডীন হইতেছে। ইউরোপীয়দিগের চাতুর্য্যপূর্ণ কৌশলজালে আবদ্ধ জাপানবাসী কাপুরুষ নামে অভিহিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের পদসেবাবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইউরোপীয় জাতির কশাঘাতে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়াও চীৎকার ধ্বনিতে জ্বালা নিবারণে বঞ্চিত রহিয়াছে।

যাহা হউক এই ভীষণ ঘটনা সংঘটিত হইবার পর জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের ধ্বজা চিরদিনের নিমিত্ত ধ্বংস হইল। খৃষ্টধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে না পারায় আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা পূর্ব্বক জাপানবাসী ইউরোপীয় জাতিদিগের চক্ষে অসভ্যরূপে প্রতিভাত হইল। আর আমরা ইউরোপীয় আচার্য্যদিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জাপানের প্রকৃত তথ্য অবগত না হইয়াই জাপানকে অসভ্য নামে অভিহিত করিলাম কিন্তু যে জাতি সভ্য নামধারী কৌশলপরায়ণ প্রতারকদিগের চাতুরী ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যদি তাঁহারা অসভ্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন আর যাঁহারা পর পাদুকালেহনে ক্লান্ত হইয়া, পরপদদলিত হইয়াও আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া গৌরবান্বিত হন, তবে সভ্য এবং অসভ্যের মধ্যে মর্য্যাদা কাহার অধিক তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। বলা বাহুল্য এই মিশনরিহত্যা

ব্যাপারের পর ইউরোপীয় কোন জাতিই আর ধর্ম্মপ্রচারের ব্যপদেশে রাজ্য-বিস্তারের আশায় জাপানে পাদরী প্রেরণে সাহসী হন নাই। কাজেই ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদিগের নিকট জাপানসম্রাট যথেচ্ছাচারী এবং জাপানবাসী বর্ব্বর বলিয়া পরিচিত। অপর জাতির চক্ষে জাপান বাসী দিগকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ইউরোপীয় উদার ঐতিহাসিকেরা তাঁহাদিগের চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী অলীক দোষারোপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন কি না তাহা ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

জাপান।

বিপুল বারিধিবক্ষে মরকতমালা,
এসিয়া জলদদেহে উজল বিজলি,
হ্রস্বকায় নরের বিরাট কর্ম্মশালা,
অন্তরে অনলধারী ক্ষুদ্রদ্বীপাবলি,

ধর্ম্মে ভারতের শিষ্য, কর্ম্মে য়ুরোপের
শাসিছে সাগর উর্ম্মি তোমার সন্তান,
উদ্ধত চূর্ণিতে গর্ব্ব দর্পিত রুষের
করাল রাহুর যেন শশী নবপ্রাণ,

দেখ রে জগত করি নয়ন বিস্তার
যুঝিছে তণ্ডুল আজি মন্তমাংস সনে,
করিছে শ্বেতাঙ্গ ঋক্ষে পীতাঙ্গ প্রহার,
উদ্দীপ্ত পূরব আজি নবীন তর্পণে।
কর তুমি এসিয়ার প্রশান্ত পরাণ,
প্রশান্ত সাগরবাসী প্রমত্ত জাপান।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ.

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণাকেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০০০৯

সমালোচনা।

দ্বিতীয় বর্ষ। | ১৩১০। | ১২শ সংখ্যা।

হীরাপ্রভা।

উপন্যাস।

সমালোচনা।

কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে বসিলে পাঠককে গ্রন্থকারের ছাত্র শ্রেণী-ভুক্ত হইতে হয়। গ্রন্থকার ও পাঠক এতদুভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধ ব্যতীত আরও একটী সম্বন্ধ আছে, সেটী সমালোচনার। পাঠক যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে অবশ্যই সমালোচনা করিতে বাধ্য। ইহাতে গ্রন্থকার ও পাঠক উভয়েরই উপকার আছে। গ্রন্থরচনা দ্বারা গ্রন্থকার কি শিক্ষা দিতেছেন, এবং ছাত্র কি বুঝিতেছেন, তাহা সাধারণের গোচর করিলে সাধারণেও বিচার করিয়া পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়া দিতে পারেন এই উদ্দেশ্যেই আমি গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সমালোচনা দোষগুণের বিচার। ইহাতে সকল পাঠকেরই অধিকার আছে। একজন কোন গ্রন্থের সমালোচনা করিলে যদি তাহাতে সকল পাঠকের একমত না হয়, তবে অন্য পাঠক ঐ সমালোচনার

প্রতিবাদ করিতে পারেন, অথবা পৃথক্ সমালোচনা দ্বারা সাধারণ পাঠক-বর্গকে উভয় সমালোচনার তারতম্য বুঝাইয়া দিতে পারেন। তদ্দ্বারাও গ্রন্থপাঠের আবশ্যকতা বা অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। যাহা হউক, গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য যদি মঙ্গল সাধন হয়, তাহা হইলে সমালোচনা দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হওয়ার পরিবর্ত্তে বরং প্রশস্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা ইহা বুঝেন, তাঁহারা এই প্রকার কার্য্যে অসন্তোষের পরিবর্ত্তে যে সন্তোষ লাভ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হীরাপ্রভা বিচিত্র উপন্যাস, তাহা যে কোন সমালোচক সমালোচনা রম্ভ করিবার পূর্ব্বেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। বঙ্গভাষায় এরূপ বিচিত্র ও বৃহৎ উপন্যাস অল্পই প্রণীত হইয়াছে। বিখ্যাত আরব্যোপন্যাস যে শ্রেণীর, ইহা আবকল সেই শ্রেণীর না হইলেও ইহাতে কৌতূহলোদ্দীপনের চেষ্টা অল্প হয় নাই। উপন্যাস রচনার শ্রেণীভেদ করিয়া বিচার করিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণী সাধারণতঃ লক্ষিত হয়—(১) আখ্যায়িকা বা উপাখ্যান, (২) নিরবচ্ছিন্ন উপন্যাস। প্রথম শ্রেণীর রচনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা সেইরূপ কল্পনাকে আমোদিত করে। প্রথমটী ঐতিহাসিক বা সামাজিক ঘটনা সমষ্টির অবলম্বনে রচিত হয় বলিয়া কেবল মনুষ্যের কল্পনাশক্তিকে আমোদিত করিয়াই তৃপ্ত হয় না; স্বভাবচিত্রের গুণে উহাতে মনুষ্যের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কেননা সহৃদয়তা হৃদয়বান্ মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। ঐ শ্রেণীর গ্রন্থকারগণ তদুপায়ে মানবের হৃদয়বৃত্তির সঙ্কোচ বা সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, এইরূপ শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঐতিহাসিক বা সামাজিক উৎকৃষ্ট উপন্যাস সকল এইরূপে বিশেষ আদৃত হয়। ইহাতে কাব্যের অংশও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে বঙ্গের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপে

প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সামাজিক উপন্যাস সকলের মধ্যে "স্বর্ণলতা" প্রণেতা ও "কল্পতরু" প্রণেতা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

আমাদিগের সমালোচ্য গ্রন্থখানি ঐ শ্রেণীর নহে। ইংরাজী ভাষায় লিখিত অপূর্ব্ব রহস্য সকলের ন্যায় ইহা লিখিত হইয়াছে। এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে বিশুদ্ধ কল্পনাপ্রসূত রচনা সকল কল্পনাকে আমোদিত করিবার জন্যই রচিত হইয়া থাকে। আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস প্রভৃতি কেবল মনুষ্যের কল্পনাশক্তির স্ফুরণ প্রদর্শন জন্য, সুতরাং কৌতূহলোদ্দীপন ব্যতীত উহাতে প্রায় আর কোন গুণই পরিদৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু এই শ্রেণীর রচনায় মনুষ্যের অন্তঃসংশোধনও গ্রন্থকারগণের লক্ষ্য নহে। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ যথেচ্ছা কল্পনাবলে রচিত হওয়ায় অনেক স্থলে অশ্লীলতা-দোষে দূষিত হইয়া থাকে। ইহাতে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উপকার সিদ্ধ না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। অনেকে মনে করিতে পারেন "নবেল" বা "মিষ্টী" পাঠ কেবল আনন্দে সময় কাটাইবার জন্য। মনুষ্যের এমন অনেক সময় আছে, যাহা, যে কোন প্রকারেই হউক, গত হইলেই মনুষ্য তৃপ্ত হইয়া থাকে। বহুপ্রকার ক্রীড়া বা বাসনাশক্তি এইরূপে ঘটনা হয়। ইহা যে যথার্থই দোষাবহ, তাহা জ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনার পক্ষপাতী নহি, যদি এইমাত্র বলাতেই সমালোচিত গ্রন্থের অগৌরব হয়, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

কিন্তু "হীরাপ্রভা" গ্রন্থখানি বাস্তবিক চলিত রহস্যগ্রন্থাবলী বা উপন্যাস সকলের ন্যায় অসার নহে। ইহাতে লেখকের কল্পনানুসারে "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ" এই প্রাচীন বাক্য সমর্থিত হইয়াছে; সুতরাং পাঠকের ইহা পাঠে ধর্ম্মে আস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। আর, ইহাতে অশ্লীলতা দোষ নাই। মানব স্বভাবের কদর্য্যতা ও ধনাঢ্য শ্রেণীর লোকের সাধারণ পাপপ্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া লেখক সাধারণকে ইহা

শিক্ষা দিয়াছেন যে অর্থ যে কোন অবস্থাতেই মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অধীন না হইলে অধর্ম্মের ও অনর্থের হেতু হইয়া থাকে। এ শিক্ষা সাধারণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষিত হইয়াও কর্ম্মক্ষেত্রে মানবগণ এই শিক্ষাভাবে ভ্রষ্টতার পথে পদার্পণ করিয়া থাকেন।

মানবচরিত্র মানবের অধ্যয়নের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এতদুভয়ই সনাতন ব্রহ্মের অঙ্গবিস্তার; সুতরাং ঈশ্বরানুরক্ত বা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণও এই উভয়কে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে উভয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ হইতে হয়। যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে মানব সমাজে সংমিশ্রিত থাকিয়া মানবচরিত্র সর্ব্বাংশে পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ পান, তাঁহারা চিন্তাশীল ও কর্ত্তব্য পরায়ণ হইলে মানবজাতির শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত উভয় শ্রেণীর উপন্যাস রচনাতেই মানবচরিত্র বিশেষ অবলম্বন। সুতরাং উভয় শ্রেণীর উপন্যাস রচনাই—সুশিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

এইরূপ সুযোগ পাইয়া গ্রন্থকার যে তাহার সদ্ব্যবহার এককালীন করিতে পারেন নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে মানব স্বভাবের সুচিত্র হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না। মানবস্বভাব চিত্রিত করিবার সময় গ্রন্থকারগণ দুই প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন;—(১) অবিকল চিত্র, (২) সংশোধিত চিত্র। অবিকল চিত্র প্রদর্শন দ্বারা মানবদিগকে মানবচরিত্র অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয় মাত্র; সংশোধিত চিত্র প্রদর্শন দ্বারা মানব স্বভাব সংশোধনে শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সকল গ্রন্থে এইরূপ মানব স্বভাব চিত্রিত হয়, উহা মানবজাতির পক্ষে দর্পণ স্বরূপ। মানবগণ উহাতে স্ব স্ব স্বভাবের প্রতিবিম্ব

দেখিতে পাইয়া হয় প্রশংসিত না হয় লজ্জাবনত হন। ইহাই শিক্ষার পন্থা। স্ব স্ব দোষের জন্য লজ্জিত ও সেই ভাবে তিরস্কৃত না হইলে কাহার তাহা সংশোধনের প্রবৃত্তি জন্মে? আর স্ব স্ব গুণের প্রশংসা না থাকিলেই বা কাহার তৎপ্রতি আনুরক্তি থাকে?

বলা যাইতে পারে যে চলিত সংসারে স্বভাব ও অভ্যাসের পথে চলিয়া মানবগণ এরূপ কঠোরতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন যে তাঁহারা স্ব স্ব স্বভাবের কদর্য্য প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হন না। অধিকন্তু, স্বার্থানুরোধে, নিন্দিত ও প্রশংসিত এই উভয় প্রকার স্বভাবের তারতম্য বিচার করিয়া সতর্ক হইতেও তাহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না। স্বভাব যতই কদর্য্য হউক না কেন, যদি তদ্দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? স্বার্থ সিদ্ধ না হইলে সুন্দর ও প্রশংসনীয় স্বভাবেরই বা প্রয়োজন কি? এখানে পাপ ও পুণ্যের ফলের কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল হয় না। কারণ, মনুষ্য দেখিতে পায় যে পাপের ফলে এ জগতে মনুষ্যের অনেক সময়ে উন্নতি এবং পুণ্যের ফলে অবনতি হইতেছে। কর্ম্মফলের এইরূপ গতি লক্ষ্য করিয়াই সংসারের সাধারণ লোক ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদিগকে পুণ্যের ফল বর্ণনা দ্বারাও সৎপথে আনা সুকঠিন। কোন কোন নৈতিক পণ্ডিত তজ্জন্য বলিয়া থাকেন যে ধর্ম্মই ধর্ম্মের পুরস্কার।

সৃষ্টিমধ্যে মানবমন অতি অদ্ভুত পদার্থ। ইহারই বিচিত্র গতির জন্য মানবসমাজ ও রাজ্য শান্তি ও সুখের কারণ হইয়াও ঘোর অশান্তি ও অসুখের লীলাভূমি হইয়াছে, সংসারের গতিদর্শন করিয়া এবং সংসর্গে ভুগিয়া ভুগিয়া মনুষ্যের মন বিকল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং স্বভাবতঃ উহার গতি যেরূপ পবিত্র হওয়ার আশা করা যাইত, তাহা হয় নাই। শিক্ষা দ্বারা এইরূপ মানসিক অস্বাস্থ্যের কথঞ্চিৎ প্রতিবিধান হইতে

পারে। যাঁহারা সুখের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, তাঁহারা উচিত শিক্ষা পাইলে বুঝিতে পারেন যে সুখাপেক্ষা স্বস্তি ও শান্তি মনুষ্যের যথার্থ প্রার্থনার বিষয়। সুতরাং ধর্ম্মই যে ধর্ম্মের পুরস্কার, তাহাতে আর সন্দেহ কি? স্বার্থ সিদ্ধ হইল না বলিয়া মনে যে উদ্বেগ ও নৈরাশ্যের উদয় হইতে পারে, স্বস্তি ও শান্তি থাকিলে তাহাদিগের প্রতিবিধান অবশ্যই হয়। এই জন্যই ধর্ম্মের বা পুণ্যের অন্য কোন ফল না থাকিলেও তাহার প্রয়োজন আছে, বলিতে হয়।

অধিকাংশ মনুষ্যই অবকাশ কাল বৃথায় ব্যয় করিয়া থাকেন। তাহার কারণ, তাহাদিগের এরূপ সুযোগ নাই যে তৎকালে তাহা অবলম্বন করিয়া বহুমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করেন। তাস পাশা ও আমোদেই অনেকেরই রুচি আছে। অলীক আমোদে—অনেকেরই সময় নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ সময়ে কৌতুকবশতঃ তাঁহারা এইরূপ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, ও গ্রন্থকারের স্বভাব বর্ণনার গুণে ধর্ম্মপথে তাঁহাদিগের মন আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অবশ্যই মানবজাতির প্রভূত উপকার সিদ্ধ হয়। দূষিত মন বা চিন্তাপ্রণালী সংশোধিত হইয়া গেলে যে কি শুভ সংঘটনই হয়, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

সমালোচ্য গ্রন্থে মানবমন আকর্ষণের বিশেষ উপায় যে কৌতূহলোদ্দীপন, তাহা প্রচুর রূপেই আছে; কিন্তু স্বভাবচিত্রণে গ্রন্থকার বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। হীরাপ্রভা হীরক খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রণয়ে যেন অস্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদের প্রতি হীরার মন কিরূপে আকৃষ্ট হইল, তাহা ভালরূপে বুঝা যায় না। হৃদয়ের ভালবাসা কি কেবল কৃতজ্ঞতার নিমিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে? মানব যাহা দ্বারা বিশেষ রূপে উপকৃত হয়, তৎপ্রতি স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে। ইহা হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের ভালবাসা জন্মিতে পারে না।

উহা একটী স্বতন্ত্র বিষয়। স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা অধিকাংশ স্থলেই কামাধীন। কিন্তু যে অবস্থায় রামপ্রসাদ ও হীরাপ্রভার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে আদৌ ঐ বৃত্তির স্ফুরণ হইতে পারে না। এরূপ ঘটনাও গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই, যদ্দ্বারা উভয়ের মধ্যে সময়ে সময়ে দর্শনাদি দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা উৎপন্ন হইতে পারে। রামপ্রসাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার কেবল প্রসঙ্গমাত্র জ্ঞাত হওয়া যায়, কার্য্যতঃ অন্যায়রূপে অবরুদ্ধা একটী নারীর উদ্ধারসাধন ব্যতীত আর কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায় না। রামপ্রসাদ যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ, কাহারও সহিত জ্ঞানচর্চ্চায় তাহাও প্রদর্শিত হয় নাই। অধিকন্তু যে ব্যক্তি স্বগৃহে পিতা ও পরিবারগণের ভ্রষ্টাচার দর্শন করিয়া এককালীন সংসার বিরক্ত ও সন্ন্যাস পথের পথিক হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে উপকৃতা নারীর নিকট হইতে প্রতিদানস্বরূপ অলঙ্কার গ্রহণ অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইতে পারে। যে প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাস পথের পথিক, সে কতকগুলি অলঙ্কার লইয়া কি করিবে? যে ব্যক্তি উদাসীন ভাবে ঈশ্বরারাধনার নিমিত্ত চন্দ্রভাগা নদীতটে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছে, তাহার সঙ্গে অলঙ্কারে কি কাজ?

হীরপ্রভার প্রতি তাহার পিতা মাতার আচরণও অস্বাভাবিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে পিতা ঋণ-দায় হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বয়ং নানা গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সঙ্কটের অবস্থায় যে কন্যা-উদ্ধারকারিণী, তাহার প্রতি সন্দেহমূলক অপবাদের ভয়ে এককালীন রুষ্ট হওয়া ও রোষবশতঃ বিনা বিচারে ও অনুসন্ধানে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

উপন্যাসটীকে প্রকৃত প্রস্তাবে কলিকাতা রহস্য বলিয়াই পাঠকের সহসা মনে হয়। কিন্তু পল্লীগ্রামের দৃশ্য সকল সংযোজিত করায় যেন অস্বাভাবিকতা দোষে দূষিত হইয়াছে। এইরূপ কতিপয় দোষ

ব্যতীত উপন্যাসটী যে যথার্থ ই কৌতূহলোদ্দীপক ও পাঠকের প্রীতিপ্রদ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে ঐশ্বরিক ন্যায়বিধানের উল্লেখ থাকায় ইহা আরও উপাদেয় হইয়াছে। ফলতঃ জগতে অনেক স্থলে মানবের ভাগ্য পরীক্ষা করিলে এইরূপ ঐশ্বরিক বিধানের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকের কর্ম্মফল এ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইটী স্বাভাবিক হইয়াছে। গোবিন্দ বাবুর পাপের বিশেষ শাস্তি কিছুই হয় নাই; তরঙ্গিনীও অব্যাহতি পাইয়াছে। বস্তুতঃ সংসারে এইরূপই হইয়া থাকে। জগতে অনেক পাপীর দণ্ড হয় না, অনেক পুণ্যবান্ পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তিও কেবল আত্মপ্রসাদ ব্যতীত আর কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হন না। কিন্তু কর্ম্মের-ফল অবশ্যই আছে। তাহা অস্বীকার করিলে তর্ক এবং যুক্তি শাস্ত্রের ন্যায়ও অস্বীকার করিতে হয়। সুতরাং গ্রন্থকার যে পরলোকে অবিশ্বাসের কিঞ্চিৎ আভাস তরঙ্গিনীর মুখ দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নীতিসঙ্গত হয় নাই। পাপ পুণ্যের উচিত দণ্ড ও পুরস্কারের স্থান কেবল ইহলোকই নহে। এই বিষয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ সাপেক্ষ।

এখানে আরও দুই একটী কথা লিখিলে গ্রন্থের দোষ গুণ সম্বন্ধে সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয়। গ্রন্থখানি যেরূপ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে ইহার উপসংহারভাগ সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রীতিপ্রদ হয় নাই। পাঠকের আশা ছিল যে হীরাপ্রভা ধর্ম্মের পুরস্কার লাভ করিয়া অর্থের কিরূপ সদ্ব্যবহার করেন, তাহা দেখিবেন। কিন্তু ইহাতে তাহা কিছুই প্রদর্শিত হয় নাই। রামপ্রসাদের প্রতি তাঁহার পতিভক্তি কিরূপ প্রগাঢ় হইয়াছিল, তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়ার নিমিত্ত পাঠকের ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। এই দুই আশায় বঞ্চিত হওয়ায় গ্রন্থখানি যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। আসঙ্গলিপ্সা এই

স্বাভাবিক বৃত্তিটী মানব জাতিতে অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়। ইহার নিমিত্ত মানবজাতি নানা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। উপন্যাস রচনায় এই তত্ত্বটী বিশেষ রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু নির্দ্দোষ সতীত্ব ও দম্পতিপ্রেম অবশ্যই শিক্ষার বিষয়। এই গ্রন্থে হীরাপ্রভাকে সতীরূপে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু স্বামীর প্রতি কোন কোন ব্যবহার দ্বারাই উহা অন্যের গোচর হইয়া থাকে, গ্রন্থে ঐরূপ ব্যবহার আশানুযায়ী হয় নাই। সরলা যে নির্দ্দোষ সতী তাহাও বলা যায় না। আমাদিগের দেশে সতীত্ব শিক্ষা করিতে হইলে একমাত্র সীতা ও সাবিত্রীই আদর্শ এখন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সতীত্ব যেন নূতন এক বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। উহার নিমিত্ত বিবাহরীতির পুনঃ সংস্কার আবশ্যক বলিয়া অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তির হইয়া থাকে। সীতা বাল্যবিবাহে বিবাহিতা এবং ভক্তি মিশ্রিত পতিপ্রণয়ে প্রণয়িনী। এরূপ আধুনিককালে অসম্ভব বলিয়াই ব্যক্ত হইয়া থাকে। আধুনিক কালের সুশিক্ষিতা কামিনীগণের বিবেচনায় স্বাধীন বিবাহই যথার্থ প্রেমের শিক্ষাদায়ক। যে বিবাহে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই, যাহাতে স্ত্রী বাল্যকালে—ক্রীড়ার পুতুল, অথবা গৃহ সামগ্রী স্বরূপ, স্বামীর হস্তে প্রদত্ত হয়, তাহাতে যে বিশুদ্ধ প্রেম জন্মিতে পারে, এবং স্ত্রীর সতীত্ব যে নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস এই শ্রেণীর লোকের নাই সুতরাং তাঁহারা সীতার যথার্থ মর্ম্ম বুঝেন না।

কেহ বলিতে পারেন, তাঁহারা সীতার মর্ম্ম না বুঝেন, সাবিত্রীর মর্ম্ম ত অবশ্যই বুঝিতে পারেন। সাবিত্রীর বিবাহই এ কালের সভ্যতানুযায়ী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কেননা, ইহাতে বিবাহের পূর্ব্বে পতিকে মন ও প্রাণ অর্পণ করিবার প্রসঙ্গ আছে, এবং ঐরূপে প্রথম হইতেই সাবিত্রী অটল দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা তাহাতে বাধা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিনোদ-

লালের সঙ্গে সরলার বিবাহও কি ঐরূপ ভাবে হইতে পারিত না? লেখক একটু যত্ন করিলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, এবং তৎপ্রদত্ত শিক্ষা আশানুযায়ী হইতে পারিত। লেখক অবশ্যই ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ, এবং সেক্স্পীয়র প্রণীত "রোমিও জুলিয়েট" নাটক অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা যায়। তবে যে কি-জন্য সরলার ভাগ্য অন্যরূপ করিয়া দিয়া সতীত্ব বিকৃত করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না।

রচনাই সৃষ্টি। উপন্যাসাদির রচয়িতাগণও একরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। এই সৃষ্টি কি জন্য? যদি তাহাতে যথার্থ শিক্ষা লাভ না হয়, মানব স্বভাব যাহা তাহাই থাকিয়া যায়, উহার ত্রুটী সকল নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত না হয়, এবং আশানুযায়ী সংশোধনের উপায় সদ্ভাব না থাকে, তাহা হইলে আর রচনার সফলতা কোথায়?

উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ ঐ ব্যবহার ও ঐ শিক্ষাতেই এই গ্রন্থে ত্রুটী থাকিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই গ্রন্থ আধুনিক রচনা, সুতরাং আধুনিক শিক্ষাতেই ইহা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার যে প্রবল দোষ আছে, তাহার উল্লেখ না করিলে সমাজে প্রতারণাগ্রস্ত হইতে হয় বলিয়াই ঐ দোষগুলির উল্লেখ মাত্র করা হইল। গ্রন্থস্থ নায়ক ও নায়িকাগণের মধ্যে হীরাপ্রভা ও রামপ্রসাদ,—এবং সরলা ও বিনোদলালই সর্ব্বপ্রধান। এইরূপ চরিত্র সকল সীতা ও সাবিত্রীর আদর্শে গঠিত হইলেই যথার্থ সুশিক্ষা প্রদত্ত হইত।

আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

মধ্যপ্রদেশ।

জব্বলপুর—বেড়াঘাট।

বিগত ৫ই ডিসেম্বর অতি প্রত্যূষে ৬টার সময় আমি এবং বন্ধুবর যামিনী বাবু পদব্রজে খেরাণিঘাট হইতে জব্বলপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। একে সেই পার্ব্বত্য-প্রদেশীয় ভয়ানক শীত, সূর্য্যদেব তখনও দেখা দেন নাই, তা'তে আবার অসমতল ভূমিতে পদব্রজে গমন যে বড় সুখদায়ক হইয়াছিল, তাহা কেহ মনে করিবেন না। স্বচ্ছসলিলা নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর যাইতেই তপনদেব পূর্ব্বদিকে দেখা দিলেন। পথে দুই একটি হরিণ-শাবক আমাদিগকে দেখিয়া প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিল। আমরা দুইজনও নানাপ্রকার বাক্যালাপে এবং চতুর্দ্দিকে বালার্ককিরণোদ্ভাসিত প্রকৃতির শোভাসন্দর্শনে ছোট ছোট পাহাড় এবং উপত্যকা অতিক্রম করিয়া বেলা ৯টার সময় জব্বলপুরে উপস্থিত হইলাম। জব্বলপুর সহরটি প্রকৃতপক্ষে দুইভাগে বিভক্ত, জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট এবং জব্বলপুর সিটি। আমরা যাইতে প্রথমেই ক্যাণ্টনমেণ্ট পেলাম। ক্যাণ্টনমেণ্টের বাজার এবং হাঁসপাতাল হইতে সিটির বাজার এবং হাঁসপাতাল সম্পূর্ণ পৃথক। রাস্তাঘাট এত পরিষ্কার এবং পরিপাটি আমি আর কোথায়ও দেখি নাই। ক্যাণ্টনমেণ্টের এধারে বাড়ীগুলি প্রায়ই একতালা এবং বেশ ফাঁকা ফাঁকা প্রকৃতপক্ষে ক্যাণ্টনমেণ্ট, সিটি অপেক্ষা অনেক পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর। জব্বলপুর ভারতবর্ষের প্রায় কেন্দ্রস্থান বলিলেও চলে তাই এখানে কামানের গাড়ী এবং তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুতের একটী বড়

কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে। নর্ম্মদা অঞ্চলের সৈনিক বিভাগের প্রধান আড্ডা জব্বলপুরে। এখানে পদাতিক দলের রেজিমেণ্ট গোরা-পল্টন, এক রেজিমেণ্ট দেশীয় পল্টন এবং এক Squadron দেশীয় অশ্বারোহী পল্টন রক্ষিত হইয়াছে। দুই ব্যাটারি আর্টিলারিও এই সঙ্গে ক্যাণ্টনমেণ্টে মজুত থাকে। শুনিতে পাইলাম, খেরাণিঘাট হইতে আসিতে পাহাড় অতিক্রম করিয়া ক্যাণ্টনমেণ্টের সম্মুখে যে মাঠ পাওয়া যায়, সেখানে সন্ধ্যার পর মধ্যে মধ্যে গোরাদিগের উপদ্রবের ভয়ে ভদ্রলোকের যাতায়াত অতি বিরল। যাহা হউক, আমরা ক্যাণ্টনমেণ্ট অতিক্রম করিয়া সিটিতে উপস্থিত হইলাম। সিটিতে বাড়ীগুলি ক্যাণ্টনমেণ্টের মত ফাঁকা ফাঁকা নয়। লোক সংখ্যা এইখানেই বেশী। বাজারটী বেশ বড় এবং হাঁসপাতাটীও বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইল। টাউন হলটী অতি সুন্দর। ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালের নিকটেই একটি বাঙ্গালী-পাড়া রহিয়াছে; সেখানে কয়েক-ঘর বাঙ্গালীর সহিত পরিচয় হইল। জব্বলপুরে বাঙ্গালীর সংখ্যা ছেলেপিলে সমেত বোধ হয় ১৫০ শতের বেশী হইবে না। ৪।৫ জন দেশীয় ব্যারিষ্টার এখানে আছেন। একজন বাঙ্গালী এদিকে আসিলে এখানকার সকল বাঙ্গালীই সমবেত হয়েন। প্রিয়বন্ধু দে-বাবুর বাটীতে এত সমাদর যত্ন এবং অভ্যর্থনা পাইয়াছি যে, তাহা চিরদিন মনে থাকিবে। জব্বলপুরে প্রত্যেক বাটীতেই জলের কল আছে। রাত্রি দিন কলে জল থাকে। টাউনের ৫ মাইল দূরে একটী হ্রদবিশেষ সুন্দর জলাধার রহিয়াছে, সেইখান হইতেই টাউনের সর্ব্বত্র জল দেওয়া হয়। এইরূপে টাউনের কিছু কিছু দেখিয়া আমরা বেলা দশটার সময় বেড়াঘাটের বিখ্যাত মার্ব্বেল পাহাড় এবং নর্ম্মদা জলপ্রপাত দেখিতে টঙ্গা যোগে রওয়ানা হইলাম। বেড়াঘাট জব্বলপুর টাউন হইতে ১২ মাইল দূরে; আমাদের সেখানে পৌছিতে প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। এই ১২ মাইল রাস্তা মধ্যে মধ্যে পাহাড় কাটিয়া অতি সুন্দরভাবে সমতল করা হইয়াছে। প্রায় এক মাইল দূর থাকিতে দুইটি পাণ্ডা বালক আমাদের "টঙ্গার" সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরেই টঙ্গা থামিলে আমরা অবতরণ করিয়া প্রথমে নর্ম্মদা জলপ্রপাত দেখিতে চলিলাম। সেই পাণ্ডা বালকদ্বয় আমাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর পাহাড়ে পাহাড়ে গিয়া জলপ্রপাতের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ক্রমে যতই আমরা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, দৃশ্য ততই মনোরম বোধ হইতে লাগিল। প্রপাতের নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্ঝরধৌত রাশি রাশি প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে, বালুকা বা মাটির চিহ্নমাত্র নাই। অদূরে পাহাড়ের উপর পাহাড় উঠিয়া বিন্ধ্যাচলের মনমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিতেছে। সেই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য হইতে একটী বহুবিস্তৃত ঝরণার ন্যায় নর্ম্মদা প্রবাহিত হইয়া আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম তার নীচে প্রায় ৭০০ ফিট্ দূরে অতি ভীষণ গর্জ্জন করিয়া পতিত হইতেছে। শত সহস্র উর্ম্মিমালা চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইয়া সূর্য্যরশ্মিতে নানাপ্রকার বর্ণে অতিরঞ্জিত হওয়াতে দৃশ্যটী আরও মনোহর হইয়াছে। এই স্থানটিকে স্থানীয় লোকে ধোয়াধার বলিয়া থাকে। সর্ব্বদাই এই প্রপাত হইতে জলকণা যেন ধূমরাশির ন্যায় আকাশমার্গে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই নর্ম্মদা প্রপাত দেখিতে অনেক দূর হইতে সাহেব, মেম এবং সৌখিন বাঙ্গালাবাবুরাও আসিয়া থাকেন। এখানকার লোকে এই প্রপাতে ফুল এবং ফুলের মালা দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতেছে। অনেকে প্রপাতের জল মাথায় দিয়া ধন্য হইতেছে। বাস্তবিক এই স্থানে কিয়ৎকাল দাঁড়াইলে মন আনন্দরসে আপ্লুত হইবেই সন্দেহ নাই। পাঠক যদি ভিজাগপট্টমের "ডলফিন্‌স্ লোজ" নামক পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া নিম্নস্থিত সমুদ্রের নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকেন যদি সেই স্থানের নির্জ্জনতায় এক মুহূর্ত্তের

তবেও মুগ্ধ হইয়া থাকেন তবে এই কোলাহল সমন্বিত, গম্ভীর-গর্জ্জি নর্ম্মদার হৃদয়-স্পন্দনকারী প্রপাত সন্দর্শন করেন, সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে মন আলোড়িত হইবে। যাহা হউক, আমরা কিয়ৎকাল প্রপাতের নিকটবর্ত্তী উপখণ্ডের উপর ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সেই পাহাড়ের অন্য অংশে চৌষট্টি-যোগিনীর আবাস দেখিতে চলিলাম। আমরা যে দিক হইতে যাইতেছিলাম, সে স্থান বড়ই দুর্গম। কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রায় ১০ মিনিটকাল উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে শেষে চৌষট্টি-যোগিনীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরাতন বাটির মধ্যে একটী মন্দির, মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের দেওয়াল এবং দেওয়ালের সঙ্গে চৌষট্টি-যোগিনীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম দেখিলাম। এদিকে পাহাড়ের উপর বেশ ছোট ছোট দুইটি ডাক-বাংলা আছে, সাদা মার্ব্বেল প্রস্তরে আগাগোড়া নির্ম্মিত হওয়ায় ছোট হইলেও অতি পরিপাটি। এইখানে অনেকে ২।১ ঘণ্টা বা ২।১ দিনের জন্য আস্তানা লইয়া থাকেন। এই পাহাড়ের উপর নানাবর্ণের পাথরের বোতাম, লকেটের পাথর, শ্বেত প্রস্তরের নানাবিধ ফ্যান্সি জিনিষ ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। সার্টের বোতাম এক সেট ৩৲ হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দামের আছে। যাহা হউক, আমরা এসব দেখিয়া নিকটবর্ত্তী নর্ম্মদাতটে উপস্থিত হইয়া জগদ্বিখ্যাত শ্বেত-প্রস্তরের পাহাড় (Marble Rocks) দেখিতে প্রস্তুত হইলাম। গবর্ণমেণ্ট হইতে দুইখানি নৌকা (Plerme Boat) ঘাটে রক্ষিত হইয়াছে। ১॥০ ভাড়া দিয়া আমরা দুই জনে নৌকায় উঠিলাম, ৪ জন মাঝিও নৌকায় উঠিল, তৎপরে সেই ক্ষুদ্রতরণী আরোহণে ১ মাইল দূরে জলপ্রপাতের দিকে যাইতে যাইতে যে অভিনব দৃশ্য দেখিলাম, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। একমাইল পর্য্যন্ত যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, দুইদিকে শ্বেত প্রস্তরের পাহাড় ১২০ ফিট উচ্চে উঠিয়াছে। তন্মধ্যে স্বচ্ছতোয়া, পুণ্যসলিলা-নর্ম্মদা প্রবাহিত, স্থানে স্থানে জল প্রায় ৩০০ হাত গভীর। বেলা তখন প্রায় ২টা বাজিয়া গিয়াছে, রৌদ্রবেগে সেই দুরারোহ উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে চাহিতে চক্ষু ঝপ্‌সাইয়া যাইতে লাগিল। পাহাড়ের গায়ে গাছ পালা মাত্র নাই। যাইতে যাইতে মনে হয়, যেন পাহাড় উপর হইতে ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়িল। দুইধারেই পাহাড় জলের মধ্য হইতে ঠিক্ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, কূলে উঠিবার কথা দূরে থাকুক, দাঁড়াইবার সঙ্কীর্ণ স্থানটুকু মাত্র নাই। সেই শ্বেতপ্রস্তরের গায়ে ছোট বড় নানাপ্রকার চিহ্ন রহিয়াছে, স্থানীয় লোকে উহা ঐরাবতের এবং ইন্দ্রের অশ্বের পদচিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করে। জলপ্রপাতের নিকটবর্ত্তী হইতেই প্রপাতের শব্দ এবং স্রোত ক্রমে বেশী হইতে লাগিল, অতএব আর অগ্রসর না হইয়া আমরা আবার ফিরিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিলাম। তীরে আসিয়া দেখিলাম, অনেক লোক নর্ম্মদাতে স্নান করিতেছে, কোথায়ও শ্রাদ্ধমন্ত্রাদি পাঠ হইতেছে। নবেম্বর মাসে এই স্থানে একটা প্রকাণ্ড মেলা বসে, তাহাতে এতদ্দেশীয় বহুলোক বহু দেশ হইতে আসিয়া সমবেত হয়। লোকের ধারণা এই যে ৫ বৎসর হইল গঙ্গার মাহাত্ম্য অন্তর্হিত হইয়াছে এবং সেই হইতে নর্ম্মদা তীর্থের পবিত্রতা শীর্ষস্থানীয়। এখানে মার্ব্বেল পাথরের কয়েকটি Quarry আছে সেখান হইতে গবর্ণমেণ্ট মার্ব্বেল পাথর কাটিয়া লওয়াইতেছেন। মার্ব্বেল পাথরগুলি অধিকাংশ Magnesium Lime stone এবং অত্যন্ত শক্ত, স্থানে স্থানে Soap stoneএর Quarryও আছে। "সোপ ষ্টোন" অতীব মসৃণ এবং নরম হাতে ধরিলে হাতও তদ্রূপ মসৃণ হয়। দুই একটা বাঘ পাহাড়ের উপর মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া থাকে, কিন্তু আজকাল শীকারীর উপদ্রবে ক্রমেই বিরল হইতেছে।

আর একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছি, জব্বলপুর হইতে টঙ্গায় না

আসিয়া রেলযোগেও বেড়াঘাটে আসা যায়। জি, আই, পি, রেলওয়ে মীরগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া প্রায় ২॥০ মাইল হাঁটিতে হয়, এই অসুবিধার জন্য অনেকেই জব্বলপুর হইতে বেড়াঘাট পর্য্যন্ত বরাবর টঙ্গাতেই আসিয়া থাকেন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

তুমি।

তুমি নির্ম্মল যেন সরসী বক্ষে
কম্পিত শতদল।
তুমি পূত যেমন মকরের দিনে
স্বচ্ছ অজয় জল।
তুমি উজ্জ্বল যেন নিরালা তারকা
সান্ধ্য গগন গায়।
তুমি স্নিগ্ধ যেমন যূথী পরিমল
শান্ত মলয় বায়।
তুমি লজ্জিত যেন লজ্জাবতীটি
কুঞ্চিত পরশনে।
তুমি হর্ষিত যেন আমার হৃদয়
মুখ তব দরশনে।
তুমি কোমল যেমন শিরীষ কুসুম
শুভ বৈশাখী সাঁজে।
তুমি সরল যেমন মুগ্ধা হরিণী
শ্যাম তপোবন মাঝে।
তুমি সুন্দর যেন প্রণয়ীর কাছে
প্রণয়িনী মুখ তার।
তুমি প্রিয় যেন ওগো বিষাদের পরে
ইপ্সিত সুখ ধার।
তুমি মধুর যেমন পরিচিত স্বর
প্রান্ত প্রবাসী কাণে
তুমি বাঞ্ছিত যেন মধু চুম্বন
বিচ্ছেদ অবসানে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন।

বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্বেষ।

বাঙ্গালী বিজিত জাতি, সুতরাং বিজেতৃজাতি ইংরাজ বাঙ্গালীর ভাষায় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাতে ক্ষোভের কোন কারণ দেখা যায় না। যাহা কিছু এদেশী অর্থাৎ Native তাহাই সাহেবের চক্ষে ঘৃণিত হইতে পারে, ঘৃণিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষায় ঘৃণা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আপনা আপনি কথাবার্ত্তা কহিতে গেলে যাহারা ইংরাজী-ভাষা ব্যবহার করে, পিতা পুত্রকে, বন্ধু বন্ধুকে চিঠিপত্র লিখিতে গেলে যখন জাতি ভাষা ছাড়িয়া বৈদেশিক ভাষার প্রয়োগ করেন, তখন অন্য জাতি তাহার আদর করিবে কেন? বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন হইল না, বাঙ্গালা ছাড়া সমস্ত ভাষারই আদর আছে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার আদর হয় না, ইহার একমাত্র কারণ বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষায় দারুণ ঘৃণা প্রদর্শন, যতদিন বাঙ্গালী জাতিভাষার আদর করিতে না শিখিবে, কাজের সময় ব্যতীত—বিশেষতঃ

সাহেবদিগের সহিত কাজের সময় ভিন্ন জাতিভাষার ব্যবহারে ঘৃণা প্রদর্শন করিবে, ততদিন বাঙ্গালাভাষার আদর হইবে না। যাহাদিগের ভাষা তাহারাই যদি তাহাকে ঘৃণা প্রদর্শন করে, তবে অন্য জাতি তাহার মর্য্যাদা রাখিবে কেন?

যাঁহারা জাতিভাষার আদর না করিয়া বিজাতি ভাষার গৌরবে অস্থির হন, তাঁহাদিগের মনে করা উচিত যে, যাঁহাদিগের ভাষা সামান্য শিক্ষা করিয়া আপনাদিগকে মহাজ্ঞানী মনে করেন, অর্থাৎ যাঁহারা সামান্যরূপ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া লম্ফঝম্প করেন, তাঁহারা ইংরাজদিগের নিকট নিতান্ত ঘৃণিত জীবরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, পরন্তু স্বজাতীয়দিগের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হন।

আমরা কংগ্রেস করিতেছি, সভাসমিতিতে লম্বা বক্তৃতা দিয়া ঘন ঘন করতালি লাভে কতই আনন্দ উপভোগ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইতেছে কি? অন্ততঃ যেরূপ ফলের প্রত্যাশায় আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তাহার কতটুকু সম্পন্ন হয়? কেবল জাতি-ভাষার পরিপুষ্টি সাধন এবং জাতিভাষায় অসামান্য শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বলেই আজ মুষ্টিমেয় ইংরাজজাতি জগৎ শাসনে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা যদি কেহ বুঝিয়া না থাকেন, তবে তিনি যতই ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করুন না কেন, তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই, তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া মূর্খতা ভিন্ন অপর কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই—ইংরাজজাতি তাঁহাকে মহামূর্খ ব্যতীত অপর কিছুই মনে করে না।

অনেকে বলেন, বাঙ্গালাভাষায় পাঠ্য পদার্থ কিছুই থাকে না।—কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় কিছু না থাকিবার কারণ কি বাঙ্গালী নহে? বাঙ্গালা-ভাষায় কোন পদার্থ বাহির হইলে, শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী অমনি বলিয়া উঠেন যে, উহা যখন ইংরাজী ভাষায় আছে, তখন বাঙ্গালা ভাষায় উহা বাহির হওয়ায় লাভ কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ফরাসী বা জর্ম্মন-ভাষার কোন বিষয় ইংরাজী-ভাষায় বাহির হইলে, কোন ইংরাজ ঐ কথা বলেন কি? অথবা ঐ কথা বলিতে কি সাহসী হন? বলা বাহুল্য, ইহার একমাত্র কারণ, ইংরাজের স্বদেশানুরাগ—জাতিভাষার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন স্বজাতি বা স্বদেশানুরাগের পূর্ণ বিকাশ। যাঁহারা জাতিভাষার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বদেশানুরাগের কথা প্রকাশ করেন, তাঁহারা প্রতারক। মুখে স্বদেশানুরাগের ধুয়া ধরিয়া নিজের স্বার্থসাধন করা, তাঁহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এরূপ দেশ হিতৈষীর সংখ্যা আজকাল বড় অল্প নহে। তাঁহারা দেশ হিতৈষণার ব্যপদেশে স্বদেশবাসীর মনোরঞ্জন করেন, স্বদেশবাসীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগের প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া লন। কিন্তু এরূপ ভীষণ-জীবসমূহের দ্বারা যে দেশের সমূহ-অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা কি কেহ ভাবিয়াছেন? যতদিন দেশের লোকে জাতিভাষায় ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন, যতদিন জাতিভাষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতি ভাষার প্রতি অনুরক্ত থাকিবেন, ততদিন উন্নতির চীৎকারে গগন যতই নিনাদিত হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না।

ত্রিশকোটি ভারতবাসীর মধ্যে বঙ্গবাসীর সংখ্যা অন্যূন ৭ কোটী। অর্থাৎ ভারতবর্ষে যত লোক বাস করে, বাঙ্গালীর সংখ্যা তাহার চারি-ভাগের একভাগ। বাঙ্গালার এই ৭ কোটি অধিবাসীর মধ্যে শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৭ হাজারের অধিক নহে, অর্থাৎ প্রতি দশসহস্র বাঙ্গালীর মধ্যে একজন বাঙ্গালী শিক্ষিত অবশিষ্ট ৯৯৯৯ জন মূর্খ। আবার এই শিক্ষিত লোকের মধ্যে যদি বাঙ্গালা ভাষায় অনুরক্ত ব্যক্তির অন্বেষণ করা যায়, তবে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, শতকরা একজন শিক্ষিত বাঙ্গালীও বাঙ্গালা ভাষাকে আদরের চক্ষে দেখেন না। নতুবা যে জাতি আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া অভিমান

করেন, গ্রন্থ, ঘড়ি প্রভৃতি উপহারের লোভ না দেখাইলে তাঁহাদিগকে মাতৃভাষা পড়ান যায় না কেন? মাতৃভাষা পাঠ করাইবার জন্য পশু বা মৎস্যের ন্যায় যাহাদিগকে প্রলোভিত করিতে হয়, তাহারা যদি সভ্য হয়, তবে বর্ব্বরজাতি কাহাকে বলে, কেহ বলিয়া দিবেন কি? যে জাতিতে দশ হাজারের মধ্যে ৯৯৯৯ জন মূর্খ বিরাজ করে, আবার তাহাদের শিক্ষিতদিগের ভিতরে শতকরা ৯৯ জন অথবা তদধিক লোকে আপনার ভাষাকে ঘৃণা করে, যদি সেই জাতি, জাতীয় মহাসমিতি সংস্থাপনপূর্ব্বক দেশ উদ্ধার করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহার গুরুত্ব কত অধিক হইতে পারে, অথবা তাহার কার্য্যকারিতা শক্তি কতটা সুফল ফলিতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রই বিবেচনা করিবেন। যাঁহারা আপনার মাতৃভাষাকে ভক্তি করিতে জানেন না, অধিকন্তু নিতান্ত ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মুখে দেশের উন্নতির কথা শুনিলে বস্তুতঃ "ভূতের মুখে রাম নাম" বলিয়াই মনে হয়। তাই কবি অনেক দুঃখে গাহিয়াছেন :—

"রবির কিরণে চাঁদের কিরণে
আঁধারে জ্বালিয়ে মোমের বাতি,
সবে উচ্চরবে যারে তারে কবে
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।"

বাঙ্গালী জাতিকে কাপুরুষ বলিয়া, এমন কি, পরভাগ্যোপজীবী ইম্পিরিয়াল এংলো ইণ্ডিয়ানেরা বিদ্রূপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে না। ইহার একমাত্র কারণ, বাঙ্গালীর মধ্যে মূর্খের সংখ্যা সকল জাতি অপেক্ষা অধিক এবং যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের ভিতর বাঙ্গালাভাষা বিদ্বেষীর সংখ্যা আরও অধিক, নতুবা যে বাঙ্গালীর বুদ্ধি-কৌশলে ক্লাইব ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যে বাঙ্গালীর সহায়তা লাভ করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংশ ইংরাজজাতির মধ্যে কীর্ত্তি স্থাপন

করিতে পারিয়াছিলেন, যে বাঙ্গালী, বড়বাবুর সাহায্যে আপিসের বড় সাহেবেরা কেরাণী-শাসনে অথবা দরিদ্র-দলনে সক্ষম হইতেছেন, ইন্‌কম্‌-টেক্সের এসেসার, ডেপুটী কলেক্টর, ডিটেক্‌টিভ অফিসার প্রভৃতিরূপে বিরাজ করিয়া যে জাতি ইংরাজরাজের বিবিধ কার্য্যে সহায়তা করিতেছে, তাহারা যদি নির্ব্বোধ, তবে বুদ্ধিমান কে? তাহারা যদি কাপুরুষ, তবে পুরুষকার আছে কোন্ জাতির?

কিন্তু তথাপি "মাছরাঙার কলঙ্কের" ন্যায় বাঙ্গালীর এ বদ্‌নাম্ ঘুচিতেছে না কেন? চাকুরি কোন্ জাতি না করে, সাহেব মনিবের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে কোন দেশীয়ের প্লীহা না ফাটে? তথাপি "কাপুরুষ" "ভীরু" প্রভৃতি মধুর বিশেষণ কেবল বঙ্গবাসীর পক্ষেই যেন প্রযোজ্য হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ কি বাঙ্গালীর ভাষায় বীতরাগ নহে? যাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি আজিও বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদিগকে কাপুরুষ বলিবার একমাত্র কারণ উল্লিখিত মহাত্মাগণ, নামে এবং উপাধিতে বাঙ্গালী হইলেও কার্য্যতঃ ইংরাজ। আজ যদি সুরেন্দ্রবাবু, নরেন্দ্রবাবু, লালমোহন বাবু বাবু-নামের স্বার্থকতা সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, যদি মিষ্টারের প্রলোভনে বিমোহিত না হইয়া, বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতাদি প্রদান করিতে পারিতেন, তবে আজ আমাদিগকে কংগ্রেস করিয়া মানের কান্না কাঁদিতে হইত না। যাঁহারা দেশের অগ্রণী, প্রতিভাবলে শিক্ষিত-ব্যক্তিবর্গ যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকেন, যদি তাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় সামান্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তবে অচিরে ভাষার উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হয়। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর লেখনী ধারণের পূর্ব্বে সাধারণ বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষাকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা বাঙ্গলাভাষাচর্চ্চাকারীমাত্রেই অবগত আছেন। যদি

বঙ্কিমবাবুর ন্যায় শক্তিশালী-লেখক বঙ্গভাষার উন্নতি এবং পরিপুষ্টি সাধনের প্রতি উদাসীন থাকিতেন, তবে উপহার দিয়াও আজ সংবাদপত্রে গ্রাহক-সংখ্যা কখনই বৃদ্ধি হইত না। যে দেশে এক এক জন প্রতিভা-শালী ব্যক্তির ক্ষমতা এত অধিক, সে দেশ উন্নত হইতে কয়দিন লাগে?

দুঃখের বিষয় আজ যাঁহারা আমাদিগের বাঙ্গালীজাতির মধ্যে প্রতিভা-সম্পন্ন তাঁহারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী-নাম এবং উপাধিধারী ইংরাজ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। আজ যদি আবশ্যক ব্যতীত সুরেন্দ্রবাবু, নরেন্দ্রবাবু, লালমোহনবাবু বাঙ্গালীর সভা সমিতিতে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করেন, বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের ন্যায় বাঙ্গালাভাষা চর্চ্চা করিয়া প্রকৃত বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় প্রদানে লজ্জা বোধ না করেন, তবে বাঙ্গালীর উন্নতি হইতে, বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টি এবং উৎকর্ষ সাধিত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। জাতীয়-ভাষা পরিপুষ্টির উপর জাতীয়-উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপিত, এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে বাঙ্গালী বাঙ্গালা-ভাষা, মহারাষ্ট্রীয় মারহাট্টি-ভাষা উন্নত করিতে সচেষ্ট না হইলে জাতীয় উন্নতি কখনও সাধিত হইতে পারে না।

আরও একটা কথা, যদি বাঙ্গালীই বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্বেষ বা ঘৃণা প্রকাশ করেন, তবে অপরজাতি তাহাকে ভক্তি করিবে কেন? আর সেই ভাষায় যাহারা কথাবার্ত্তা বলে, সেই ভাষায় যাহারা কার্য্যাদি সম্পন্ন করে, তাহাদিগের উপরে লোকের ঘৃণা ভিন্ন ভক্তি হওয়াও কি সম্ভব-পর? সমগ্র ইংরাজজাতি ইংরাজি-ভাষাকে ভালবাসে, ভক্তি করে বলিয়াই আজ ইংরাজী ভাষা জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, ইংরাজিভাষাও ক্রমে আরও অধিক পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে, আর সেই সঙ্গে ইংরাজের বলবীর্য্য ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। মোট কথা যে জাতির জীবন আছে, অথবা যে জাতি জীবন লাভের চেষ্টা করে, তাহারা কখন মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে না।

দেড়সহস্রব্যাপী দাসত্বভোগের পর গ্রীকজাতি স্বাধীন হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসচর্চ্চাকারীমাত্রেই অবগত আছেন। হিউ-মরে প্রণীত "Descriptive Geography" পুস্তকে দেখা যায়:—

"The conquest by the Ottoman finally extinguished in Greece everything that remained of her ancient greatness. The Greeks were made "the slaves of slaves" and even their character became deeply tinctured with the degradation which, in such circumstances can scarcely be avoided"

গ্রীকজাতি কাপুরুষ হইয়া গিয়াছিল, ক্রীতদাস-জাতি নামে আখ্যাত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা আবার কিরূপে স্বাধীন হইল, তাহা কেহ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন কি? ঐ শুন, ঐতিহাসিক বজ্রগম্ভীরনিনাদে বলিতেছেন:—

"Even under their great humiliation, materials were not wanting, out of which their independence might be re-established. Amid the gloom of Turkish domination, high displays of genius and heroism, yet still remaining destinct in *language, manners* and *religion*, and exhibiting even revived symptoms of intellectual and general activity.—*Descriptive Geography Part III. page 812.*

যদি গ্রীকজাতি আপনার জাতিভাষা, ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিত, তবে তাহারা আবার স্বাধীনতালাভে সমর্থ হইতে পারিত কি?

কিন্তু আমরা এমনি কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদিগের মনে

বিন্দুমাত্র বল নাই, আমরা যে বংশে যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অবলীলাক্রমে তাহার মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার এবং ভাষা ছাড়িতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করি না। আবার আমরাই মুখে দেশহিতৈষণার উচ্চ চীৎকারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করি, আপনাদিগকে স্বাধীনজাতির, বিশেষতঃ আমাদিগের শাসক-জাতির সমকক্ষ মনে করিয়া, রাজনীতিক আন্দোলনে অগ্রসর হই। ধিক্ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে।

কি দুঃখের কথা, কি ঘৃণার কথা, কি লজ্জার কথা, পিতা পুত্রের সহিত বিজাতীয় ভাষায় আলাপ করিতে ভালবাসেন, বন্ধু সমজাতীয় বন্ধুকে ইংরাজীভাষায় পত্র লিখিয়া পরিতৃপ্ত হন, ইহা এক ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশ ব্যতীত কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় কি? কয়জন ইংরাজ ফরাসী-ভাষায় পিতা, মাতা, পত্নী অথবা পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন? কয়জন ইংরাজ ভিন্নজাতীয় ভাষায় বন্ধুকে পত্র লিখিয়া থাকেন। যে জাতির জীবন আছে, সে জাতির মধ্যে আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞানও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা আপনার মাতৃ-ভাষার মর্য্যাদা রক্ষায় অগ্রসর হইবার পরিবর্ত্তে ঘৃণা প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না, তাহাদিগের মধ্যে রাজনীতিক চর্চ্চা, জাতীয় মহাসমিতির কথা শুনিলে যে জীবিতজাতিমাত্রেই বিদ্রূপ করিবেন, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? তাই বলিতেছিলাম, অগ্রে জাতীয়-ভাষার সম্যক্ উন্নতি সাধিত কর, অগ্রে জাতীয়-ভাষাকে ভক্তি করিতে অভ্যস্ত হও, তবে উন্নতির কথা মুখে আনিও; নতুবা বিজাতীয়-ভাষার উচ্ছিষ্ট গলাধঃকরণ পূর্ব্বক তাহা স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গকে উদ্গিরণ করিয়া দিলে, তাহার দুর্গন্ধে কেহ নিকটেই যাইবে না। অতএব ইংরাজকে ইংরাজি-ভাষায় বুঝাইয়া দাও, ফরাসীর নিকট ফরাসী ভাষা ব্যবহার কর, কিন্তু স্বজাতীয়দিগের নিকট ইংরাজির বাচালতা প্রকাশ

করায় লাভ কি? যে দেশে ১০০০০ হাজারের মধ্যে ৯৯৯৯ জন ইংরাজি-ভাষায় অনভিজ্ঞ সে দেশে "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" পরিচয় প্রদান করা কাপুরুষতা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালা কি মূলভাষা?

কিছুদিন পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে শ্রদ্ধাভাজন সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস মহাশয় বাঙ্গালা অভিধান আলোচনা প্রসঙ্গে একস্থানে এই-রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই, সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালার জননী নহে, ধাত্রী মাত্র; বাঙ্গালা একটা স্বতন্ত্র মূল-ভাষাই ছিল, সংস্কৃতের দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধনমাত্র হইয়াছে।" শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবুর এই মতের সমীচীনতা পর্য্যালোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় এইমত সমালোচনা করিবার জন্য যেরূপ পাণ্ডিত্য থাকা প্রয়োজন, আমাদের তাহা কিছুই নাই। তার পর এতদ্বিষয়ক মতামত সম্বন্ধে অন্যান্য পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া, অস্মদীয় উক্তি সমর্থন করিতে পারি, এরূপ সুবিধাও আপাততঃ আমাদের নাই। কারণ সেই সমস্ত পুস্তক এস্থানে অপ্রাপ্য, তবে আমাদের স্বকীয় মত প্রকাশ করিয়া সাধারণের নিকট তাহারও বিচারার্থে উপস্থাপনই আমাদের এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমাদের মতে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর উক্তবিধ উক্তি সর্ব্বথা সমীচীন বোধ হয় না। আমাদের ধারণা যে সংস্কৃতভাষা বঙ্গভাষার ধাত্রী মাত্রই নহে, বঙ্গভাষার জননীও বটে, অথবা আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে হইলে, বঙ্গভাষার মাতামহী অথবা প্রমাতামহী বলা যাইতে পারে। আমরা জানি না, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রাকৃত-ভাষাগুলিকে মূলভাষা বলিতে

চাহেন অথবা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা বলেন। তিনি যদি প্রাকৃত-গুলিকে মূল বলেন, তবে আর আমাদের বিশেষ কোন কথা বলিবার নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালার মূলভাষাত্ব প্রতিপাদিত হয় না।

মূলভাষাগুলির প্রত্যেকেরই এক-একটা অথবা কতকগুলি করিয়া বিশেষত্ব বর্ত্তমান থাকে; কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়ার সংস্থান, বাক্য যোজনা ইত্যাদিতে প্রত্যেক মূলভাষারই কতকগুলি করিয়া বিশেষত্ব থাকে। তাহা মূলভাষাগুলির কতকগুলি লইয়া বিচার করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। অনার্য্য ভাষাগুলির মধ্যে প্রত্যেকেরই এইরূপ বিশেষত্ব বর্ত্তমান আছে বলিয়া, ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গারো-ভাষা, সাঁওতালি-ভাষা, কোল-ভাষা, তেলেগু-ভাষা প্রভৃতির কি শব্দ, কি বাক্য প্রত্যেক বিষয়েই অনেক বিশেষত্ব আছে; সংস্কৃতের সহিত পাশা-পাশি স্থাপন করিলে, তাহারা কখনই একটুও মিশ খাইবে না; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধে একথা বলিতে পারা যায় না। অতি প্রাচীন বাঙ্গালাভাষাও সংস্কৃতের সম্মুখে লইয়া আসিলে, উভয়ের স্বজাতীয়ত্ব নিশ্চয়ই ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিবে; তাহার বাক্য-রচনার পদ্ধতি, ক্রিয়াপদগুলির আকৃতি-প্রকৃতি ও ব্যবহার প্রভৃতি সংস্কৃতের সঙ্গে প্রায় একই সুরে, একই তানে বদ্ধ, এই জন্যই বাঙ্গালাকে সংস্কৃত হইতে পৃথক মূলভাষা বলিতে আমাদিগের প্রধান আপত্তি।

পাশ্চাত্য ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ গবেষণাবলে সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক্ প্রভৃতি ভাষাকেও একই জাতিতে পরিণত করিয়াছেন; ইঁহাদের এই একত্ব সম্পাদনেও এইরূপ যুক্তিই অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ জ্ঞানেন্দ্রবাবু আমাদের অপেক্ষা ভালই জানেন। ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ও ব্যবহার প্রণালী ভাষার জাতি নির্ণয়ে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে; আর ভাষার প্রধান প্রধান শব্দাবলী অবলম্বন করিয়াও ভাষার জাতি-তত্ত্ববিষয়ে বহুতর রহস্য অবগত হইতে পারা যায়। এই উভয়দিক দিয়া

দেখিলেই আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের কত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বৈদিক সংস্কৃত ক্রমে ক্রমে উপনিষদাদির সংস্কৃতে পরিণত হয়, তার পর তাহা পুরাণাদির সংস্কৃতের আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা বর্ত্তমান প্রচলিত সংস্কৃতেরই অনুরূপ। এই পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ বাক্য কথনের সাহায্যেই হইয়াছিল এবং সে সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃতই সকলের কথিত-ভাষা ছিল। তার পর ক্রমে তাহারও বিকৃতি ও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল; জীবিত অর্থাৎ বাক্য-কথনে প্রচলিত ভাষার এরূপ পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। অজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ লোকে বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইতে ক্রমে দূরে পড়িতে লাগিল এবং শনৈঃশনৈঃ সংস্কৃতের অপভ্রংশ, তদপেক্ষা কিছু সহজ ও কোমল অন্য একটি ভাষার উদ্ভব হইতে লাগিল। ইহাই শেষে পালিভাষারূপে প্রচলিত হইল।

পালিভাষায় লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা ঠিক্ সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং সংস্কৃতের ছাল তার সর্ব্বাঙ্গেই মারা রহিয়াছে।

এই পালি হইতে প্রাকৃতভাষার উদ্ভব হয়। প্রাকৃত দেশভেদে মাগধী, গৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, পৈশাচী প্রভৃতি নানাপ্রকারের হইয়া ছিল; ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। সংস্কৃত শব্দ-শাস্ত্রে বলে যে, প্রতি যোজন মধ্যেই কথিত-ভাষার উচ্চারণ ও শব্দগত তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে; ইংরাজি-শাব্দিকগণও একথা বিশেষরূপই সমর্থন করিয়া থাকেন; সুতরাং দেশভেদে যে ভাষার মধ্যে কিছু কিছু পরি-বর্ত্তন লক্ষিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদিগের প্রত্যেককে কখন একএকটি মূলভাষা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই, আমাদের বর্ত্তমান

বাঙ্গালা ভাষা লইয়া বিচার করিয়া দেখিলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ঢাকা, যশোহর, ফরিদপুর, নদীয়া, চব্বিশ-পরগণা, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বহরমপুর, রঙ্গপুর, দিনাজপুর সবই বাঙ্গালাদেশ, সর্ব্বস্থানেই বাঙ্গালাভাষাই প্রচলিত। কিন্তু এই সব দেশের প্রচলিত কথাবার্ত্তা পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এত অধিক পার্থক্য লক্ষিত হইবে যে, তাহা ধারণার অতীত। কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের কথা একজন কলিকাতাবাসী বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা ভরসা করি না। কিন্তু উভয়ই যে একই বাঙ্গালাভাষা, তাহাতে কি কেহ সন্দেহ করেন ?

পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতভাষার সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য। তারপর এই প্রাকৃতভাষাগুলির একতম হইতে বাঙ্গালা, অন্যতম হইতে হিন্দি উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মাগধী প্রাকৃত হইতেই প্রধানতঃ বঙ্গভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে; আবার কেহ কেহ এরূপও বলেন যে, মাগধী ও শৌরসেনী উভয়ের মিশ্রণেই বাঙ্গালা উৎপন্ন। উড়িয়া ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানামত প্রচলিত থাকিলেও প্রধান মত এই যে, বাঙ্গালারই একটা প্রকারভেদ মাত্র, উড়িয়া অক্ষরও তাই। যাহা হউক, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে বিষয় লইয়া কোন আলোচনা করিব না।

বাঙ্গালা অক্ষর যে দেবনাগরাক্ষরেরই অপভ্রংশ, ইহা উভয় অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই নিঃসন্দেহরূপে অবগত আছেন, সুতরাং তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বাঙ্গালাভাষায় আমরা যে সমস্ত শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি এবং যে সমস্ত ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করি, তাহারা যে প্রাকৃত হইতেই সমুদ্ভূত তাহা একটু চেষ্টা করিয়া তাহাদের একটা তালিকা করিলেই জানা যাইতে পারিবে।

করা, যাওয়া, খাওয়া, চলা, বসা, পারা, উঠা, শোওয়া, পিয়া, দেখা, শোনা ছোঁওয়া, রাঁধা, পাকা, পচা, ইত্যাদি শত শত নিত্য ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। এই প্রকার ঘর, দোর, কাঠ, চুলা, হাঁড়ি দাওয়া খাট, শেজ, থাম ইত্যাদি শত শত শব্দও প্রাকৃতের গর্ভ হইতে বাঙ্গালার কোল আশ্রয় লইয়াছে, সুতরাং কেমন করিয়া বলিব যে, বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র একটি ভাষা, সংস্কৃতের দ্বারা পুষ্ট মাত্র ?

স্বীকার করি বাঙ্গালাভাষার মধ্যে এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে। কিন্তু কেবল সেই শব্দ কয়েকটির জন্যই বাঙ্গালাকে মূলভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে অনেক ভাষাকেই মূলভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচারিত ও প্রচলিত হইবার অগ্রে অবশ্য কোনরূপ কথিত-ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাবে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত হইবার কালে তাৎকালিক বিধ্বস্ত অনার্য্য-ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাই এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। নিত্য ব্যবহার্য্যের জিনিসপত্রের কতকগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু সেই অজ্ঞাত-নামা মূলভাষার সহিত বাঙ্গালার অন্য কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। যে ভাষার কয়েকটা শব্দ ব্যতীত আর কোনরূপ চিহ্নই বঙ্গভাষার গাত্রে আমরা দেখিতে পাই না, সে ভাষাকে বাঙ্গালার মূল ভিত্তি বলিয়া কেমন করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে ?

প্রাচীন-বাঙ্গালার সহিত নব্য-বাঙ্গালার অনেক পার্থক্য হইয়াছে, ইহা সকলেই জানেন; নব্য-বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দ-বাহুল্য খুব বেশী হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালায় এরূপ ছিল না, তাহা চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম,

ঘনরাম প্রভৃতির গ্রন্থ এবং 'চৈতন্য চরিতামৃত' প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

মুকুন্দরাম একজন খাঁটি বাঙ্গালাভাষার কবি, পাশ্চাত্য কোন কোন পণ্ডিত তাঁহাকে বাঙ্গালার 'চসার' (Chaucer) বলিয়াছেন। তাঁহার কাব্য পাঠ করিলেও তাহাতে বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিশেষরূপই বুঝিতে পারা যায়। এই সব প্রাচীন গ্রন্থে যে সব শব্দ ও ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলির ঠিক্ বর্ত্তমান বাঙ্গালা অবয়ব না থাকিয়া প্রাকৃত অবয়বই রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। করই, দেখই, চলই ইত্যাদি ক্রিয়া সংস্কৃত করোতি, চলতি প্রভৃতিরই যে অপভ্রংশ, তাহা বুঝা কষ্টকর নহে। চন্দা, চান্দ প্রভৃতি শব্দও প্রাকৃত। এই সব দেখিয়া বুঝা যায় যে, সে সময় বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণ পৃথক করিতে সক্ষম হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যত্নে এবং সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অদম্য অধ্যবসায়ে যে সমুদয় বহুতর প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে সেগুলিও বোধ হয় আমাদের উক্তিরই সমর্থন করিবে। বঙ্গভাষার প্রথম কবি চণ্ডীদাসের কার্য্যেও প্রাকৃত শব্দ বাহুল্য অনেক দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা দ্বারা আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা যে বাঙ্গালা একটা মূলভাষা কখনই নহে; হিন্দি, মহারাষ্ট্রীয়, প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার ন্যায় সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতভাষার মধ্য দিয়া আবির্ভূত। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দ, ক্রিয়াপদ, পদ-রচনা পদ্ধতি প্রভৃতি যে সংস্কৃতের অনুসারী, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতে পারে।

পাশ্চাত্য-শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণও সকলেই একবাক্যে একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, বাঙ্গালাভাষা প্রাকৃতভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; সুপণ্ডিত মোক্ষমূলার, বুলার, ল্যাসেন, প্রভৃতি সংস্কৃতবিদ্-পণ্ডিতগণের ভাষা-বিচার-বিষয়ক মতামত পাঠ করিলেই একথা জানা যাইবে। তাঁহারা আরও এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সংস্কৃতের অপভ্রংশে প্রাকৃত হইতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে; বাঙ্গালাই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অধিক পরিমাণে সংস্কৃতের অনুসারিণী। প্রাকৃতের মধ্যেও মাগধী-প্রাকৃত অনেক বিষয় অন্যান্য প্রাকৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এজন্যই বোধ হয়, বাঙ্গালা অন্যান্য উপ-ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

প্রাকৃত ব্যাকরণের অনেক নিয়মানুসারে বাঙ্গালার পদ-রচনাদির নিয়ম গঠিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। তার পর ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা-ভাষা পুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান যৌবনাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল; সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও এ বিষয় আর অধিক বিস্তারিত আলোচনা করিতে বিরত হইলাম; তবে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে আমরা যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিলাম, তাহা হইতেই বোধ হয় প্রমাণিত হইবে যে, বাঙ্গালা মূলভাষা নহে।

আবশ্যক হইলে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকাদি হইতে আমাদের মত উদ্ধৃত করিয়া ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া উক্তি প্রমাণ করিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

পূর্ব্বস্মৃতি।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজকুমারী সুপাত্রে পড়িবে, রাজার রাণী হইবে, এর চেয়ে সুখের আর কি আছে বল? কিন্তু তবু কেমন পোড়া মন, থাকিয়া থাকিয়া যেন কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল—সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল—

কার ধন কারে দিলি
আমার সে হলোনা।

যাই হোক্ মনকে বুঝাইলাম, রাজকুমারীর সুখই সুখ! মনের এই অবস্থায় বধূ ঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পিত্রালয়ে রওনা হইলাম। গাত্র-হরিদ্রার দিন আমরা বিবাহ বাটীতে পৌছিলাম—উৎসবাদির কথায় আর কাজ কি, কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টি ছিল না, আমি রাজকুমারীকে দেখিবার জন্যই ব্যস্ত! শীঘ্রই আমার সে আশা পূর্ণ হইল। চারিচক্ষে এক হইবামাত্র রাজকুমারীর চক্ষে হাসি ফুটিয়া উঠিল—কিন্তু তখনই আবার সে বিকচ-কমল যেন মুদিয়া আসিল। ব্রীড়া সঙ্কুচিত রাজকুমারী ধীরে ধীরে আমার নিকট আসিয়া আমার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে গেল, আর গদগদ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল ছিলেন"। আমার পায়ে আবার দুই এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পড়িল! আমি তাহার কম্পিত-হস্ত ধরিয়া সময় সময় বলিতাম—বালিকার সর্ব্ব শরীর যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, আমিও তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম, সে শুধু একটু হাসিল। ছিন্ন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ যেমন হাসে তেমনি হাসিল। এ হাসির অর্থ কি বুঝিব—রাজকুমারী কি তবে আজও আমায় ভুলে নাই! মিছে কথা এ! সে আর কোন প্রকারেই আমায় মনে রাখিতে পারে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আজ রাত্রে বিবাহ! অতি ধুমধাম! বর আসিয়াছে, সভায় বসিয়াছে, আর এক-ঘণ্টা পরেই বিবাহ। আমি বরযাত্রীদের সম্ভাষণে প্রস্তুত আছি—এমন সময় বাটী হইতে রাজকুমারীর একটী ছোট ভাই আমার নিকট আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"রাজুদিদি আপনাকে ডাকিতেছে"—। এখন কেন? কিন্তু আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না—অনেকক্ষণ পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম, যে ঘরে "কনে" বেশে রাজকুমারী বসিয়া আছে, সেখানে গেলাম, সে ঘরে তখন ২।৩টী বালকবালিকা ভিন্ন আর কেহ ছিল না—আমি সে গৃহে প্রবেশ করিবা-মাত্র রাজকুমারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল—কি মোহিনীমূর্ত্তি। প্রতি অঙ্গে যেন রূপের লহরী খেলিতেছিল—বসনে ভূষণেও স্বাভাবিক সুষমা—রাজকুমারী কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী হইয়াছে—হায় রাজকুমারী! রাজকুমারীর কাছে যাইতে না যাইতে রাজকুমারী ছুটিয়া আসিয়া আমার গলায় তাহার গলার সুখের মালাটি পরাইয়া দিল; আমার বুকে মুখ লুকাইয়া ধীরে ধীরে বলিল—এই আমার বিবাহ—! এ কি এ! আমিও বিস্মিত হইলাম, কিন্তু রাজকুমারী এত উত্তেজি[illegible] কেন—আমি না ধরিলে যেন ভূমিতলে পড়িয়া যায়। তাহার হাত এমন অবশ হইল কেন? তাড়াতাড়ি তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। বালিসে মাথা না দিয়া আমার পায়ে মাথা দিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল।

হরি হরি, রাজকুমারী একি করিয়াছে সে যে আফিম খাইয়াছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই উৎসবময় গৃহ অন্ধকার করিয়া মার কোল শূন্য করিয়া রাজকুমারী ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল! এই শুভ-দিনে কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তাহার পর কি হইল—লিখিতে আর হাত সরে না!

পরিশিষ্ট।

তাহার পর আজ পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে—আমাকে ভালবাসিয়া—সে সুখের সংসার কচি বয়সে যে অবহেলে ত্যাগ করিয়া গেল। আমি তাহার জন্য কি করিয়াছি! তোমরা শুনিয়া অবাক হইবে—আমি এখন সংসারী এবং আমি এমনই পাষাণ! রাজকুমারী এখন শুধু আমার পূর্ব্বস্মৃতি মাত্র।

সম্পূর্ণ।